কর্ণাট পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৭

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

রম্যাণি বীক্ষ্য

কর্ণাট পর্ব

প্রতিদিন পৃথিবীর রূপ বদলাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে সব কিছুর। আজ যা দেখে এলাম, কাল অন্য রকম দেখছি। আজকের কথা কাল পুরনো হয়ে যাচ্ছে। নতুন রেলপথ বসছে, নতুন রাজপথ তৈরি হচ্ছে, যানবাহন ও বাসস্থানেরও উন্নতি হচ্ছে অভাবনীয়। কিন্তু দর্শনীয় স্থানের ও বর্ণনা বিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি। তথাপি এই গ্রন্থে বর্ণিত অঞ্চলগুলি একাধিকবার ভ্রমণ করে যথাসম্ভব আধুনিক উপকরণ পরিবেশনের যে চেষ্টা করেছি, সুধী পাঠক তা অনুমান করতে পারবেন।

২৪শে মার্চ, ১৯৭৮

রম্যাণি

বি. এফ. ৭৭ সল্টলেক সিটি,

কলিকাতা-৭০০০৬৪

গ্রন্থকার

সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনাসি সুক্রতুর্
অগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ ।
বসুর্ বসূনাং ক্ষয়সি ত্বম্ এক ইদ্
দ্যাবা চ যানি পৃথিবী চ পুষ্যতঃ ॥

ঋগ্বেদ, ১০।১৯।৩

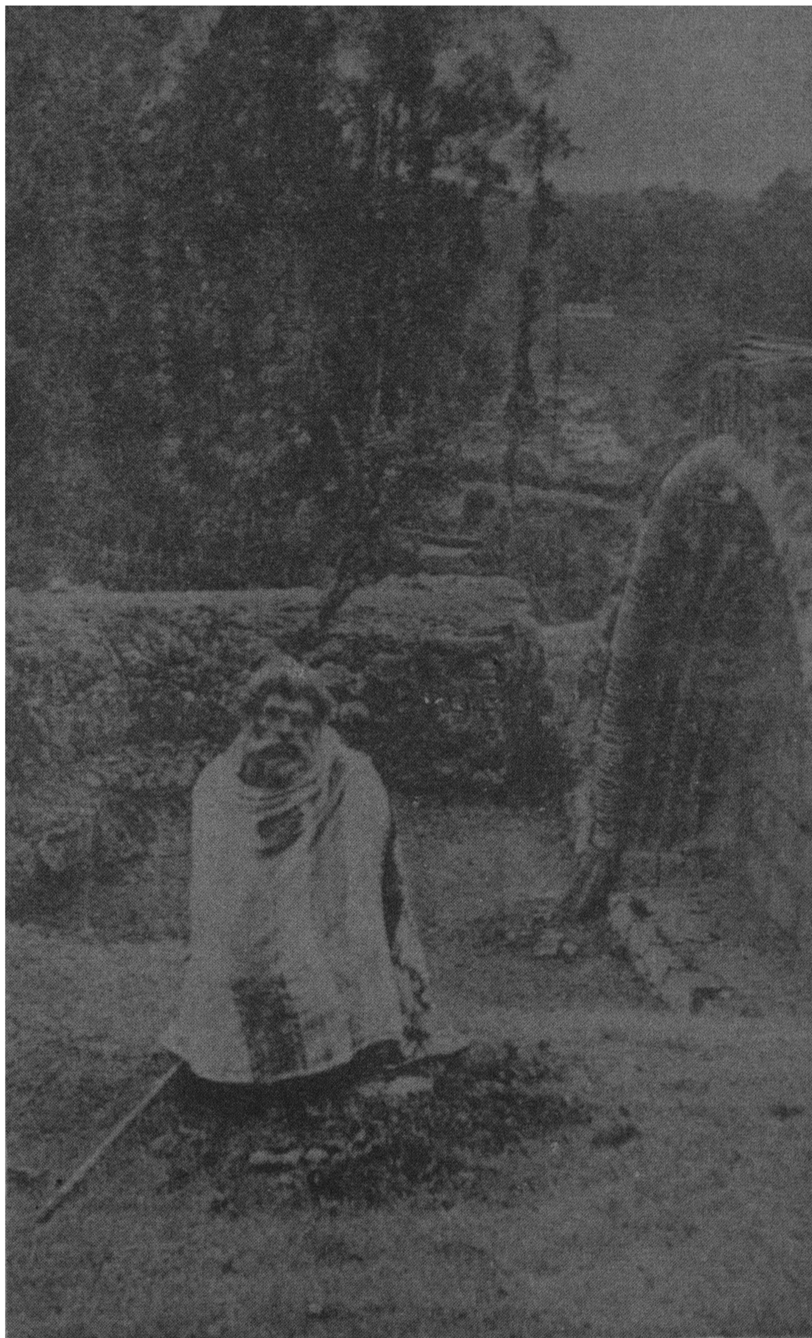
Most skilful with Thy powers, most wise with wisdom
O God, Thou art a poet knowing all with thy poetic wisdom.
Master of good things Thou, the One, art the Lord of all things,
That the heaven and the earth produce

—Rigveda, X. 91-3

উৎসর্গ

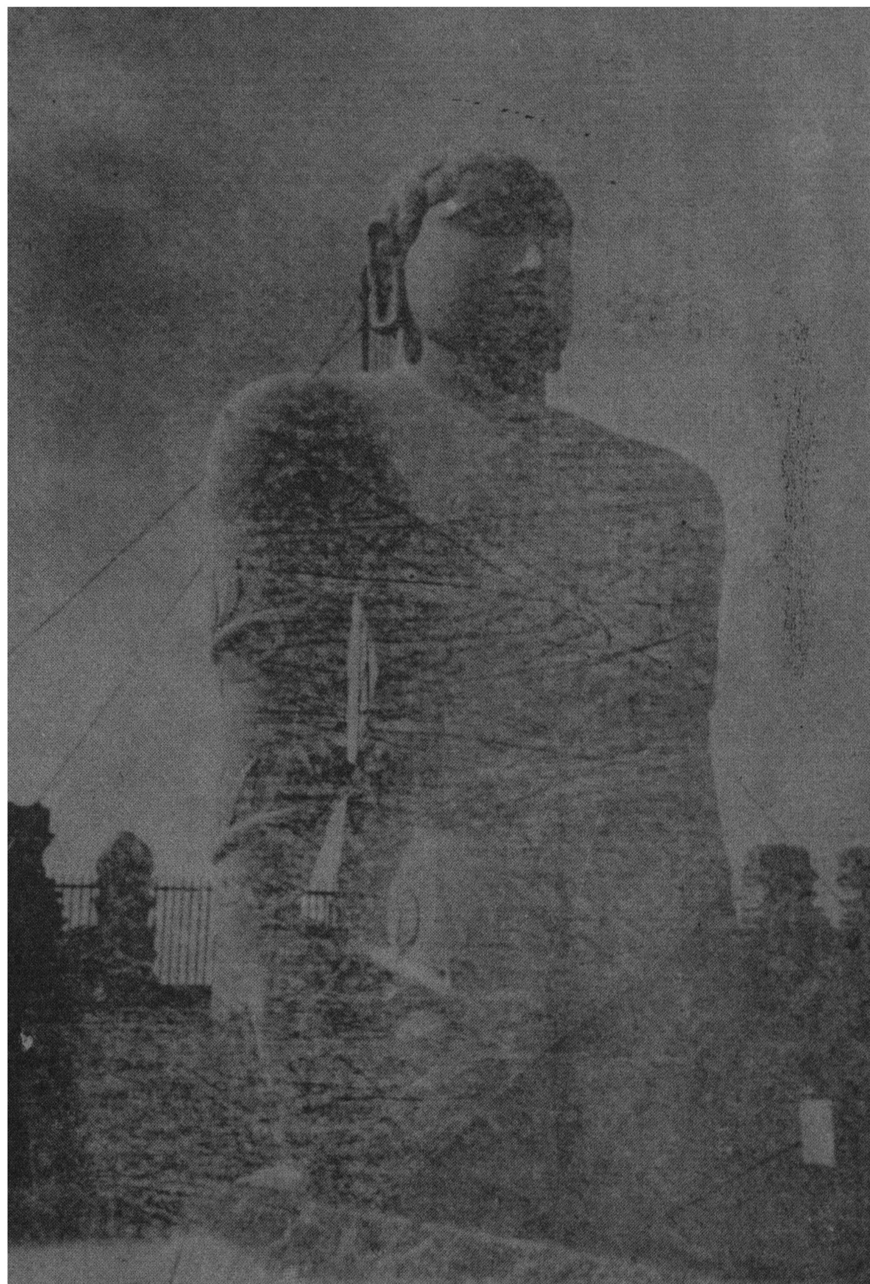
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

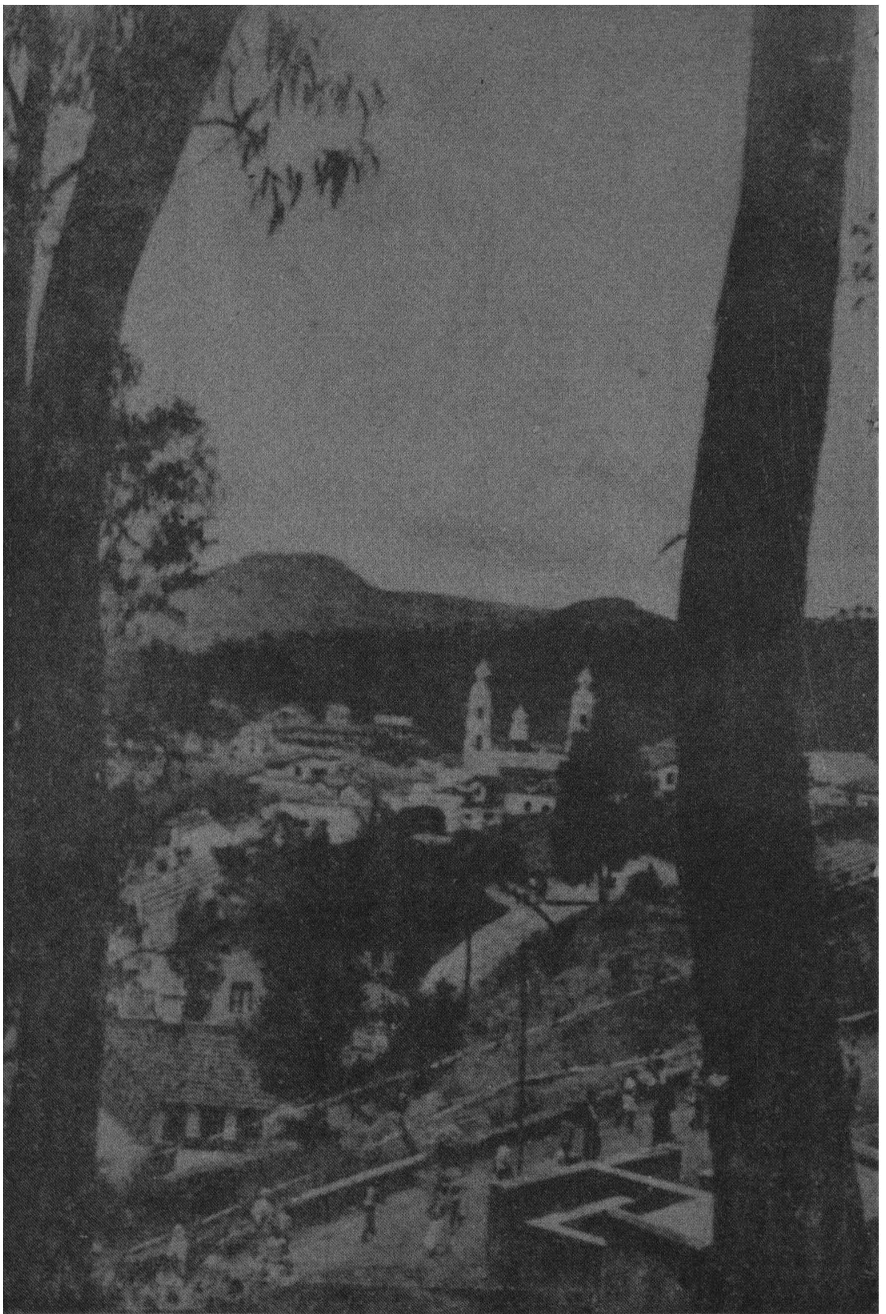


নীলগিরি পাহাড়ের টোডা

(উপরে) সোমনাথপুরের মন্দির   (নিচে) গোলকুণ্ডার দুর্গ

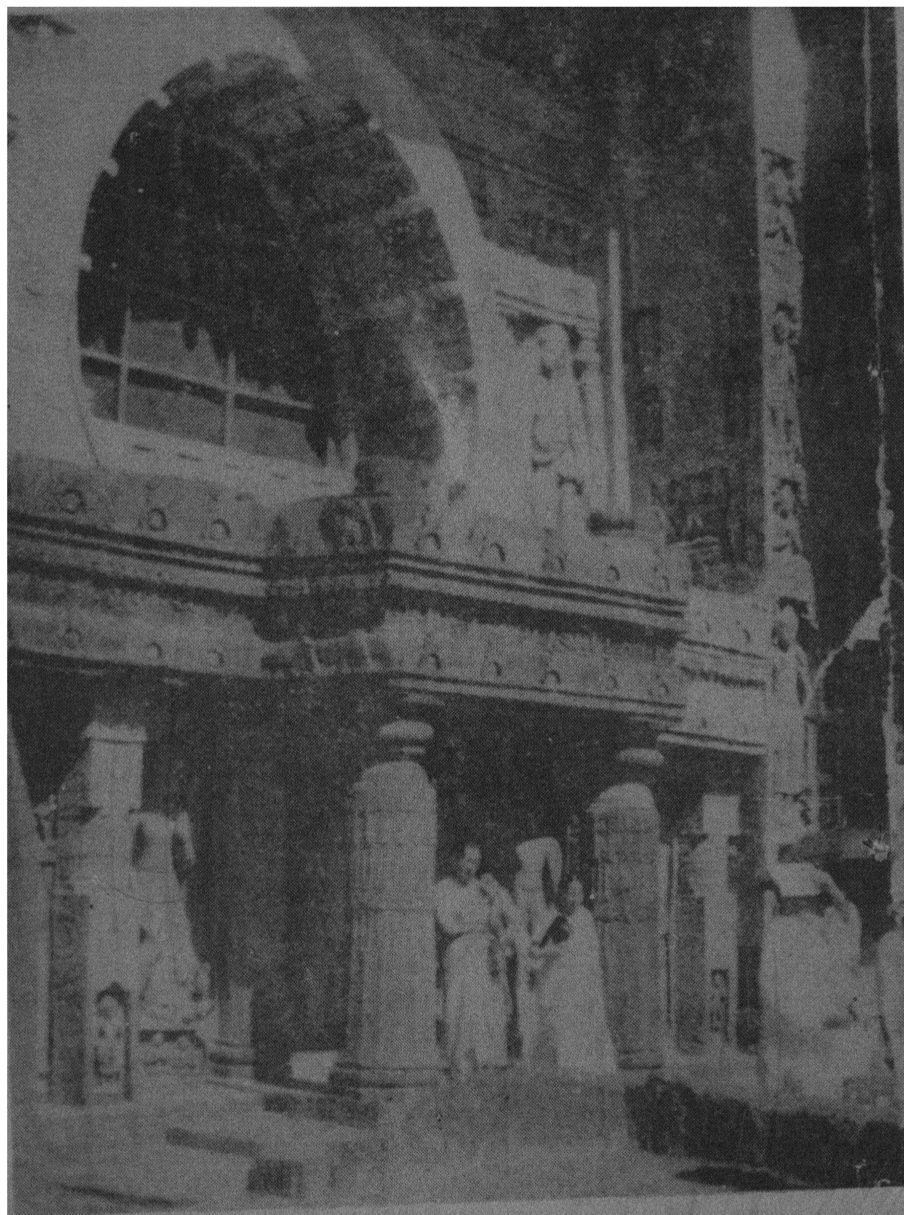


শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর মূর্তি



নীলগিরি পাহাড়ে কোটাগিরি

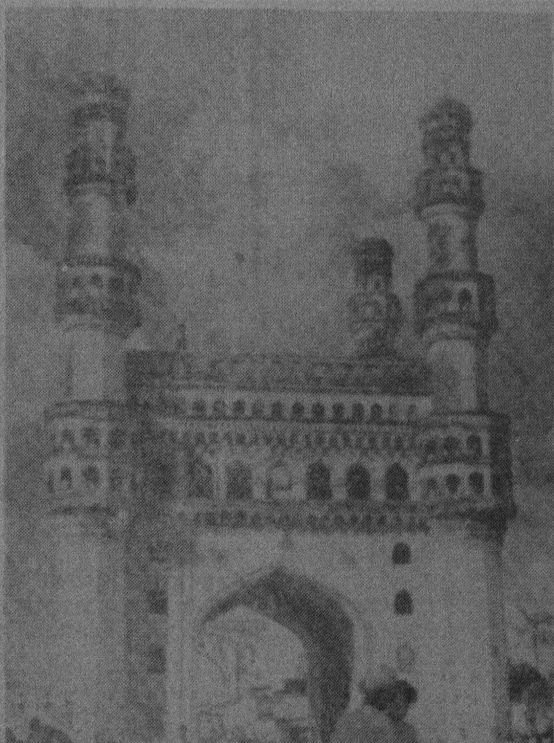
রে) ইলোরার কৈলাস মন্দির (নিচে) অজন্তার সাধারণ দৃশ্য ফটো ঃ ডঃ শীতাং



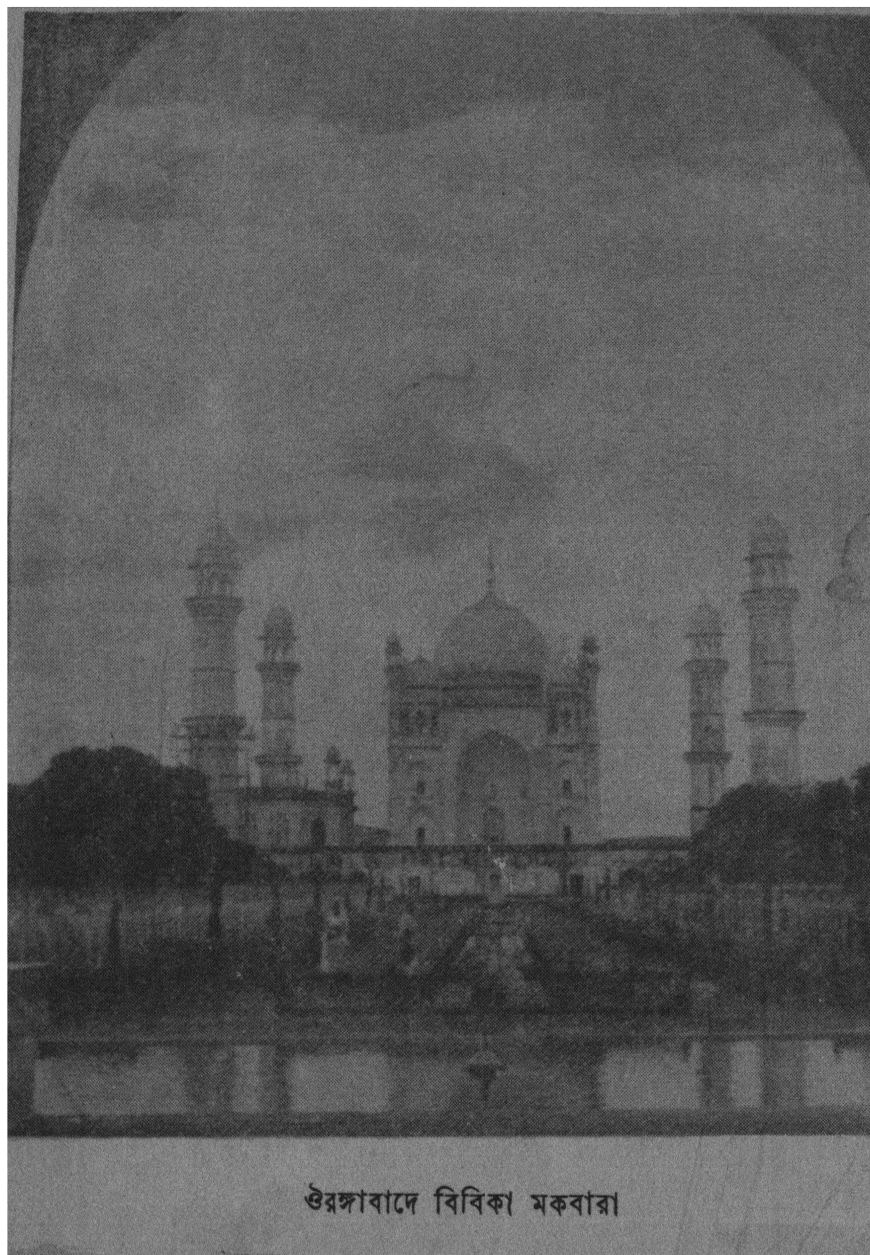
অজন্তার চৈত্য



দৌলতাবাদে
চাঁদ মিনার



হায়দ্রাবাদের
চারমিনার



ঔরঙ্গাবাদে বিবিকা মকবারা

১

টক টক করে বন্ধ দরজায় গোটা কয়েক টোকা দিয়ে স্বাতি ঘরে এল। ফিস ফিস করে বলল : বাবা তোমাকে খুন করবেন বলছেন।

আমি হেসে বললুম : কেন, কী করেছি আমি!

স্বাতি বলল : হাসি নয় গোপালদা, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো পালিয়ে যাও।

বললুম : কোথায় পালাব! ঘরের বাইরে বেরুলেও যে প্রাণ যাবে!

স্বাতি এবারে খিল খিল করে হেসে উঠে বলল : এত শীত-কাতুরে তোমরা!

বলেই দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে ফিরে গেল।

মামার রাগের কারণ আমি বুঝি। আজকের এই বন্দী অবস্থার জন্য তিনি আমাকেই দায়ী করছেন। কন্যাকুমারীতে উটি আসবার প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলুম। কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল যে স্বাতি এই প্রস্তাব শুনে খুশী হবে। তাই কেরালা হাউসের লাউঞ্জে বসে আমি বলেছিলুম : কালকের সেই মেয়ে পুরুষের দলটি চমৎকার ব্যবস্থা করেছে!

গম্ভীর মনোযোগে মামা পাইপ টানছিলেন। আমার কথা শুনে বলেছিলেন : কী রকম?

খানিকটা তফাতে স্বাতি মামীকে ঘেঁষে বসে ছিল। তাকে উৎকর্ণ হতে দেখে আমি বলেছিলুম : ত্রিবেন্দ্রাম থেকে একই পথে তারা কলকাতায় ফিরবে না। ট্রেনে কুইলন যাবে, নৌকোয় অ্যালেপ্পি, তারপরে বাসে এর্নাকুলম। এর্নাকুলম থেকে ট্রেনে উটি, উটি থেকে মোটরে মাইসোর।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মামা বলেছিলেন: চমৎকার!

বিদ্রূপের সুর ছিল মামার মন্তব্যে। তার কারণ বুঝতে না পেরে আমি সঙ্কোচ বোধ করেছিলুম। কিন্তু স্বাতি সাহায্য করেছিল আমাকে, বলেছিল: লেপ-কম্বল না নিয়েই বুঝি উটি যাওয়া যায়!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলুম। বলেছিলুম: সে কথা ওরা দেরিতে বুঝবে।

উটির প্রসঙ্গ চাপা পড়েছিল সেই সময়, কিন্তু পথে আবার উঠে পড়েছিল। আমি তুলি নি, তুলেছিলেন এক সহযাত্রী ভদ্রলোক। বলেছিলেন: উটি হল পাহাড়ের রাণী। উটি না দেখে দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরলে ভ্রমণ আপনাদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মামা এবারে ব্যঙ্গ করেন নি। চিন্তিত ভাবে বলেছিলেন: আমাদের সঙ্গে তো গরম কাপড় যথেষ্ট নেই!

ভদ্রলোক বলেছিলেন: যথেষ্ট গরম কাপড়ের দরকার তো এখন নেই। সকাল সন্ধ্যায় একটা সোয়েটার, আর রাতে একখানা কম্বল। আর কম্বল আপনারা হোটেলেই ভাড়া পাবেন।

স্বাতি ইসারায় আমাকে কথা বলতে বারণ করেছিল। নিজেও কোন কথা বলে নি। আমাদের কোন সাড়া না পেয়ে মামা মামীর দিকে তাকিয়েছিলেন, আর মামী বলেছিলেন: সে সব তো সঙ্গে আছে।

গোপালের কী হবে?

উত্তর দিতে মামী দেরি করেন নি, বলেছিলেন: গোপালকে একখানা গরম চাঁদর দিতে পারব।

গম্ভীর ভাবে মামা বলেছিলেন: হুঁ।

হুঁ মানে?

মামী প্রশ্ন করেছিলেন মামাকে। আর মামা বলেছিলেন: ষড়যন্ত্রটা তাহলে সবাই মিলে করেছ।

আর তাকিয়েছিলেন আমার দিকে।

আজও তিনি ভাবছেন যে আমার দুর্বুদ্ধিতেই উটাকামণ্ডে আসতে হয়েছে, আর এই কষ্টের জন্ম দায়ী একমাত্র আমি। আমি তাঁর দোষ দিই না, তাঁকে দোষ দেওয়া অন্যায় হবে। ট্রেনে না এসে আমরা বাসে এসেছি, বিকেল বেলায় নেমেছি বাস থেকে। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল শিপশিপ করে। রাত্রিবাসের জন্য কোথায় উঠব তা আমাদের ঠিক ছিল না। দু-একটা হোটেলের গাইড দাঁড়িয়ে ছিল বাস স্ট্যাণ্ডে। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে দূরে যেতে মামা রাজী হলেন না। কাছেই একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু এ সময় তারা ঘরই ভাড়া দিচ্ছে, খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। এ কথা আগে জানলে তিনি এখানে আসতেন না। জেনেছেন অন্ধকার নামবার পরে। এখন আর কোন উপায় নেই। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, আর শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সারা শরীর। তবু একবার পথে বেরোতে হবে আহারের অন্বেষণে। দুপুরে ভাল খাবার জোটে নি, আর সেইজন্যই দুশ্চিন্তা বেশি। মামা নিশ্চয়ই এই সব কথা ভেবেই আমার উপরে চটেছেন।

আমি যখন একটা উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলুম, তখন স্বাতি আবার এসে উপস্থিত হল, বলল: যদি সাহস থাকে গোপালদা তো বেরিয়ে এস। বাবা তোমাকে ডাকছেন।

ভয় পাবার ভান করে আমি বললুম: হাতে তাঁর বন্দুক নেই তো!

স্বাতি হেসে বলল: বন্দুক আছে, কিন্তু গুলি নেই। বৃষ্টিতে বারুদ ভিজে গেছে।

যাক, তাহলে নির্ভয় হওয়া গেল।

বলে গায়ের চাদরখানা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম।

মামা মামী পাশের ঘরেই ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে মামা

কোন কথা বললেন না। তাঁর বদলে মামী বললেন: কী ব্যবস্থা করবে ঠিক করলে?

কিন্তু আমি কোন উত্তর দেবার আগেই মামা ফেটে পড়লেন: ব্যবস্থা আবার কী করবে! সকালে উঠে প্রথম বাস ধরবে ফেরার জন্মে।

মামী বললেন: কিছু খেয়ে তো রাতে ঘুমোবে?

মামা কিছু বলবার আগেই আমি বললুম: আপনি কিছু ভাববেন না মামীমা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

স্বাতি বলে উঠল: এসো গোপালদা, বাইরেটা একবার দেখে আসা যাক।

খান দুই কম্বল ঢাকা দিয়ে মামা বিছানার উপরে কাৎ হয়ে ছিলেন। স্বাতির কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন: এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তোমরা বেরোবে নাকি?

আমি বললুম: স্বাতি ঘরে থাক, আমি একবার দেখে আসি।

পাগল হয়েছ! মামা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: হতভাগা গাইডকে ধরে আনো আমার কাছে। তাকেই আমি খুন করব।

হাসতে হাসতে স্বাতি ঘরের বাহিরে এল। আমিও বেরিয়ে এলুম তাকে অনুসরণ করে। স্বাতি বলল? কী করবে এবারে!

বললুম: বড় ফ্লাস্কটা কোথায়?

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: সত্যিই বেরোবে নাকি!

বললুম: দেখ না কী করি।

ফ্লাস্ক পাশের ঘরেই ছিল। সেটি হাতে নিয়ে আমরা হোটেলের ম্যানেজারকে খুঁজে বার করলুম। বললুম: এক ফ্লাস্ক চা বা কফি আনিয়ে দিতে পারেন? আর এক প্যাকেট বিস্কিট?

বলে কয়েকটা টাকা আর ফ্লাস্কটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক আকাশের দিকে একবার তাকালেন, তারপরে বোধহয় আমাদের কথাও ভাবলেন। বাস থেকে নেমেই আমরা তাঁর

হোটেলে এসে উঠেছি। খেতে দেবেন না, চা-ও এনে দেবেন না, এ কথা বোধহয় বলতে পারলেন না। হাত পেতে টাকা আর ফ্লাকটা নিলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না।

খুশী হয়ে স্বাতি বলল: আর ভাবনা নেই। এসো একটা ফন্দি করা যাক।

বলে আমাকে ঘরের ভিতরে টেনে আনল। মামা এখন এ ঘরে নেই, রাতে তিনি এই ঘরে থাকবেন আমার সঙ্গে। স্বাতি একখানা চেয়ারে বসে বলল: যে লোকটা চা আনবে, তাকে বকশিশ দিয়ে বশ করে ফেলব। রাতের খাবারও আনাব তাকে দিয়ে। কিন্তু গোপালদা, কাল সকাল বেলার বাসে যেন উঠতে না হয়।

আমি বললুম: না উঠলেই হল।

কিন্তু বাবা তোমার কথা মানবেন কেন!

বলব, নীলগিরি পাহাড়ে তো শুধু উটি নয়, কুন্নুর কোটাগিরি আছে। সেখানকার আবহাওয়া নিশ্চয়ই এমন খারাপ নয়।

গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে স্বাতি বলল: উঁহু, তোমার কথায় বাবা আর কোন রিস্ক নেবেন না।

তোমার কথায় নেবেন তো?

পাগল হয়েছ! একবার ধরা পড়ে গেলে আর কোন দিন বিশ্বাস করবেন না। তোমাকেই ম্যানেজ করতে হবে।

করতে যখন হবে, তখন করব।

কী করে করবে? আমি কিন্তু উটি না দেখে নামব না। কুন্নুর কোটাগিরিও দেখব, আর দেখব টোডাদের। তাদের একখানা ছবি আমাকে নিতেই হবে।

আমি হেসে বললুম: সবুরে মেওয়া ফলে স্বাতি, শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যা হবে না।

কিন্তু—

কিন্তু কিছু নেই। আগে একটু গরম চা আসুক, তারপর ভাল

খাবার। খাবার দেখে মামীমা দলে আসবেন, আর রাত্তে ঘুমিয়ে গায়ের ব্যথা মরলেই মামাও মত পাল্টাবেন।

আর সকালে যদি ঝকঝকে রোদ ওঠে—হে ভগবান—

বলেই স্বাতি অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর পরের মুহূর্তেই এল ফিরে। হাসি মুখে বলল: কিছু টাকা নিয়ে এলাম।

বেশি দেরি হয় নি। মিনিট কয়েক পরেই হোটেলের একটা চাকর এক প্যাকেট বিস্কুট আর এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে ফিরে এল। একটা ছাতা নিয়ে সে বেরিয়েছিল, তাই জলে একটুও ভেজে নি। পরম আনন্দে স্বাতি বলল: চায়ের দোকান বুঝি কাছে?

খুব কাছে। হোটেল থেকে বেরোলেই সব দোকানপাট।

বলে সে তার জিনিসগুলো টেবিলের উপরে রাখল। পকেট থেকে পয়সা বার করছে দেখে স্বাতি বলে উঠল: ও তোমার কাছেই থাক, কিছু ফেরত দিতে হবে না।

উত্তরে স্বাতিকে সে একটা নমস্কার করল।

স্বাতি বলল: রাতে আমাদের কী খাওয়াতে পার বল তো?

লোকটা সংক্ষেপে বলল: যা খাবেন!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল দেখে আমি তাকে বললুম: মাটন বিরিয়ানি পাওয়া যাবে?

যাবে।

স্বাতি বলে উঠল: চমৎকার!

বলে একখানা দশ টাকার নোট দিল তার হাতে গুঁজে। আমি বললুম: ভাল মিষ্টি যদি পাও তো গোটা আষ্টেক মিষ্টি আর এক ফ্লাস্ক কফি। যাবার আগে এই ফ্লাস্কটা নিয়ে যেও।

প্রসন্ন মুখে লোকটা বলল: কটায় খাবেন?

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: যে রকম ঠাণ্ডা এখানে, আটটার আগেই বলি, কী বল?

লোকটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল তার কথা। বলল : আটটার আগেই নিয়ে আসব।

স্বাতির বোধহয় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, সগর্বে বলল : এসো এইবারে।

বিস্কুটের প্যাকেট আর চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে আমরা মামার ঘরে এসে ঢুকলুম। আমাদের দেখতে পেয়েই মামা সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : তোমরা ফিরে এলে! কিন্তু জলে ভেজো নি তো!

সোৎসাহে স্বাতি বলে উঠল : অসীম ক্ষমতা বাবা গোপালদার! ঘরে বসেই সব ব্যবস্থা করে ফেলল।

মামীর দিকে চেয়ে বলল : রাতের ব্যবস্থাও করেছে।

বলে চায়ের ফ্লাস্কটা দিল তাঁর দিকে এগিয়ে।

ফ্লাস্কের ঢাকনা আছে দুটো। মামী আরও দুটো পাত্র সংগ্রহ করে সবাইকে চা ঢেলে দিলেন। বিস্কুটও দিলেন একটা প্লেটে ঢেলে। গরম ধোঁয়া উঠছিল চায়ের, তারই এক চুমুক চা মুখে নিয়ে মামা বললেন : এই জন্যেই গোপালকে খুন করি নি।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল পরম কৌতুকে।

২

সকাল বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, জানলার কাচ তখন আর কালো দেখাচ্ছিল না। পর্দা একটুখানি টেনে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে গেল। রোদ ওঠে নি, কিন্তু পৃথিবী জেগে উঠেছে। দিগন্তে মেঘ আছে, কিন্তু সে মেঘ সমস্ত আকাশটা আচ্ছন্ন করে নি। শীতের প্রতাপে শরীরটাও আর পঙ্গু মনে হচ্ছে না।

খান দুই কম্বলের নিচে মামা আরামে নিদ্রিত ছিলেন। এখানকার হোটেলগুলোতে কম্বল ভাড়া পাওয়া যায়। কোনখানে বিছানার সঙ্গেই একখানা কম্বল থাকে, আবার কোনখানে আনা আষ্টেক ভাড়া দিতে হয় এক একখানা কম্বলের জন্যে। মামারা নিজেদের কম্বল নিচে নিয়েছিলেন, আর উপরে হোটেলের কম্বল। দুখানা কম্বলের দরকার আমার হয় নি, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে একখানা কম্বলই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে।

গরম চাদর জড়িয়ে আমি ঘরের বাহিরে এলুম। সেই চাকরটা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল : চা আনব ?

তার এই আগ্রহ দেখে নিশ্চিন্ত হলুম। ঘরের ভিতর থেকে ফ্লাস্কটা এনে তার হাতে দিয়ে বললুম : এখন শুধু চা, সবাই ঘুম থেকে উঠলে আর একবার কষ্ট করতে হবে।

এই কাজ যে সে কষ্টের ভাবছে না, তা কাল দুর্যোগের রাতেই আমরা বুঝতে পেরেছি। নিমেষে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল, আর ফিরেও এল অবিলম্বে। ফ্লাস্কটা আমার হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল : স্নানের জন্যে গরম জল দেব ?

এত সকালে !

তাহলে একটু পরেই দেব। চা-টা খেয়ে নিন।

বলে সে চলে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম : গরম জলের জন্য আলাদা পয়সা নেবে তো?

মাথা নেড়ে লোকটা বলল : না।

উটিতে প্রায় সব হোটেলেই স্নানের জন্য গরম জল দেবার ব্যবস্থা আছে। ভাল হোটেলের বাথ-রুমেই দুরকমের জল পাওয়া যায়। স্টেশনের রিটায়ারিং রুমও আমরা পরে দেখে এসেছিলুম। উপর তলায় দুখানা ঘর পাশাপাশি। বাথ-রুম আলাদা, কিন্তু ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা আছে। বিছানার সঙ্গে কম্বল পাওয়া যায়। আর ঘরে হীটার আছে ঘর গরম রাখার জন্যে। কিন্তু স্টেশনে কোন রিফ্রেশমেন্ট রুম নেই। খাবার জন্য স্টেশনের বাহিরে যেতে হয়। ট্রেনে উটি এলে কিংবা উটি থেকে ট্রেনে ফিরলে আমরা এই রিটায়ারিং রুমে থাকতে পারতুম। ছোটখাটো হোটেলের চেয়ে তা বেশি আরামপ্রদ হত।

মামীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে আমি নিজের ঘরেই ফিরে এলুম। কিন্তু মামা যে জেগে ছিলেন, তা বুঝতে পারলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন : সাত সকালে উঠে পড়লে কেন?

বললুম : চা আনালুম।

চা!

বলে মামা আমার দিকে ফিরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : স্বাতিরা ওঠে নি?

ঘরের দরজা এখনও বন্ধ।

বন্ধ! তা বাইরে থেকে একবার ডেকে দেখো না!

ফ্লাস্কটা হাতে নিয়েই আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা বললেন : ওটা আবার নিয়ে যাচ্ছ কেন! এ ঘরেই ওদের ডাকো।

মামা যে কম্বলের ভিতরে শুয়েই চা খাবেন তা বুঝতে পেরেছি, তাই ফ্লাস্কটা টেবিলে রেখে আমি স্বাতিকে ডাকতে গেলুম। দরজায়

কয়েকটা টোকা দিতেই স্বাতি দরজা খুলে দিল। ঘরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে আমি মামীকে বললুম : আপনার ডাক পড়েছে।

কম্বলের নিচেই মামী আঁচলটা মাথায় টানলেন, কতকটা বিরক্ত ভাবে বললেন : কী হল আবার ?

আমি বললুম : কিছু হয় নি। চা এসেছে।

স্বাতি বলল : এসেছে নাকি ! কোথায় চা ?

হেসে বললুম : চায়ের জন্যই তো মামা তোমাদের ডাকছেন।

আমি দেখলুম যে মামীরও কম্বলের ভিতর থেকে বেরোবার ইচ্ছা নেই। তাই বললেন : চা তোমরাই খাও।

কিন্তু মামা এই কথা শুনে বললেন : বুঝেছি। তোমার মামীর চা তাহলে ঐ ঘরেই দিয়ে এস।

একটুখানি উঁচু হয়ে বসে মামা চা খেলেন, তারপরে তাঁর পাইপ ধরালেন। খানিকটা ধোঁয়া মুখে যেতেই প্রসন্ন মেজাজে বললেন : এইবারে কী করবে বল।

তৎপর ভাবে আমি বললুম : আকাশটা তো পরিষ্কার দেখছি, উটি শহরটা তাড়াতাড়ি দেখে নিলে মন্দ হত না।

স্বাতি তখনই আমাকে বাধা দিয়ে বলল : না না গোপালদা, বিশ্বাস নেই এই উটিকে। কালকের দুর্দশার কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেও না।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : পাহাড়ে এই রকমই হয়, বুঝলে গোপাল ! কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি। আগে থেকে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। দার্জিলিঙে দেখেছ তো, এক সঙ্গে রোদও উঠেছে, বৃষ্টিও পড়ছে। সামনে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে একটু দাঁড়িয়ে যাও, তারপরে বৃষ্টি থামলে আবার এগোও। পাহাড়ে বৃষ্টি দেখে ভয় পেলে চলে না।

স্বাতি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সকৌতুকে হাসল। বলল : না বাবা, কাল উটিতে নেমে চোখে আমরা অন্ধকার দেখেছিলাম।

মামা বললেন : অন্ধকারেই যে নেমেছিলুম আমরা। দিনের বেলায় এলে কি আর জলে পড়ে যেতুম! দেখে শুনে একটা ভাল হোটেলে উঠলে কোন ভাবনাই হত না।

তার পরেই বললেন : যদি বেরোতে চাও তো একে একে তৈরি হয়ে নাও না। পাহাড়ে সকালটাই বেশি ভাল।

স্বাতি লাফিয়ে উঠে বলল : গোপালদার জন্যেই দেরি হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিচ্ছ না কেন!

আমি বললুম : ব্যস্ত হয়ো না, গরম জল পাওয়া যাবে। কালকের সেই লোকটা হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

সত্যি নাকি!

বলে মামা আবার সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : মুখ হাত ধোবার ভাবনা তাহলে নেই!

কোন ভাবনাই নেই।

বলে স্বাতি গিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকল।

শহর দেখবার জন্যে গাড়ির অভাব নেই উটাকামণ্ডে। পুরনো মডেলের ভ্যানগার্ড ভক্সল অস্টিন প্রভৃতি গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশনের কাছে। স্বাতি হোটেলের চাকরকে বলে রেখেছিল। আমি তৈরি হয়ে বেরোতেই খবর পেলুম যে ট্যাক্সি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাতে আট টাকা নেবে, আর ডোডাবেট্টায় উঠলে কুড়ি টাকা। এ অবশ্য অনেক দিন আগের কথা, এখন কত চাইবে জানি নে।

এর উত্তরে একটা সঠিক ধারণা করবার জন্য বললুম : অসম্ভব। আমরা হেঁটেই সব কিছু দেখব।

ড্রাইভার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে মোটেই বাড়িয়ে বলে নি। শহরের এক প্রান্তে বোটানিকাল গার্ডেন, আর

লেক আর এক প্রান্তে। ডোডাবেট্টা পিক শুধু ছ মাইল দূরে নয়, নীলগিরি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শিখর সেটি। উটির উচ্চতা সাড়ে সাত হাজার ফুট, কিন্তু ডোডাবেট্টায় হেঁটে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এক হাজার ফুটের বেশি উঠতে হয়। আট হাজার ছশো চল্লিশ ফুট উঁচু। কিন্তু সেখানে উঠে চোখ জুড়িয়ে যাবে। উপর থেকে অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় নিচের পাহাড়ের।

হোটেলের চাকরটি দাঁড়িয়েছিল কাছে। হাবে ভাবে সে বুঝিয়ে দিল যে একটু চাপ দিলেই ভাড়া কমবে।

হোটেলের বাহিরে দাঁড়িয়ে আমি চারিদিকের দৃশ্য দেখছিলুম। ডোডাবেট্টার শিখরটি ড্রাইভার আমাকে চিনিয়ে দিল। ঘন মেঘ ঘিরে আছে এই শিখরটি। বললুম : আজ ঐ পাহাড়ে উঠলে নিচের দৃশ্য কিছুই দেখা যাবে না।

ড্রাইভার একথা মেনে নিল না, প্রতিবাদও করল না। বুঝতে পারলুম যে কথাটা আমি ঠিকই বলেছি। সে বলল : এ বেলায় আপনারা অন্য সব জায়গা দেখে নিন।

কী দেখাবে বল ?

সে বলল : রেসকোর্স, উটি মার্কেট, চেরিং ক্রস, বোটানিকাল গার্ডেন, লেক। যদি বলেন তো টোডাদের গ্রামেও নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু খরচ বেশি পড়বে।

কত ?

আরও পাঁচ টাকা।

কথা বলতে বলতে আমি খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলুম। আরও দু-চারজন ড্রাইভার এগিয়ে এল। তাদেরও জিজ্ঞাসা করলুম : টোডাদের গ্রাম এখান থেকে কত দূর ?

একজন বলল : মাইল পাঁচেক দূরে। আর একজন বলল, মাইল দুই দূরেও টোডাদের একটা ছোট বস্তি আছে। আর একজন বলল : ভাল করে তাদের দেখতে হলে মাইসোর রোড ধরে ষোল মাইল দূরে

যেতে হবে। আট হাজার তিনশো আশি ফুট উচু মুকর্তি পিকে উঠবার পথের দুধারে টোডাদের গ্রাম দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : আর কিছু দেখবার নেই এখানে ?

দেখবার জায়গার কি অভাব আছে উটিতে! টাইগার হিল, কায়রন হিল, এল্‌ক্ হিল, স্নো ডন, ওয়েন্‌লক ডাউন্‌স্, ভ্যালি ভিউ, কালহাট্টি ফল্‌স্, মার্লিমুণ্ড লেক, উইলসন ফিশফার্ম, আমব্রেলা ট্রি—

পিছনে হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। হাসি থামিয়ে স্বাতি বলল : এদের কাছেই বুঝি সব খবর যোগাড় করছ!

বললুম : এদের কাছে ছাড়া আর কার কাছে খবর পাব বল! গাড়িতে উঠে তো আমার মুখেই তোমরা এ সব শুনতে চাইবে!

স্বাতি হেসে বলল : ভাল একটা হোটেলের খবর নেবে না ?

সে খবরও নিলুম। দেশী ও বিলিতী দু রকম হোটেলই আছে। দেশী হোটেলের মধ্যে দাসপ্রকাশ, মডার্ন লজ ও উডল্যাণ্ডস্ নাম করা হোটেল, স্যাভয় আর সিসিল ওয়েস্টার্ন স্টাইলের। এ ছাড়াও রতন টার্টাস হলিডে হোম, ওয়েলিংটন হাউস, রোজ মাউন্ট ও দুটো ওয়াই. ডব্লু. সি. এ.। এ সব জায়গায় আমিষ আহার পাওয়া যায়। কিন্তু দেশী হোটেলে সাধারণত নিরামিষ আহার। এ ছাড়াও আছে রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম, লেকের কাছে ওয়েস্টমেয়ার ইনস্পেক্সন বাংলো। কর্ণাটক সরকারের গেস্ট হাউসের নাম সুদর্শন, আর তামিলনাড়ু সরকারের টুরিস্ট বাংলো, তার সঙ্গে ক্যান্টিন আছে।

যে ড্রাইভারটি আমাদের সব খবর দিচ্ছিল, সে বলল যে এখানে ভারতবর্ষের অনেক রাজার প্যালেস আছে। শুধু মহিস্থুরের মহারাজা আর হায়দ্রাবাদের নিজামের প্যালেস নয়, যোধপুর বরোদা ও নবনগরের প্যালেসও আছে। অনুমতি নিয়ে এই সব প্যালেস দেখা যায়।

স্বাতি বলল : প্যালেস দেখতে আমরা আসি নি। আমরা—

বাধা দিয়ে আমি বললুম : যা দেখবে তা দেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মামা মামীর আর কত দেরি ?

স্বাতি বলে উঠল : এই দেখেছ, আসল কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন, আমাদের ব্রেকফাস্ট কোথায় হবে ?

আমি বললুম : একটা ভাল হোটেলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা শহর দেখতে বেরব।

কোন্ গাড়িটা ঠিক করেছ ?

যে ড্রাইভার আমাদের হোটেলে গিয়েছিল তার দিকে তাকাতেই সে ছুটে গিয়ে তার গাড়ি নিয়ে এল। মামা মামীও হোটেলের বাহিরে এসেছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

স্টেশনের ঠিক সামনেই ট্যাক্সি ও টাঙ্গার স্ট্যাণ্ড। বাসও দাঁড়ায় এইখানে, পিছনে বাসের আড্ডা। কিছু দোকানপাট, কিছু ব্যস্ততা সারাক্ষণ আছে। অনেকগুলো রাস্তা বেরিয়েছে এইখান থেকে। এক দিকে লেকে যাবার পথ, ট্রেন কুন্নুর থেকে আসে ঐ দিক থেকে। কুন্নুর মেট্টুপালায়াম ও কইম্বাতুরের বাস ঐ দিকেই যায়। আর একটা পথ উপরের দিকে উঠেছে। দু একটা বড় হোটেলের সামনে দিয়ে শহরের অন্য প্রান্তে নিচে নেমেছে। ঐ দিকেই ডোডাবেট্টার পথ, কোটাগিরি থেকে বাস আসে ঐ পথে। আর দুটো পথ কতকটা সমান্তরাল ভাবে শহরের দিকে গেছে। চেরিং ক্রস ঐ দিকে, চেরিং ক্রস উটির চৌরঙ্গী। একটা পথ ধরে আমরা ঐ দিকেই অগ্রসর হলুম।

পিছন থেকে মামা বললেন : গোপাল এমন চুপ করে আছ কেন ? ইতিহাস ভূগোলের কথা কিছু বল।

পিছন ফিরতেই স্বাতির চোখে আমি কৌতুক দেখলুম। তবু

বললুম : দেশের অন্যান্য শৈলাবাসের মতো এই শহরটাও আবিষ্কার করেছে ইংরেজ। ঠিক আবিষ্কার নয়, বলতে হয় গড়ে তুলেছে। ইংরেজরা বলে যে, ১৮১২ সালে দুজন ইংরেজ সার্ভেয়ার নাকি এখানে প্রথম এসেছিল; কিন্তু জন সুলিভান নামে কইম্বাতুরের একজন কলেক্টরই এখানে প্রথম বাড়ি তৈরি করেছিলেন বছর দশেক পরে। তারপর থেকেই ইংরেজরা আসতে শুরু করে আর দেশীয় রাজা মহারাজা। মাদ্রাজের লাট সাহেব গভর্নমেণ্ট হাউস তৈরি করে এখানেই তাঁর গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করলেন। বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ সালে এখানে কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন। বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর মেকলেও এখানে এসেছিলেন।

কথার মাঝখানেই স্বাতি বলে উঠল : গাইড বইগুলো মুখস্থ করলে কখন ?

বললুম : কথা না বলে পথের ধারে চেয়ে দেখো। হোবার্ট পার্ক আর রেসকোর্সের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি।

সত্যি, এই পথের ধারেই উটির রেসকোর্স। ছোট একখানি সবুজ মাঠ। অযত্ন ও অবহেলার মধ্যে পড়ে আছে। মে ও জুন মাসে এখানে ঘোড়দৌড় হয়। তারপরে এই মাঠের যত্ন বোধহয় নেওয়া হয় না। ঘাস উঠেছে বেড়ে, কোন বাগান বা বেড়াবার জায়গা নেই এর আশেপাশে। গল্‌ফ খেলা হয় কোন্ মাঠে তা জানি নে।

দুধারের দোকানপাট দেখতে দেখতেই আমরা এগিয়ে গেলুম। মামা বললেন : কিন্তু যাই বল গোপাল, তোমার এই উটি বড়লোকের শহর বলে মনে হচ্ছে না।

মামী বললেন : এ আবার কী রকম কথা ?

মামা বললেন: দার্জিলিঙের কথা ভাব। চৌরাস্তার দিকে এগোবার সময় কি গরিবের দেশে এসেছি বলে মনে হয় !

আমার নজর ছিল হোটেল ও রেস্তোরাঁর দিকে। একটা ভাল

জায়গায় আমাদের নামতে হবে। কিন্তু পছন্দ মতো জায়গা একটাও দেখতে পাচ্ছিলুম না। বাহির থেকে দেখেই ভিতরে যাবার ইচ্ছা হয় না। এ রকম চেহারার কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকতে মামা রাজী হবেন না। শেষ পর্যন্ত চেরিং ক্রসের কাছেই আমরা নামলুম। টুরিস্ট বাংলোটি এই জায়গার নিকটেই, কিন্তু একটা উঁচু টিলার উপরে বলে মামা এখানে থাকতে কিছুতেই রাজী হলেন না। মধ্যবিত্ত চেহারার একটা রেস্তোরাঁয় জলযোগ সেরে আমরা বেরিয়ে এলুম।

মামা আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এবারে কোথায় যাবে?

বললুম: বোটানিকাল গার্ডেনে।

স্বাতি বলল: বাগানের কোন ইতিহাস নেই?

বললুম: ইতিহাস সবারই আছে। তোমার আমার জন্মের ইতিহাস যেমন আছে, তেমনি এই বাগান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। কিন্তু সে খুব সংক্ষিপ্ত। জনসাধারণের চাঁদায় এই বাগানের পত্তন হয়েছিল ১৮৮০ সালে। এই বাগানের ভিতর দিয়েই তখন গভর্নমেন্ট হাউসে যেতে হত। একজন লাট সাহেবের নামে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে।

গল্প!

হ্যাঁ, গল্পটা ডিউক অফ বাকিংহামকে নিয়ে। ফুলের প্রচণ্ড শখ ছিল ভদ্রলোকের, আর অনেক মজুর লাগিয়ে বাগান করাচ্ছিলেন। একদিন সকালবেলায় মালিদের কাজ তদারক করছিলেন। পরনে তাঁর পুরনো জামাকাপড়, মুখে খোঁচা দাড়ি। একজন মালি চিনতে পারেনি তাঁকে। তাঁর কথায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, বাবা, এমনভাবে কথা কইছে যেন ও-ই লাট সাহেব।

স্বাতি হেসে উঠল। আর মামা বললেন: এ তোমার তৈরি গল্প নয় তো?

বললুম : এ বিলিতি গল্প নয়, এ গল্প আছে অ্যামেরিকান বই-এ।

সবই উটিতে কাছাকাছি, আমাদের ট্যাক্সি বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে ঢুকে গেল। ঢুকেই থামল না, বাগানটা ঘুরে একেবারে উল্টো ধারে একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে দাঁড়াল। বলল : আপনারা বাগান দেখে বাইরে আসুন, আমি সেখানে অপেক্ষা করব।

বলে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডোডাবেটা পাহাড়ের নিচে ধাপে ধাপে সাজানো এই বাগানটি দেখতে বেশ সুন্দর। নানা জাতের মরসুমি ফুল ও পাতার গাছ নানা কায়দায় লাগানো হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে ফুল এখনও ফোটে নি, ফুল ফুটতে আরও কিছু দেরি আছে। সে সময় এই বাগানে বাৎসরিক প্রদর্শনী হবে ফুলের। বিলাতের বিখ্যাত কিউ গার্ডেনের মিস্টার মেলভার নামে এক সাহেব উটির এই উদ্যান রচনা করেছিলেন। সাড়ে ছ'শো জাতের গাছ এই বাগানে আছে। সুন্দর বাগান সন্দেহ নেই, কিন্তু কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো বড় নয়। মামা বললেন : দার্জিলিঙের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সঙ্গে এর কিছু মাত্র মিল নেই, সে বাগান পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে নিচে নেমেছে।

পরিচ্ছন্ন সুন্দর পথ ধরে আমরা বাহিরে বেরিয়ে এলুম। গাড়িতে উঠে বসতেই মামা বললেন : এবারে কোথায় ?

বললুম : উটি লেক।

স্টেশনের দিকে আবার আমাদের ফিরতে হল। উটির শৌখিন বাজার হল চেরিং ক্রসে, আর স্টেশনের পথে উটি মার্কেট। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বাঁধানো এলাকার মধ্যে ঢুকতে হয়। ফলমূল শাকসব্জি সব পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু পরে দেখেছিলুম যে হোটেলে এ সব সব্জির চল নেই। কপি কড়াইশুঁটি টম্যাটো পাওয়া যায় যথেষ্ট, কিন্তু হোটেলে কচু জাতীয়

সব্জি, আর গাজর। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন : প্রায় না খেয়েই আছি। সব্জি মুখে দেওয়া যায় না, আর মাছ মাংস পাওয়া যায় না সব হোটেলে। আর পাওয়া গেলেও এই নোংরা পরিবেশের মধ্যে খেতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই দুঃখে তিনি এক ঝুড়ি সব্জি নিয়ে মাদ্রাজে যাচ্ছেন। সস্তাও বটে, আর এ সব সব্জি মাদ্রাজে বেরোতে এখনও অনেক দেরি আছে। যথেষ্ট নারকেল পাওয়া যায় এখানে, কিন্তু নারকেলের মিষ্টির তেমন প্রচলন নেই। শুধু রান্নায় এই নারকেলের ব্যবহার।

উটি মার্কেট দেখে স্টেশনের সামনে দিয়ে চলে গেলুম লেকের ধারে। বোট ক্লাবের কাছে গিয়ে আমাদের গাড়ি দাঁড়াল।

এখানেও আমরা নামলুম। কিন্তু মামা এই লেক দেখে খুশী হলেন না, বললেন : এর চেয়ে আমাদের কলকাতার লেক ভাল।

দু বর্গমাইল বিস্তারের এ একটি কৃত্রিম জলাশয়। মিস্টার সুলিভান এর পরিকল্পনা করেছিলেন। জল খুব টলটলে নয়, পরিচ্ছন্ন নয় চারি দিক। তবু এখানে অনেকে আসে নৌকা বাইতে, মাছ ধরতেও আসে। তার জন্যে নিশ্চয়ই অনুমতির দরকার। নৌকোয় চড়তে হলে বোট ক্লাবের স্মরণ নিতে হয়।

স্বাতি বলল : নৌকোয় চড়বে গোপালদা ?

আমি একবার ঘড়ির দিকে তাকালুম, তারপরে তাকালুম মামার মুখের দিকে। মামা বললেন : আর কিছু দেখবার নেই নাকি!

স্বাতি সকৌতুকে বলল : বল না সেই নামগুলো।

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম : টোডাদের একটা গ্রাম দেখবেন কী ?

মামা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : টোডা!

বললুম : নীলগিরির আদিবাসী হল এই টোডা। উটি আসবার সময় বাসে তাদের দেখেন নি!

মামা বললেন : লক্ষ্য করি নি তো।

আমি বললুম : জনকয়েক টোডা ছিল আমাদের সঙ্গে। গুডালুর থেকে উঠেছিল, নেমে গেছে মুকর্টি পাহাড়ের নিচে। ঐ পাহাড়ে ওদের বড় বস্তি, আর পাহাড়ের চূড়োটা তাদের তীর্থস্থান।

স্বাতি বলল : অত দূরে যাবার দরকার নেই। কাছেই কোন গ্রাম থেকে ঘুরে আসা যাক।

মামা বললেন : সেই ভাল।

আবার আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম, আবার চললুম স্টেশনের দিকে। সেখান থেকে অন্য একটা পথ ধরে আমরা উপরে উঠে গেলুম। পথের ধারে রতন টাটার হলি-ডে হোম দেখলুম, আর দেখলুম অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্যাভয় হোটেল ও তার ছোট ছোট কটেজগুলি। বেশি দূরে আমাদের যেতে হল না। যেখানে আমরা নামলুম, সেখানে টোডাদের গ্রাম নয়, ছোট একটা বস্তি। রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে ড্রাইভার আমাদের ডেকে বলল : আসুন আমার সঙ্গে। আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।

৩

সরু পথ ধরে আমরা খানিকটা উপরে উঠে গেলুম। এ জায়গাটা আর উটি বলে মনে হচ্ছে না। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা ছোট একটুখানি প্রাঙ্গণের মতো, তাও উঁচু নিচু, সমতল নয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো। উপরে নিচে নানা স্থানে কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। অদ্ভুত দেখতে এই কুঁড়ে ঘরগুলি। মনে হবে যে গরুর গাড়ির জন্য বড় বড় ছই মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। এই কুঁড়েগুলির নির্মাণের গড়ন একই রকম। ভিৎ নেই, দেওয়াল নেই, সমস্তটাই ছাদ অধবৃত্তাকারে তৈরি। ভিতরে মানুষ বোধহয় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু প্রবেশের জন্য কোন পথ দেখতে পেলুম না। জানলাও নেই কোন। কিন্তু প্রত্যেকটি কুঁড়ের সামনে একটুখানি করে পরিষ্কার অঙ্গন আছে, আর পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে একটি দেওয়াল। এই অঙ্গনের কাছে এসে দেখতে পেলুম যে খুব ছোট একটি দরজা আছে। কুঁড়ের সামনে ও পিছনে দেওয়াল আছে ছাদ পর্যন্ত। সেই দেওয়ালের গায়ে ছোট দরজাটি মুরগির ঘরের দরজার মতো। যে কোন আকারের মানুষকে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়, শুধু শিশুরা হয়তো সোজা হয়ে যাতায়াত করতে পারে। আমাদের কৌতূহল লক্ষ্য করে ট্যাক্সির ড্রাইভার বলল: এই সব কুঁড়েকে বলে পট্‌স্।

তারপরেই অঙ্গনে নেমে গিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল, আর কথা বলতে লাগল ভিতরের লোকজনের সঙ্গে। একটু পরেই পিছন ফিরে বলল: আসুন।

আমার আগে স্বাতি নেমে গেল নিচে। উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরটা। তারপরে সে একটু সরে আসতে আমিও দেখলুম।

একটি স্ত্রীলোক রান্নাবান্না করছে। আরও দু-তিনজন কিছু করছে কিনা অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মামা বললেন: কী দেখলে?

বললুম: ভাল দেখতে পেলুম না।

কিন্তু স্বাতি বলে উঠল: ঘরের ভিতর রান্না করছে বাবা।

দেখতে দেখতেই আরও দু-তিনটি কুঁড়ে থেকে জনকয়েক মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এল। আর কয়েকটি ছেলে মেয়ে। দু-একজনের হাতে বই খাতাও আছে। কেমন একটু স্বতন্ত্র জাতের মনে হল এদের। যেন এ দিকের আর দশটা লোকের সঙ্গে মিল হচ্ছে না কোথাও। আমি তাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলুম।

পুরুষদের মুখে ঘন চাপদাড়ি। রঙ তাদের কালো নয় এ দেশের লোকের মতো, ফর্সাও নয় বিদেশীদের মতো। আমাদের দেশের ফর্সা লোকের রঙ রোদে পুড়ে যেমন তামাটে হয় কতকটা সেই রকম। কারও গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল। সুশ্রী গড়ন অভিজাত পরিবারের মতো। কেউ একখানা কাপড় কোমরে জড়িয়ে উপর দিকটা বাঁ কাঁধে ফেলেছে, কেউ একখানা চাদর জড়িয়েছে গায়ে। পা পর্যন্ত কারও নামে নি, হাঁটুতেই শেষ হয়েছে।

মেয়েদের দিকেও চেয়ে দেখলুম। তারা কাপড় বেঁধেছে বুকের উপরে, সেই কাপড় হাঁটুর নিচে অবধি নেমেছে। কারও দুটো কাঁধই খোলা, কারও বা বাঁ দিকের কাঁধ কাপড়ে ঢাকা পুরুষদের মতো, বুকের উপরে বাঁধা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: এদের একখানা ছবি তুলব গোপালদা, ব্যবস্থা করে দাও না!

আমি আমাদের ড্রাইভারকে বলতেই সে তাদের এই কথা জানাল। তারা দু মিনিট সময় চাইল। আমি আশ্চর্য হয়েছি দেখে বলল: ভাল করে সেজে আসবে বলছে।

আমি বললুম : না না, সাজবার দরকার নেই। এমনিতেই বেশ দেখাচ্ছে এদের।

কিন্তু মেয়েরা মানল না। তারা নিজেদের কুঁড়ের ভিতরে গিয়ে তখুনি বেরিয়ে এল। দেখা গেল যে একখানা লম্বা চাদর জড়িয়ে এসেছে। আপাদমস্তক ঢেকে গেছে তাদের, আর চাদরের রঙীন আঁচলখানা ঠিক বুকের উপরে। এই সুতোর চাদরখানি দেখলুম তাদের গৌরবের বস্তু। ড্রাইভার বলল : এই চাদরের নাম পুদ্‌কুলি।

স্বাতি ব্যস্ত হল ছবি তোলবার জন্য, আর আমার মনে পড়ল নীলগিরি পাহাড়ের অধিবাসীদের কথা। সাহেবদের লেখা একখানা বই পড়েছিলুম অনেক দিন আগে। টোডাদের ছবিও আমি দেখেছিলুম। টোডা আর কুরুম্বর হচ্ছে নীলগিরির আদিম অধিবাসী। কুরুম্বররা একেবারে জংলী। কোমরে সুতো বেঁধে সামনে এক ফালি কাপড় ঝুলিয়ে লজ্জা নিবারণ করে। এ ছাড়াও আছে ইয়েনাডিস নামে এক জংলী জাত। কাপড় পরে কতকটা টোডাদেরই মতো, তবে চুল রাখে বড় বড়, আর বড় রুক্ষ তাদের চেহারা। এদের চেয়ে সভ্য মনে হয় বেত্থর বা ভেদাদের। তারা ধুতি পরে, জামা গায়ে দেয়, চাদরও জড়ায়, মাথায় আবার মস্ত বড় পাগড়ি।

আমার মনে পড়ছিল অনেক দিন আগের কথা, আর্যরা যখন প্রথম এসেছিল দক্ষিণ ভারতে, আর এ দেশের লোককে রাক্ষস নাম দিয়ে গভীর ঘৃণায় দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এরাই কি সেই রাক্ষসের বংশ!

ভারতের সে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। আজ আমরা যে কোন মতই প্রচার করি না কেন, এ কথা মানতেই হবে যে এ দেশের আদিবাসীরাই ছিল ভারতের আদিম অধিবাসী। এই দ্রাবিড় জাতি একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তারা তাদের ইতিহাস লিখে যায় নি, মুখে মুখে এমন কোন কাহিনীও চলে আসছে না যাতে তাদের

সত্যিকার পরিচয় আজ পাওয়া যেতে পারে। পাথরের তৈরি যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে—ছুরি আর হাতুড়ি, বর্শা আর তীরের ফলা, তাতে জানা যায় যে ধাতুর আবিষ্কারের আগেও একটা সভ্যতা ছিল, যা হয়তো তৃতীয় যুগের ব্যাপার। সবচেয়ে পুরনো সমাধিতে কোন ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় না। যা পাওয়া যায় পরবর্তী যুগের স্থাপত্যে, তাতে এমন নৈপুণ্যের পরিচয় যে তাদের সভ্যতার দুরন্ত অগ্রগতিকে মানতেই হবে।

ভারতের ইতিহাসের পত্তন হয়েছিল আর্যদের কাব্য ও শ্লোকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আজ যা কিছু আমরা জেনেছি, তা এই সব লেখা থেকে। আর্য ঋষিরা সেদিন ভারতের আদিম অধিবাসীকে দেখেছিলেন ঘৃণার চোখে, তাই এদের জীবন-যাত্রায় ভাল কিছুই খুঁজে পান নি। বলেছেন, কালো ঠোঁটের কুৎসিতদর্শন লোক এরা, থ্যাবড়া নাক আর ছোট ছোট চোখ এদের। কথা বলে না তো, করে কিচির মিচির। এমন জাদু জানে যে নদীর জলও শুকিয়ে দিতে পারে। এদের দেবতারাও অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। অল্প দিনেই আর্যরা তাদের নাম দিয়ে দিলেন রাক্ষস, বললেন, এদের জ্বালায় যাগযজ্ঞ আর করা যাবে না।

কিন্তু এই আদিবাসীদের মধ্যে কি সত্যিই কোন উন্নত জাতি ছিল না! আর্যদের বেদগানে নাই বা পেলুম তাদের সভ্যতার পরিচয়, কিন্তু তাদের সব কথাই তো নিঃশেষে মুছে যায় নি! তাদের ভাষা ও শব্দ সংগ্রহের যতটুকু আছে, তা থেকেও তাদের সভ্যতার কথা জানা যায়। বিশপ কল্‌ড্‌ওয়েল এদের সঙ্গে এক যুগ কাটিয়েছেন, তাদের ভাষা শিখে অনেক কথাই জানতে পেরেছেন। আর্যরা এ দেশে আসবার আগে তাদের রাজা ছিলেন। তাঁরা পাকা বাড়িতে থেকে ছোট ছোট রাজ্য শাসন করতেন। তাঁদের চারণ ছিল, ভোজের সময় তারা গান গাইত। নিজস্ব বর্ণমালা ছিল তাদের, আর তালপাতার উপরে স্টাইলাস দিয়ে তারাও বই লিখত। এই

রকমের অনেকগুলো তালপাতা জড়িয়ে তাদের পুঁথি হত এক একখানা।

তাদের আইন ছিল, কিন্তু বিচারক ছিল না। আইনের গণ্ডগোল বাধলে তারা অতীতের নজির দিয়ে বিচারের রায় দিত। তারা বিয়ে করা জানত, বিবাহিত জীবনের মর্যাদা দিতেও শিখেছিল। পাপ-পুণ্য ও স্বর্গ-নরকের নাম তারা শোনে নি. আত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণা তাদের ছিল না। তাদের দেবতার মূর্তি ছিল না, পুরোহিতও ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস ছিল ভগবানের অস্তিত্বে, ভগবানের নামে মন্দিরও তৈরি করেছিল। এই মন্দিরকে তারা কো-ইল বলত—ভগবানের ঘর। দ্রাবিড়দের এই অনার্য শব্দটি আজও অবিকৃত ভাবে চলে আসছে, দক্ষিণ ভারতের মানুষ আজও মন্দিরকে বলে কোইল। মাদুরার কাছে আলাগার কোইল নাম শুনেছি, আর কন্যাকুমারী যাবার পথে দেখেছি নাগের কোইল।

একটি কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লেগেছে। ভগবানে এদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু দেবতার কোন মূর্তি ছিল না। এরা মন্দির নির্মাণ করেছে, কিন্তু এদের পুরোহিত ছিল না। এদের উপাসনার পদ্ধতি তাহলে কেমন ছিল, সে কথা কেউই বলেন নি।

শোনা যায় যে বুধ আর শনি ছাড়া অন্য সব গ্রহ তাদের চেনা ছিল। তাদের সমাজে ডাক্তার না থাকলেও নানারকম ওষুধের ব্যবহার তারা জানত। ধাতুর ব্যবহারও শিখেছিল, কিন্তু টিন সীসে আর দস্তার নাম তারা শোনে নি। এক শো পর্যন্ত তারা গুনতে পারত, কখনও কখনও হাজার পর্যন্তও পারত। তবে আর্যদের মতো লক্ষ কোটির গণনা তাদের জানা ছিল না।

তাদের গ্রাম ছিল, শহর ছিল না। ছোট বড় নৌকো বাইত, এমন কি সমুদ্রে জাহাজ চালাতেও শিখেছিল। সমুদ্র পেরিয়ে তারা শুধু সিংহলে যেত, কিন্তু দূর দেশে যেত বলে শোনা যায় না। কৃষিকার্য ছিল তাদের জীবিকা, আর লড়াই করে তারা আনন্দ

পেত। ঢাল তলোয়ার ও তীর ধনুক নিয়ে তারা যুদ্ধ করতে যেত। নানা রকমের জিনিসপত্র তৈরির ব্যাপারে তারা আশ্চর্য রকমের নিপুণ ছিল। সুতো কাটা রঙ করা ও কাপড় বোনায় তাদের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। নিখুঁত ভাবে তারা মাটির বাসন তৈরি করত। তার নমুনা পাওয়া গেছে পুরনো সমাধি খুঁড়ে। উন্নত ধরনের শিল্প ও বিজ্ঞান তাদের জানা ছিল না। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বোঝাবার মতো কোন শব্দ যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না জ্যোতির্বিদ্যা দর্শন বা ব্যাকরণ বোঝাবার মতো প্রতিশব্দ। তারা ভাবতে জানত, কিন্তু সেই ভাবনার সব কথা প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত শব্দ ছিল না তাদের ছোট অভিধানে।

ছবি তোলা শেষ করে স্বাতি গল্প করছিল টোডা মেয়েদের সঙ্গে। কোন্ ভাষায় কথা বলছিল জানি নে, কিন্তু কাছে গিয়ে তাকে বাধা দেবার ইচ্ছা হল না। বড় আমুদে দেখছিলুম টোডাদের। কথা বলছে যত, হাসছে তার চেয়ে বেশি। প্রাণের প্রাচুর্য উথলে উঠছে তাদের ভঙ্গিতে।

খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মামা ও মামী। আমি তাঁদের কাছে ফিরে এলুম। মামী জিজ্ঞাসা করলেন: স্বাতি ওদের সঙ্গে কী কথা বলছে?

মামা বললেন: শুধু হাসছে দেখছি।

এক সময় সেও ফিরল, বলল: চল এইবারে।

ছোট একখানা পাকা বাড়ি আমরা আসবার সময় দেখতে পাই নি। ছোট ছেলেমেয়েরা তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় এই বারান্দায় বসে তারা পড়াশুনো করছিল। স্বাতি তাদের সঙ্গে কথা কইল কয়েকটা। ইংরেজীতে কথা, তারা উত্তর দিল ভাঙা ইংরেজীতে।

একখানা ইংরেজী বইএ এই টোডাদের সম্বন্ধে আমি অনেক অদ্ভুত কথা পড়েছিলুম। গাড়িতে বসে সেই সব কথাও আমার মনে পড়ে গেল।

টোডাদের মেয়েরা নাকি আমাদের মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো ছিল। মেয়েরা বহুবিবাহ করত, কতকটা বাধ্য হয়েই করত। এদের একটা মেয়ে যখন কোন লোককে বিয়ে করত, তখন বাড়ির অন্য পুরুষেরাও তার উপরে সমান অধিকার লাভ করত। এমনকি বিয়ের পরেও যদি তার স্বামীর কোন ছোট ভাই জন্মাত, তাহলে সেই নবজাতকও বড় হয়ে সেই মেয়েকে স্ত্রী বলে দাবী করত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে একটি মেয়ের স্বামী হত এক পরিবারের সবকটা ভাই, আর স্ত্রী নিয়ে সংসারে কোন বিবাদ-বিসংবাদ হত না, পরম শান্তিতে তারা একত্র বাস করত। কখনও কখনও দেখা গেছে যে একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে এমন পাঁচজনের সঙ্গে যারা এক পরিবারের নয়, কিংবা এক গ্রামেরও নয়। ব্যাপারটা তখন বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াত। আমাদের বাংলাদেশে কুলীন জামাইদের মতো সেই মেয়েকে এক এক মাস কাটাতে হত এক এক স্বামীর কাছে।

এদের বিবাহ পদ্ধতিও বেশ মজার। টোডা পুরুষ কোন মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে সেই মেয়ের বাপের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইতে হয়। নীল আকাশের নিচে কোন খোলা জায়গায় দু-পাঁচজন মেয়ে পুরুষের সামনে ভাবী বর মেয়ের বাপের পায়ের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সেই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করবে। আর মেয়ের বাপ এক পা তুলে তাস্কেল বলে এই বিবাহ মঞ্জুর করবে। বিবাহ ব্যাপারটা তাদের বড় সরল। বর একখানা হাতির দাঁত আর ছোট ছোট মুক্তো বা পুঁতির মালা কনের গলায় পরিয়ে দেবে হাসতে হাসতে। বিয়ের চুক্তি স্বাক্ষর এতেই হয়ে গেল। তারপরে আত্মীয় বন্ধুদের ভোজ হবে হুল্লোড় করে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটে তাদের ছেলে হবার আগে। ছেলের বাপ বলে কাকে মানা হবে, তা ঠিক করবার একটা নির্দিষ্ট রীতি আছে তাদের ভিতর। স্বামীরা একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের ভিতরে

ঠিক করে নেয়। তারপর সে কথা সমাজে জানাবার জন্যে সাত মাসে একটা অনুষ্ঠান করে। অমাবস্যার আগের সন্ধ্যায় উৎসব শুরু হয়। সেই ঠিক-করা হবু ছেলের বাপের সঙ্গে স্ত্রী যাবে গ্রামের কাছে কোন বনের ভিতর। সেখানে একটা গাছের গুঁড়িতে একটি ত্রিকোণ গর্ত করে মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রী তারপরে বনের ভিতর খুঁজে-পেতে কাঠ আর ঘাস দিয়ে একটি ছোট তীর ধনুক তৈরি করবে। স্বামী সেই তীর ধনুক স্ত্রীকে উপহার দেবে পিতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ। সে সময় তাদের আত্মীয় পরিজন এই দুজনকে ঘিরে দাঁড়াবে। কিন্তু গাছের কোটরের জলন্ত প্রদীপটি না নেবা পর্যন্ত গ্রামে ফিরতে পাবে না। স্বামী-স্ত্রী কিন্তু সেদিন সেই গাছের নিচে বসেই একসঙ্গে আহার করবে। আত্মীয়-স্বজনেরাও খেয়েদেয়ে ফিরে এসে সারা রাত একসঙ্গে ঘুমোবে বনের ভিতর! পরদিন প্রত্যূষে সবাই গ্রামে ফিরলে বিরাট ভোজ হবে দিনের বেলায়।

এই তীর ধনুকের অনুষ্ঠান হবার আগেই যদি কোন মেয়ের ছেলে হয় তো সে ভারি কেলেঙ্কারীর কথা। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক। সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে এই তীর ধনুক দেওয়া স্বামী হল সমস্ত সন্তানের পিতা। যে সন্তান জন্মাচ্ছে ও ভবিষ্যতে যে সব সন্তান জন্মাবে, তাদের পিতা স্থির হয়ে গেল এই উৎসবের মধ্য দিয়ে। সমাজ নির্বিবাদে এই বিধান চিরদিন মেনে চলবে।

ইংরেজ আজও দাবী করে যে আমাদের দেশের অনেক বর্বরতা তারা আইন করে দমন করেছে। যেমন সতীদাহ নিবারণ। টোডাদের সম্বন্ধেও তেমনি তারা দাবী করে যে আইন করে টোডাদের শিশুকন্যা হত্যা বন্ধ করতে হয়েছিল। একটি কন্যার জন্যে যদি পাঁচটি পুরুষের দরকার হয় তো চারটি মেয়েকে শৈশবেই হত্যা করা দরকার। আইনের জোরেই যে এ প্রথা দমন হয়েছে তা মনে হয় না। আইন না হলেও তা এক দিন বন্ধ হত। কিন্তু এ প্রথা বন্ধ হবার পরে

সমাজে মেয়ের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু টোডারা তাদের পুরনো বিবাহ-রীতি বদলায় নি, পরিবারে বাড়তি মেয়েদের একই অধিকারে স্থান দিয়েছিল। সমাজের গঠন গিয়েছিল বদলে, মেয়েদের বহুবিবাহ হয়েছিল কতকটা যৌন স্বাধীনতার মতো।

টোডারা অবশ্য তাদের শিশু হত্যার একটা কারণ দিত। বলত যে অতীতে তাদের কঠিন দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি পাবার এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। দারিদ্র্যের জন্য নবজাত শিশুকে যখন হত্যা করতে হবে, তখন ছেলের চেয়ে মেয়ে হত্যা করাই ভাল। মেয়েরা তো দারিদ্র্য লাঘব করে না, পরিবারকে ভারাক্রান্ত করে তারা। তারপরেই তাদের বিবাহ-রীতি বদলাতে হয়েছিল। একটা সমস্যা এড়াতে গিয়ে আর একটা সমস্যা বড় হয়ে উঠেছিল। সমাজে বিবাহযোগ্য পুরুষ যত, মেয়ে তত নেই। কাজেই একটি মেয়ের পাঁচটি পুরুষের সঙ্গে ঘর করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

উটি থেকে মাইসোরের পথে ষোল মাইল দূরে মুকুর্টি পাহাড় হল টোডাদের তীর্থস্থান, নবজাত কন্যাকে হত্যার জন্য তারা এই পাহাড়ের চূড়ায় তাকে নিয়ে যেত। এই পাহাড়ে বেড়াতে গেলে টোডাদের জীবনযাত্রার অনেক কিছু জানা যায়। এদের কফিনগুলো দেখবার মতো। পাথরে ঘেরা এক একটি চক্রাকার জায়গা আছে পাহাড়ের নানা স্থানে। তাদের মধ্যে মূর্তি, তৈজসপত্র ও নানা রকমের পুরনো জিনিস রক্ষিত আছে।

পুরনো পথ ধরে আমরা ফিরছিলুম। শহরের কাছাকাছি এসে একটি মেয়েকে দেখতে পেলুম পথের উপরে। গোলাপী প্যারাসল হাতে একটি ফর্সা মেয়ে রাস্তার এক ধার ঘেঁষে হাঁটছিল। এক নজরে আমি তাকে দেখে নিলুম। পরনে গোলাপী রঙের হাল্কা সিল্কের শাড়ি। গায়ে জামা নেই, কিন্তু এমন সুষ্ঠুভাবে কাপড় জড়ানো যে প্রথমটা তা চোখেই পড়ে না। মাথার চুলগুলো খোলা

থোকা থোকা হয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। গলায় একটা সোনার বিছেয় গোটা কয়েক গিনি ঝোলানো। বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ আর ডান হাতে ছাতা। কড়ে আঙুলের আংটির পাথরটিও দেখতে পেয়েছিলুম।

কিন্তু স্বাতি যে পিছন থেকে আমাকেও লক্ষ্য করেছিল, তা বুঝতে পারলুম তার কথা শুনে। বলল: টোডা মেয়ে নয় গোপালদা?

আমিও এই কথাই ভাবছিলুম। একটু আগে যে টোডা মেয়েদের দেখে এলুম, তাদের সঙ্গে যেন মিল দেখেছি কোথাও। বললুম: তাই মনে হচ্ছে।

আমাদের কথা শুনে ড্রাইভার বলল: টোডারা আজকাল অনেক উন্নতি করেছে। সম্প্রতি একজন টোডা মেয়ে ডাক্তারী পাস করে হাসপাতালে কাজ করছে।

স্বাতি বলে উঠল: সত্যি!

ড্রাইভার বলল: সবাই আজকাল লেখাপড়া শিখছে।

স্বাতি এ কথা মেনে নিল। বলল: তাই তো দেখলাম। টোডারা আর বেশি দিন টোডা থাকবে না।

৪

মামীর পরামর্শে আমরা দুপুরের আহার সেরে হোটেলে ফিরলুম। আকাশ মেঘলা দেখেই তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাতি হোটেলে ফিরে বসে থাকতে রাজী হল না, বলল : সারা দিন কি বসে কাটানো যায়!

মামী বললেন : কেন, বিকেলে আবার বেরনো যাবে !

বৃষ্টি নামলে কী হবে !

মামা বললেন : পাহাড়ে কিছুই বিচিত্র নয়।

স্বাতি বলল : সেইজন্যেই তো বলছি, যা কিছু দেখবার আছে এই বেলাতেই দেখে আসি।

মামী বললেন : দেখবার আর বাকি আছে কী ?

কেন, আসল জিনিসই তো আমরা দেখি নি। ডোভাবেটায় উঠে উটি শহরটা দেখতে কেমন লাগে, তাই তো আমাদের দেখা হয় নি।

মনে মনে মামী খুবই বিরক্ত হলেন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। মামা বললেন : কেন ওদের শাস্তি দিতে চাও বুঝি না।

উৎফুল্ল মুখে স্বাতি বলে উঠল : চলে এসো গোপালদা, আর দেরি কোরো না। যেতে আসতে অনেক সময় লাগবে।

মামা বললেন : কিছু টাকা নিয়ে যাও সঙ্গে, ঐ ব্যাগের মধ্যে আছে।

স্বাতি বলল : আমার কাছেও আছে।

বলে স্বাতি বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় চলতে চলতে বলল : কোথায় যাওয়া যায় বল তো ?

আমি বললুম : ভোডাবেটায় উঠবে বললে যে।

তার চেয়ে ভাল জায়গা কি আর নেই ?

কুন্নুর আর কোটাগিরি আছে।

স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়ে স্বাতি বলল : ঠিক বলেছ। এখন কোন ট্রেন আছে কিনা দেখি গিয়ে।

স্টেশনে গিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। নীলগিরি এক্সপ্রেস ছাড়ছে। খেলনার মতো ছোট গাড়ি, তিন-চারখানা বগি আর ইঞ্জিন, নীল রঙের ট্রেন। যাত্রীরা সব উঠে বসেছে। স্বাতি আর একমুহূর্ত ভাবল না, দুখানা কুন্নুরের থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে এনে উঠে পড়ল। আমাকে একটুখানি জায়গা দিয়ে বলল : বোস এইখানে।

অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল সে। সেই ভাবটা কেটে যেতেই বলল : এ খুব ভাল হল, তাই না গোপালদা ?

আমি কোন উত্তর দিলুম না। সে নিজেই আবার বলল : লোকে বলে যে ট্রেনে উটি না এলে নীলগিরি পাহাড়ের সবটুকু সৌন্দর্য দেখা হয় না। দেখতে পাবে তো তুমি ?

বলে আমার দিকে তাকাল।

স্বাতি জানলার ধারে বসেছিল, আর আমি ভিতরের দিকে। হেসে বললুম : সব দেখতে পাব।

স্বাতি রাগের ভান করে বলল ? হাসলে যে ?

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : হাসি কান্নায় মানুষের মৌলিক অধিকার, সরকার এখনও তা কেড়ে নেয় নি।

স্বাতি বলল : অধিকারের প্রশ্ন তুলছি না, আমি তোমার হাসির কারণ জানতে চাইছি।

তোমার আনন্দ আমার মনেও সঞ্চারিত হয়েছে, তাই হাসছি।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না, বলল : দেখ দেখ।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্ল্যাটফর্মে আমি দুজন বিদেশী মহিলাকে দেখতে পেলুম। একটা বেঞ্চির উপরে পাশাপাশি বসে আছে। একজন বয়স্ক, আর একজন খুবই নবীন। কিন্তু দুজনেরই রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন দেহ। একজনের গায়ে একটা উলের জামা, আর একজন একখানা সস্তা বেডকভার জড়িয়েছে গায়ে। একজনের খালি পা, আর একজনের পায়ে একজোড়া রবারের চটি। স্বাতি বলল : এরা কারা গোপালদা ?

আমি বললুম : হিপি।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল, বাঁশি বাজল, তারপরে আমাদের নীলগিরি এক্সপ্রেস ছাড়ল। স্বাতি বলল : এদেরই হিপি বলে ?

আমি বললুম : তাই তো মনে হয়।

ছেলেমানুষের মতো স্বাতি বলল : হিপিদের সম্বন্ধে কিছু বল না।

আমি বললুম : কতটুকু জানি যে বলব।

যতটুকু জানো।

হিপি কোন দেশের কোন জাত নয়, সব দেশের ছেলে মেয়েরাই হিপি হচ্ছে, আর সারা বিশ্বে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবস্থা ভাল নয়, ভাল লেখাপড়া শেখে নি, উপার্জনের ক্ষমতা নেই। অথচ অনেক কিছু দেখবার ও জানবার শখ আছে, নানা ভাবে উপভোগ করতে চায় জীবন। কে কেমন করে পয়সা পাচ্ছে জানি নে, বড়লোক যে দু-চারজন নেই তাও নয়। নানা রকম ফন্দি ফিকির জানে অনেকে, নেশা করে নানা রকম, আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা দেশে। নেপালের কাঠমণ্ডুতে শুনেছি হিপিদের কলোনি আছে। অনেকে আবার ওদের সন্দেহের চোখেও দেখে। বলে ওদের মধ্যেই আছে কোন কোন দেশের চর। আবার কেউ বলে যে আমেরিকার ছেলে মেয়েরা ভিয়েৎনামের যুদ্ধের ভয়ে

আঠারো বছর বয়স হবার আগেই হিপি সেজে দেশ থেকে পালিয়েছে।

স্টেশনের এলাকা ছেড়ে আমাদের ট্রেন খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। পথের ধারে উটির লেক দেখতে পেলুম, আর কুন্নুরে যাবার রাজপথ। কিছু ঘর বাড়ি পেরিয়ে উটি ফুরিয়ে গেল। এবারে শুধু পাহাড়ের দৃশ্য। যে দৃশ্য দেখার জন্যে স্বাতি ব্যস্ত হয়েছিল, সেই দৃশ্য দেখতে পেলুম পথের দুধারে।

উটি দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস, কোডাইকানালের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। এই জন্যেই উটিকে বলে পাহাড়ের রানী, কেউ বা আদর করে বলে স্নুটি-উটি। এর ভাল নাম কিন্তু উটাকামণ্ড্। মুণ্ড্ মানে কুঁড়ে ঘরের গ্রাম। এক সময়ের এই কুঁড়ে ঘরের গ্রামই এখন উটি নামে পাহাড়ের রানী হয়েছে। কিন্তু নীলগিরি পাহাড়ে উটি একমাত্র শহর নয়, কুন্নুর আর কোটাগিরি নামে আরও দুটি শহর আছে। দক্ষিণ ভারতের লোকেরা কুন্নুরের উপর দিয়ে উটি আসে। মাদ্রাজ থেকে যে নীলগিরি এক্সপ্রেস ছাড়ে, তা বড় লাইনের গাড়ি। সেই ট্রেন কোইম্বাতুর থেকে ডান দিকে ফিরে মেট্টুপালায়াম আসে। সেখানে গাড়ি বদল করে এই ছোট লাইনের ট্রেনে পাহাড়ে উঠতে হয়। মেট্টুপালায়ামে আসবার জন্য আর কোন থ্রু ট্রেন নেই। শুধু মাদ্রাজ থেকে নয়, কোচিন বা ম্যাঙ্গালোরের দিক থেকে এলে কোইম্বাতুরে নামতে হয়। সেখান থেকে শাখা লাইনের ট্রেনে মেট্টুপালায়াম। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খান কয়েক ছোট লাইনের গাড়ি ছাড়ে; বিকেলে আর ট্রেন নেই। বিকেলে এলে মেট্টুপালায়ামের রিটায়ারিং রুমেই রাত কাটাতে হয়, কিংবা বাস ধরতে হয় স্টেশনের বাহিরে গিয়ে।

উত্তর ভারত থেকে যাঁরা উটি বেড়াতে আসেন, তাঁরা সব সময় মাদ্রাজে এসে নীলগিরি এক্সপ্রেস ধরেন না। বিশেষত যাঁরা হায়দ্রাবাদ বা ব্যাঙ্গালোরের দিক থেকে আসেন, তাঁরা মাইসোরে

এসে উটির বাস ধরেন। শুধু যে সময় সংক্ষেপ হয় তা নয়, পয়সাও কম লাগে, আর পথের সৌন্দর্য দেখেও মুগ্ধ হতে হয়।

আমরা কালিকট থেকে বাসে এসেছি। সকাল সাতটায় আমাদের বাস ছেড়েছিল। পশ্চিমঘাট পর্বত ডিঙিয়ে নীলগিরি পাহাড়ের উপর উটি পৌঁছুতে ঘন্টা সাতেক সময় লাগে। দূরত্ব একশো মাইলের মতো। কিন্তু আমরা বিকেল চারটেয় এসে পৌঁছেছি। ট্রেনে এলে আমাদের একটা দিন বেশি সময় লাগত, পয়সাও খরচ হত অনেক। গুডালুর নামে একটি পাহাড়ী শহরে আমরা দুপুরের আহার সেরে নিয়েছিলাম। এই শহরটি তামিলনাড়ু রাজ্যে। কেরালা রাজ্যের কালিকট বা কোড়িকোড থেকে দুটো পথ এসে মিলেছে গুডালুরে পৌঁছবার কিছু আগে। সেখান থেকে একটি পথ উত্তরে মাইসোরে গেছে, তার দূরত্ব ষাট মাইল। অন্য পথটি দক্ষিণ-পূর্বে উটি এসেছে, দূরত্ব চব্বিশ মাইলের কম। এখন আমরা দক্ষিণে চলেছি কুন্নুরের দিকে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কি ভাবছ বল তো?

আমি বললুম : পথের কথাই ভাবছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে বললুম : বছর দশেক আগে আমি ভবানীসাগর পরিকল্পনার কথা শুনেছিলুম। ভবানী নামে একটি নদী নেমেছে পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে। সেই নদীকে বেঁধে পাঁচ মাইল লম্বা একটা ড্যাম তৈরি হচ্ছে শুনেছিলুম। মেট্টুপালায়াম থেকে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্বে এই নির্জন জায়গাটি এখন নাকি জনবহুল শহরে পরিণত হয়েছে।

স্বাতি বলল : এখানে তোমার ভবানীসাগরের কথা কেন মনে পড়ছে?

বললুম : তোমার কাগজপত্রের মধ্যে এই লাইনের একখানা মানচিত্র দেখেছিলুম। তাতে মেট্টুপালায়াম পৌঁছবার আগের স্টেশনের নাম ভবানী ব্রিজ। ভবানীসাগর সেখান থেকে কত দূরে তা জানি নে।

আমাদের ট্রেন কার্নহিল নামে একটি ছোট স্টেশন পেরিয়ে গেল, তারপরে লাভডেল ও কেট্টি। আরাভাঙ্কাডু নামে একটি স্টেশনে অনেক কলকারখানা দেখতে পেলুম। যাত্রীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এই কারখানাটি ভারত সরকারের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের। এর পরে ওয়েলিংটন একটি সুন্দর পাহাড়ী শহর। নীলগিরি এক্সপ্রেস সব স্টেশনেই দাঁড়ায়, ওয়েলিংটনের পরে কুনুরে দাঁড়ায় দশ মিনিট। তারপরে মেট্টুপালায়াম পর্যন্ত আর কোথাও দাঁড়ায় না। টাইম-টেবল দেখে আমি হিসেব করেছিলুম যে এই গোটা পথ ত্রিশ মাইলের কম, আর কুনুর ঠিক মাঝপথে নয়। উটি থেকে কুনুর বারো মাইলের বেশি হবে না। আসতে এক ঘন্টা সময় লাগে। ট্রেন কুনুরে পৌঁছতেই আমরা নেমে পড়লুম।

স্টেশনের বাহিরে এসে স্বাতি বলল : খুব ভাল লাগল, তাই না গোপালদা ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : লাগল বৈকি !

পাহাড়ের সৌন্দর্য সত্যিই অপরূপ। বরফের পাহাড় এখানে নেই, পাহাড় অরণ্যময়। মাঝে মাঝে চা কিংবা কফির বাগান, আর দূরের পাহাড়ে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায় ছবির মতো। এ অঞ্চলে কফির বাগান আছে অনেক ; কিন্তু ট্রেন থেকে তা দেখতে পাই নি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : কুনুরে কী দেখবার আছে ?

বললুম : কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে।

স্বাতি বলল : আমাদের গাইড বইগুলো সঙ্গে রাখো না কেন ?

আমি হাসলুম তার অভিযোগ শুনে। তারপরেই এক ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে নমস্কার করলুম। আচমকা একটা নমস্কার পেয়ে তিনি বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন শুনে আশ্বস্ত হলেন। বললেন : কুনুরে দেখবার জায়গা ?

বললুম। হ্যাঁ। উটি থেকে আমরা এসেছি, পরের ট্রেনেই ফিরে যাব।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা ডাক্তার, না বৈজ্ঞানিক ?

বললুম : একটাও না।

তবে তো প্যাস্টুর ইন্‌স্টিটিউট আজ দেখতে পারবেন না। শনিবার সাড়ে দশটায় এলে গাইড আপনাদের সব দেখিয়ে দেবে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক হলে ?

তাহলে হয়তো ডিরেক্টারের কাছে অনুমতি পেতেন। আপনারা এক কাজ করুন। মাইল দুই দূরে চা বা কফির বাগান দেখে আসুন। গ্লেনভিউ নামে একটা বাড়িতে ওদের অফিস, সেখানে গেলেই ব্যবস্থা হবে।

স্বাতি বলল : কাছাকাছি কিছু দেখবার নেই, যা আমরা হেঁটে দেখতে পারি ?

ভদ্রলোক ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন : সবই তো দূরে দূরে। লস্ ফল্‌স্ সাড়ে চার মাইল, চার মাইল দূরে ওয়েন্‌লক ব্রিজ পর্যন্ত বাস যায়। লম্বা রক ছ মাইল দূরে, সাড়ে ছ মাইল দূরে লেডি ক্যানিং'স্ সীট। ডল্‌ফিন্স নোজ্ আর হুলিকান ক্রুগ বা টাইগার রক ফোর্ট সাড়ে সাত মাইল আর আট মাইল দূরে। র‍্যালিয়া ড্যাম, টাইগার্স হিল, ওয়াকার্স হিল—এ সবও দূরে দূরে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাই প্রশ্ন করলুম : তাহলে কি এখান থেকেই ফিরে যাব ?

ভদ্রলোক বললেন : ফিরে যাবেন কেন ? শহরটা দেখে নিন— সিম্‌স পার্ক, পোমোলজিক্যাল স্টেশন, মডার্ন অর্চার্ড-কাম-নার্সারি— এই সব। তারপরে চলে যান কোটাগিরি। তের মাইল রাস্তা। সেখান থেকে উটি ফিরবেন উনিশ মাইল পথে।

খুশী হয়ে স্বাতি বলল : সেই ভাল গোপালদা, সমস্ত নীলগিরি পাহাড়টা আমাদের দেখা হয়ে যাবে।

এই পরামর্শের জন্য ভদ্রলোককে আমরা ধন্যবাদ দিলুম। তারপরে

ছুটলুম বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। চলতে চলতেই স্বাতি বলল: সময় মতো ফিরতে পারব তো?

আমি বললুম: দেরি হতেও পারে।

বাবা মা তাহলে খুব ভাববেন।

তাহলে এখান থেকেই ফিরে চল।

পাগল হয়েছ! এমন একটা সুযোগ হারাব ভয় পেয়ে!

ভয় পাবার কি কিছু নেই?

আছে। সে বাবা মাকে নয়, তোমাকে। একটু একা হলেই কেমন বোকা সেজে যাও।

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারলুম না। তার আগেই বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেলুম। কুন্নুর থেকে কোটাগিরির বাস ছাড়ে ঘন ঘন। বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরে পরেই ছাড়ে। কিন্তু কোটাগিরি থেকে শুনলুম উটির বাস ঘণ্টায় একখানার বেশি নেই। স্বাতি অমনি ফেরার সময় হিসেব করে ফেলল। বলল: এখনই রওনা হলে পাঁচটার মধ্যেই উটি পৌঁছতে পারব।

বললুম: অন্ধকার কিন্তু তার আগেই হবে। আর কালকের মতো আবহাওয়া হলে দুর্দশার অবধি থাকবে না।

তা হোক।

বলে কোটাগিরির একখানা বাসে উঠে বসল।

কুন্নুরে আমাদের কিছুই দেখা হল না। পরে শুনেছিলুম যে একটা দিন থাকলে জায়গাটা বেশ ভালই লাগত। রিজ আর হ্যাম্পটন নামে দুটি ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেল আছে, সস্তার দিশী হোটেলও আছে কয়েকটা—টুরিস্ট লজ, মাইসোর লজ, নিউ মডার্ন লজ এ ছাড়া ওয়াই. ডব্লু. সি. এ. ও সিম্‌স পার্ক রেস্ট হাউস আছে স্টেশনের কাছে আছে পি. ডব্লু. ডি. ইন্‌স্পেক্‌সন বাংলো ও হাইওয়েস টুরিস্ট বাংলো।

সিম্‌স পার্কে নানা জাতের ফার্ন আছে—ফার্নের গাছ আর বড়

জাতের কার্ন। লাল রডোডেন্ড্রনও আছে। পার্কের নিচেই ওয়েলিংটন রেসকোর্স। একটা পথ ধরে সাত মাইল এগিয়ে গেলে লেডি ক্যানিং'স সীট। প্রথম তিন মাইল পথের দুধারে শোলার বন, তারপরে বেঁকে যেতে হয় পাহাড়ে অবরুদ্ধ এই উপত্যকায়। সেখান থেকে ঘুরে একটু নিচে নেমে গেলেই সেণ্ট ক্যাথারিন্'স ওয়াটার-ফল। একটি পাহাড়ী নদী আড়াইশো ফুট নিচে ঝরে পড়েছে।

১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে লেডি ক্যানিং এসেছিলেন কুনুরে। আর এইখান থেকে নিচের সমতল ভূমি দেখে তার তুলনা করেছিলেন মণ্টি কার্লোর কর্নিস থেকে ভূমধ্যসাগরের দৃশ্যের সঙ্গে।

যথাসময়ে আমাদের বাস ছাড়ল। সুন্দর রাস্তা, আবহাওয়াও খারাপ নয়। অনেকটা দূর এগোবার পরে আমরা বাঁ হাতে আর একটি ভাল রাস্তা দেখতে পেলুম। একজন বলল যে ওটা উটির পথ, উটি থেকে কোটাগিরি এসেছে। কুনুরের পথ এসে উটির পথের সঙ্গে মিলে গেল।

কুনুর থেকে কোটাগিরি একটুও দূর মনে হল না। যেন বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারে এলুম, কিংবা বালি থেকে হাওড়া। ছোটখাট কয়েকটি দোকান পিছনে ফেলে, একটা বাজার ও স্কুল পাশে রেখে আমরা কোটাগিরির বাস স্ট্যাণ্ডে এসে নামলুম। এখানেও কয়েকটি দোকান আছে, হোটেল ও রেস্তোরাঁ। নিচে দিয়ে একটা পথ নেমে গেছে গির্জার দিকে। আরও দুটো পথ আছে, একটা উপরে উঠেছে আর একটা নেমেছে নিচে। স্বাতি বলল: একটু দাঁড়াও গোপালদা, একটা ছবি তুলে নিই।

আমার ছবি!

স্বাতি আমার কথা শুনে হাসল বলে প্রশ্ন করলুম: হাসলে যে?

স্বাতি বলল: তোমার ছবি নিয়ে আমি কী করব?

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: বাঁধিয়ে রাখবে!

স্বাতি এইবারে গুন্ গুন্ করে গেয়ে উঠল:

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।

গানের সুর আমার জানা ছিল না, কিন্তু মনে ছিল কবিতার কলি। সুর করে তার জবাব দিলুম:

কবির অন্তরে তুমি কবি—

নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

খুব কবিত্ব দেখানো হচ্ছে।

বলে স্বাতি পথের ছবি তোলবার জন্যে এগিয়ে গেল।

কুন্নুরের আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, কিন্তু এখানে রোদ ঝলমল করে উঠছিল মাঝে মাঝে। ছবি তোলার কথা তাই স্বাতির মনে পড়েছে। এ সময়ে তার ব্যাগটা আমাকে ধরতে হয়। মামী থাকলে তাঁরই হাতে সেটা দিয়ে আসে, কিংবা নিজের কাঁধেও ঝুলিয়ে নেয় সুবিধা পেলে। আজ আমার হাতে দিল তার ব্যাগ।

দুটো ইউকালিপ্টাস গাছের ফাঁক দিয়ে সামনের পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ঘর বাড়ি গাছ পালা, নিচের পথটিও দেখা যাচ্ছে উপর থেকে। লোকজন ওঠানামা করছে। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: ভাল হবে না ছবিটা?

বললুম: খুব ভাল হবে।

কিন্তু ছবি তোলবার আগেই আকাশের রোদ গেল নিবে। করুণ চোখে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম: যা পাচ্ছ, তাই নিয়ে নাও। আর কোন ভরসা এখন দেখছি না।

স্বাতি বিমর্ষ হয়ে ছবি নিল। তারপরে বলল: চল, ঐ সামনের দোকানে বসে কফি খাই।

জিজ্ঞাসা করলুম: কোটাগিরিতে আর কিছু দেখবে না?

দেখবার যে কিছু নেই, এখানে দাঁড়িয়েই তা দেখতে পাচ্ছি।

তবু আমি কফি খেতে বসে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করলুম। দেখবার কিছুই নেই, তা নয়। মাইল পাঁচেক দূরে দূরে আছে এল্ক্ ফল্‌স্ আর সেন্ট ক্যাথারিন্'স ফল্‌স্। কোডানাড ভিউপয়েন্ট দশ মাইল দূরে, আর রঙ্গস্বামী পিক অ্যাণ্ড পিলার এখান থেকে বারো মাইল দূরে। এখানেও চা-বাগান দেখা যায়।

পরে যখন কুন্নুরের প্রসঙ্গে সেন্ট ক্যাথারিন্'স ফল্‌সের কথা জেনেছিলুম, তখন একটা প্রশ্ন জেগেছিল মনে। এই জলপ্রপাতটি কি কুন্নুর থেকে কোটাগিরি আসবার পথে? কুন্নুর থেকে এর দূরত্ব আট মাইল। আর কোটাগিরি থেকে পাঁচ মাইল। এদিকে কুন্নুর থেকে কোটাগিরির দূরত্বও তের মাইল। কাজেই এই জলপ্রপাতটি মাঝপথে হবে বলেই মনে হয়। কোটাগিরিতে এই কথা বুঝতে পারলে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারতুম।

স্বাতি তার কফিতে চুমুক দিয়ে বলল: অনেক নাম শুনেছিলাম এই নীলগিরি পাহাড়ের।

তার এই মন্তব্য শুনে মনে হল যে এ তার ভগ্ন মনোরথের কথা। আমি তাই কোন জবাব দিলুম না।

যে ভদ্রলোক কোটাগিরির খবর দিলেন, তিনি বললেন: দিন কয়েক এখানে থাকলে জায়গাটা বেশ ভাল লাগবে। ধোঁয়া ধুলো নেই, শান্ত নিরিবিলি, অবকাশ যাপনের পক্ষে খুব উপযোগী জায়গা। উটি তো সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু, বেশ শীত সেখানে। কুন্নুর আবার বেশি নিচু, মাত্র ছ হাজার ফুট। কাজেই থাকবার পক্ষে কোটাগিরিই সবচেয়ে ভাল। উঁচুতে সাড়ে ছ হাজার ফুট, না শীত বেশি, না গরম। তবে—

তবে কী?

উটির মতো হোটেল রেস্তোরাঁ নেই। ক্লাব হাউস রোডে ডেনহাম হাউস আর বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে হাইওয়েস টুরিস্ট বাংলো। রেস্তোরাঁর মধ্যে নিরামিষ মডার্ন কাফে।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : উটির হোটেল রেস্তোরাঁ তো আমরা দেখেছি।

মানে সে সব তার পছন্দ হয় নি।

উটির বাসের জন্য আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু ভিড় ছিল না সেই বাসে। স্বাতি বলল : এখানে যাত্রীও নেই, বাসও নেই।

এ কথা শুনেই একজন যাত্রী প্রতিবাদ করলেন। স্বাতি ইংরেজীতে কথাটা বলেছিল, না ভদ্রলোক বাঙলা বোঝেন, তা বোঝবার আগেই তিনি বললেন : ভিড় দেখতে হলে গির্জার কোন উৎসবের দিন আসবেন। দশ মিনিট অন্তর অন্তর বাস পাবেন ঠিকই, কিন্তু সেই বাসে চড়বার চেষ্টা করে দেখবেন যে আকাশে ভাসছেন, মাটিতে আর আপনার পা নেই।

আশ্চর্য হয়ে আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন : মিথ্যে নয়। এই নীলগিরি পাহাড়ে কত খ্রীস্টান আছে, সেদিন তা বুঝতে পারবেন। শুধু মেটুপালায়াম কুন্নুর আর উটি থেকে নয়, নীলগিরির প্রত্যেকটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম থেকে বাস আসবে। এ সব রাস্তায় সেদিন আপনারা হাঁটতেও পারবেন না।

স্বাতি বলল : আজ কোন উৎসবের দিন নয় বলে বেঁচে গেছি। ভিড় দেখলে আমি খুব ভয় পাই।

আমি হেসে বললুম : একা থাকতেও যে ভয় পাও।

আমাদের ফেরার পথ একই। কত মাইল আসবার পরে কুন্নুরের পথ বাঁ হাতে বেঁকে গেল তা বুঝতে পারলুম না। খুব বেশি ওঠানামা করতে হয় না, আবার সমতলও নয়। বেশ লাগে এই পথে বেড়াতে।

আকাশের রোদ এক সময় মেঘে ঢেকে গেল। পাহাড়ের গায়ে ঘন কুয়াশা আটকে আছে। বৃষ্টিতে ভেজা পথ এখন সঙ্কীর্ণ দেখাচ্ছে। আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। শিপশিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল

জানালার কাচের উপরে। গায়ের চাদরখানা আমি ভাল করে জড়িয়ে বসলুম।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল: আমরা কি ডোডাবেটার মাথায় উঠছি?

বললুম: তাই হবে।

কিন্তু ডোডাবেটার মাথায় আমাদের উঠতে হল না। সেই পথ বাঁ হাতে ফেলে আমরা উটির দিকে এগিয়ে গেলুম।

দিনের আলো তখন মিলিয়ে গেছে। অন্ধকার নেমেছে বনে ও পাহাড়ে। কিন্তু অন্ধকারে আমাদের ভয় করল না।

উটির বাস স্ট্যাণ্ডে এসে যখন নামলুম, অন্ধকারে তখন চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বাতি জ্বলে উঠেছে চারি ধারে। আর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। জামা কাপড় ভিজে যাবার ভয় নেই, কিন্তু হঠাৎ জোরে নামলে নাস্তানাবুদ হতে হবে। স্বাতি বলে উঠল : আর দেরি কোরো না গোপালদা, পা চালিয়ে চল। ভিজে গেলে অসুখ করবে।

বলেই হোটেলের দিকে ছুটল। আমিও ছুটলুম তার পাশে পাশে।

খানিকটা এগিয়েই বলল : কাণ্ড দেখেছ! মা দাঁড়িয়ে আছেন হোটেলের বারান্দায়।

বললুম : মায়ের মন তো, মেয়ের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন।

মানে ?

বোধহয় কোন পুরনো কথা মনে পড়েছে

স্বাতি শুধু দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভৎর্সনা করল।

বারান্দায় পা দিতেই মামী বলে উঠলেন : বলিহারি মেয়ে বাবা!

বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। স্বাতি নির্ভয়ে গেল তাঁর পিছনে।

আমি গেলুম না বলে মামা আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন : আর এখানে নয় গোপাল, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়।

আমি তাঁকে খুশী করবার জন্য বললুম : বিশ্রী জায়গা।

তাহলে তুমিও বুঝেছ। অথচ এই বোঝাটা আগে বুঝলে কষ্টটা এড়ানো যেত। বুড়োদের কথা তোমরা শুনবে না তো!

স্বাতি কোন কথা বলে নি, ফ্লাস্কটা সংগ্রহ করে বাহিরে চলে গেল।

উটিতে আমরা দুটি রাত কাটালুম। সন্ধ্যাবেলায় শিপশিপে বৃষ্টির সঙ্গে শীত পড়ে জাঁকিয়ে। শীতে অনভ্যস্ত আমরা, তাই বাহিরে বেরোতে ইচ্ছা করে না। ছাতা নেই, বর্ষাতি নেই, উপযুক্ত গরম কাপড়ও নেই সঙ্গে। কাজেই আমরা উটি ত্যাগ করাই স্থির করলুম। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জেনে নিলুম মহিসুরে যাবার বাসের সময়।

পরদিন সকালে আবার রোদ উঠল, কিন্তু মামা বললেন : না, আর নয়। এই রোদ দেখে আমরা আর ভুলব না।

সময় মতো তৈরি হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

সেই পথ। যে পথে এসেছি, সেই পথেই আমরা ফিরে যাচ্ছি। উটি শহরের প্রধান রাজপথ এটি। ঘর বাড়ি বাজার হাট, হোটেল রেস্তোরাঁ ছাড়িয়েও উটি শহর যেন শেষ হয় না। পথের ধারে বাঁ হাতে দেখা যায় একটা জলাশয় এঁকে বেঁকে অনেক জায়গা জুড়ে আছে পাহাড়ের কোলে। এর নাম উটি লেক নয়, উটি লেক স্টেশনের কাছে অন্য ধারে।

আরও খানিকটা এগিয়ে পাইকারা নামে একটি জায়গা উটির যাত্রীদের কাছে দ্রষ্টব্য স্থান। উটি শহর থেকে মাইল বারো দূরে পাইকারা ড্যাম। সেই বাঁধ ছাপিয়ে ঝর্নার মতো জল ঝরে। সেই জলে পাইকারা পাওয়ার হাউসে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পাইকারা নামে একটি নদী নাকি তিন হাজার ফুট নিচুতে নেমেছে। জলবিদ্যুতের সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা এই পাইকারা। কত জায়গায় কত কী আছে, আমার তা জানা নেই। তবে শুনেছি যে নীলগিরি পাহাড়ে উৎপন্ন এই বিদ্যুৎ-শক্তি কোইম্বাতুরে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে তা সরবরাহ করা হয়। ভারি সুন্দর এই পাইকারার দৃশ্য। একটি স্বতন্ত্র পথে পাইকারা ড্যামের পাশ দিয়ে মাইসোর রোডে পৌঁছনো যায়।

স্বাতি তখন মায়ের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। বলছে: নীলগিরি পাহাড়ের একটা মন্দিরও আমাদের দেখা হল না।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: এখানে মন্দির ছিল নাকি?

স্বাতি বলল: ছিল বৈকি। সুব্রহ্মণ্য মন্দির, বেঙ্কটেশ পেরুমল মন্দির আর মরিয়াম্মন মন্দির। মরিয়াম্মন মন্দির কুন্নুর ও কোটাগিরিতেও আছে।

আমিও আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। স্বাতি আড় চোখে আমার মুখের দিকে একবারে চেয়ে বলল: কুন্নুরে আরও অনেক মন্দির আছে। সুব্রহ্মণ্যের মন্দির তো আছেই, বিনায়ক ও বেণুগোপালেরও মন্দির আছে।

মামী বললেন: আমরা এ সব না দেখে টোডাদের দেখতে গেলাম কেন!

স্বাতি এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল: উটিতে আমরা মন্দিরে গেলাম না কেন গোপালদা?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম: জানতুম না বলে।

মন্দিরের কথা তুমি জানতে না!

পরম পুলকে স্বাতি অনেক্ষণ ধরে হাসল।

মামা বললেন: গোপাল তাহলে হেরে গেলে দেখছি।

আমি বললুম: গাইড বইগুলো স্বাতির কাছে ছিল বলেই হেরে গেলুম। কিন্তু এই সব মন্দির কোথায় তা জিজ্ঞেস করলে স্বাতিও হেরে যাবে।

এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য স্বাতি বলে উঠল: দেখেছ গোপালদা, কী সুন্দর এই পথটা!

মামা তার ছল বুঝতে পারেন নি, তাই বললেন: এই পথ শুনেছি খুব সুন্দর।

আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। এই সব পার্বত্য পথের এক ধারে পাহাড় ও অন্য ধারে খাদ বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু

নীলগিরি পাহাড়ে দেখছি যে খাদের দিকে বড় বড় গাছ উঠেছে মাথা চাড়িয়ে। পথ তাই ছায়াচ্ছন্ন, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার খেলা। কোটাগিরি থেকে উটি আসবার পথে ইউকালিপ্টাস গাছের বন দেখেছি। গাছের নাম জানি না, এমন গাছই দেখেছি বেশি। আজ বৃষ্টি নেই, মেঘও নেই আকাশে। উজ্জ্বল রৌদ্রে চারি দিকের পৃথিবী প্রসন্ন হয়ে উঠেছে।

এক সময় আমাদের বাস এসে গুডালুরের বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল।

গুডালুরও পাহাড়ে ঘেরা একটি পার্বত্য শহর। ছোট শহর। কালিকট থেকে উটি যাবার সময় এই শহরটি আমরা এক নজরে দেখে নিয়েছি। চারিদিকের বাস এসে একটি ছোট প্রাঙ্গণের মধ্যে দাঁড়ায়। এরই চারিধারে বাজার-হাট দোকানপাট হোটেল-রেস্তোরাঁ। সমস্ত বাস এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। খাবার জন্য তাড়াহুড়ো করতে হয় না। তবু আমরা নিজেদের উদ্বেগের জন্যই তাড়াহুড়ো করি। এবারেও তাই করলুম। পরিচিত হোটেলটিতে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে এসে উঠলুম।

নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের বাস ছাড়ল। এবারে আর পশ্চিমে কালিকটের দিকে নয়, এবারে আমরা উত্তরে মহিসুরের দিকে চললুম।

স্বাতি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল, বলল: বুঝলে মা, গোপালদার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

কী ক্ষমতা মামী তা জানতে চাইলেন না, কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না জানবার জন্য। কিন্তু স্বাতি থামল না, বলল: কন্যাকুমারীতে গোপালদা বলেছিল উটি দেখব, সেই উটি দেখে ছাড়ল। তুমি দেখে নিও মা, গোপালদা যা দেখতে চায়, সবাইকে তাই দেখিয়ে ছাড়বে।

মামা শুনতে পেয়েছিলেন স্বাতির কথা, বললেন: গোপালের একার আর কতটুকু ক্ষমতা।

কিন্তু তারপরে আর কিছু বললেন না। স্বাতি এইবারে নীরব হল। বুঝতে পারল যে আর কিছু বললে মামা তাকেও আমার দলে ফেলবেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা মুদুমালাই নামে একটি জায়গার নাম শুনলুম। নীলগিরি পাহাড়ের বন্য পশু সংরক্ষণ ক্ষেত্র। উটি থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে এই অরণ্য আরম্ভ হয়েছে, আর শেষ হয়েছে দশ মাইল দূরে। আটাশ বর্গমাইল বিস্তৃত এই বনের ভিতর নানাজাতের বুনো জন্তুকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে বিশ-পঁচিশ বছর আগে। বাঘ ভালুক ও চিতাবাঘের সঙ্গে নানা জাতের হরিণ আছে —সাম্বর স্পটেড ডিয়ার বার্কিং ডিয়ার মাউস ডিয়ার। বাইসন হায়না শুয়োর আছে। হাতী বুনো কুকুর বাঁদরও আছে। মালাবারের কাঠবেরালি কেমন তা জানি নে, তাও আছে। আর আছে নানাজাতের পাখি—ময়ূর সবুজ পায়রা মুরগি আর ঘুঘু। সাপখোপ অজগরেরও অভাব নেই।

কিন্তু নীলগিরির এই অরণ্যভূমি তামিলনাড়ু রাজ্যের সীমানাতেই শেষ হয়ে যায় নি, এই অরণ্যভূমি কর্ণাটক রাজ্যেও বিস্তৃত। সে রাজ্যে তার নাম মুদুমালাই নয়, সেখানে সেই একই অরণ্যের অংশ বাঁদীপুর নামে পরিচিত। মুদুমালাই আর বাঁদীপুরের মাঝখানে প্রবাহিত হচ্ছে ময়ার নদী। এরই নিকটে কেরালার অরণ্যভূমি। মুদুমালাইএর বনে যেমন তিনটি আরামপ্রদ রেস্টহাউস আছে, তেমনি বাঁদীপুরের জন্যেও আছে কয়েকটি গেস্টহাউস ইন্‌স্পেক্সন বাংলো ও টুরিস্ট লজ। বাঁদীপুর সেই বিরাট আদি সংরক্ষণভূমি বেণুগোপাল ন্যাশনাল পার্কের অন্তর্গত। প্রজেকট টাইগারে এটি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। এখানে হাতী ও গৌরকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। বাইসনকে এখানে গৌর বলে।

মামী চোখ বুজে ছিলেন, আর মামা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ে-

ছিলেন। কিন্তু স্বাতি দেখছিল সব কিছু। বলল: গোপালদা কি ভয় পেলে নাকি?

ভয় পাব কেন?

এই বনের ভিতর বাঘ আছে বড় বড়।

হেসে বললুম: বনের বাঘকে তো ভয় নেই—

তবে কি—

বলে স্বাতি থেমে গেল।

আমি বুঝতে পারলুম যে মামা মামী জেগে আছেন বলে তার সন্দেহ হয়েছে। তাঁদের কানে এ রকমের কথা অশোভন শোনাবে। আমি তাই মেনে নিয়ে বললুম: এ সব জায়গায় বেড়াতে এলে পোষা হাতী পাওয়া যায়। হাতীর পিঠে চেপে বনের বাঘ দেখতে হয়। বনের ভিতরে রেস্টহাউস আছে নানা জায়গায়। এক দিন থাকলে সব দেখার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

স্বাতি আর কথা কইল না, আমিও চুপ করে রইলুম।

এই যাত্রাটি আমার ভাল লাগছিল, ঘুম পাচ্ছিল অল্প অল্প। এক সময়ে বাঁদীপুর আমরা পেরিয়ে গেলুম। মাইসোর শহর এখন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে।

তারপরে পৌঁছলুম গুন্দ্‌লুপেট। বাসের যাত্রীরা এইখানে সারল দুপুরের আহার। আমরাও কিছু খেয়ে নিলুম। তারপরে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে এল। দুধারের পথের শোভা দেখবার জন্যে ঘুমের সঙ্গে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করেছিলুম। তারপরে হার স্বীকার করেই দেখতে পেলুম যে এ ঘুম নয়, এ তন্দ্রা, একটা আচ্ছন্ন ভাব কিছুক্ষণ শরীরকে চেপে রইল। মামার নাক ডাকতে লাগল মাঝে মাঝে, আবার চমকে উঠতে লাগলেন। যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলুম যে সবাই এই ভাবেই চলেছে।

এমনি করেই আমরা নাঞ্জনগুড পার হয়ে গেলুম। এটি মহিস্থরের

শহর। নামটা পরিচিত মনে হয়েছিল, কিন্তু তার বেশি কিছু মনে করতে পারলুম না। পরে জেনেছিলুম যে এখানে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মাইসোর থেকে একটি রেল লাইন এই শহরের উপর দিয়ে চামরাজনগর পর্যন্ত গেছে।

এক সময় মামার তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি সোজা হয়ে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন: কত দূর এসেছি গোপাল?

বললুম: মাইসোরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি বলে মনে হচ্ছে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: বল কি!

আমি তাঁর মুখে চোখে খানিকটা উদ্বেগ দেখতে পেলুম। তারপরেই জানতে পারলুম তাঁর উদ্বেগের কারণ। বললেন: কোথায় উঠবে ভেবেছ?

আমি বললুম: কোন হোটেলের নাম জানি নে তো, রেলওয়ে স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে ওঠাই ভাল।

মামা বললেন: শুধু ভাল নয়, নিরাপদও বটে। কিন্তু ট্রেনে তো আমরা যাচ্ছি না যে রিটায়ারিং রুম চাইলেই পাওয়া যাবে!

স্বাতি বলল: না পাই, কোন হোটেল খুঁজে নেব।

আমি বললুম: রিটায়ারিং রুম পাব না কেন? ব্যাঙ্গালোরের টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ করব, আর সেই টিকিট দেখিয়ে ঢুকব রিটায়ারিং রুমে।

মামা বললেন: সাবাস! এই না হলে গোপাল!

কিন্তু বেশিক্ষণ তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন: এই রাজ্যে একটা সোনার খনি আছে শুনেছি, সে কি এই দিকে নাকি?

আমি বললুম: সোনার খনি তো কোলারে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে নামটা।

স্বাতি বলল: কোলার কোন্ দিকে গোপালদা?

আমি বললুম: সে তো এই দিকে নয়, ব্যাঙ্গালোর থেকে মাইল

পঞ্চাশেক পুবে বঙ্গারাপেট নামে একটি স্টেশন আছে, সেখান থেকে ব্রাঞ্চ লাইনে মাইল আটেক যেতে হয়।

মামা বললেন : তুমি দেখেছ সোনার খনি ?

আমি বললুম : না। তবে একবার লিলুয়ার রেলকারখানার জনকয়েক জানা ছেলে গিয়ে এই খনি দেখে এসেছিল, তাদের মুখে গল্প শুনেছি।

শান্তি বলল : আমি তো সোনা তৈরি দেখব।

মামী বললেন : সোনা কি তৈরি হয় ?

মামা বললেন : সোনার খনি দেখবার বাধা আছে নাকি ?

আমি বললুম যে লিলুয়ার ছেলেরা চিঠি লিখে অনুমতি এনেছিল। এখন তার লিখে অনুমতি আনবার সময় নেই, নিজেরা গিয়ে চেষ্টা করতে হবে। তাকিয়ে দেখলুম যে তিন জনই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। সোনার মানেই এই রকম। সোনার কথায় কে মুগ্ধ হয় না, আমার জানা নেই। বললুম : ভিতরে ঢুকতে হলে অনুমতির দরকার।

বাইরে আবার কী দেখব !

মাঠ আর ঘর বাড়ি।

শান্তি বলল : সোনার খনি কি কয়লার খনির মতো ?

তাহলে দুঃখ ছিল না। সোনার গয়না তাহলে তোমরা পরতে চাইতে না।

তারপরে তাঁকে সোনার খনির গল্প শোনালুম। পাথরের গায়ে সোনার মতো সরু সরু দাগ চিক চিক করে। খনির ভিতরে কুলিরা সেই পাথর কেটে ওপরে তোলে। আর পাথর গুঁড়ো করে সোনা বার করে চেলে চেলে। এক দিকে পাথরের গুঁড়ো, অন্য দিকে সোনার কণা। তাল তাল সোনা। আর এই সোনা যাতে চুরি না হয় তার জন্য কত কড়াকড়ি ব্যবস্থা। কিন্তু কিছুতেই কি চুরি হয় না। চুরির শিক্ষা যে আমাদের রক্তে ঢুকে গেছে। নিজেদের

জিনিস আমরা নিজেরাই চুরি করি। যে দেশ সোনায় ভরে যেতে পারত, সে দেশে আজ খাদ্য নেই, দু মুঠো খেতে দেবার আশ্বাস কেউ দিতে পারছে না। চব্বিশ হাজার মানুষ এই সোনার খনিতে কাজ করে, তারাও কি দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়!

দুঃখ হয় ভেবে যে এই সংবাদে এখন কারও প্রয়োজন নেই।

৬

পৃথিবীটা যে ছোট নয়, ঘরের বাহিরে পা না দিলে তা বোঝা যায় না। আর বোঝা যায় না মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন। ইঁটের দেওয়াল ঘেরা ঘর আর বারান্দায় ঘুরে আপন জন মনে হয় শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে। পরিবারের আর পাঁচজনকেও অনেক সময় অবান্তর মনে হয়। গ্রামের ভাঙা বাড়িতে শুনেছি আত্মীয়তার গণ্ডি এমন সংকীর্ণ নয়। আর পথে বেরিয়ে আত্মীয়ের সংখ্যা বাড়ে। বিদেশে গিয়ে মনে হয় বসুধৈব কুটুম্বকম্। পৃথিবীটাই যেন নিজের ঘর, আর মানুষ মানেই আত্মীয়।

তাই মহিসুরের রিটায়ারিং রূমে স্বাতি যখন তাপ্তির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল, আমি একটুও আশ্চর্য হই নি। তাপ্তি কুর্গের মেয়ে। মার্কারা থেকে মহিসুর এসেছে বাসে, দিন তিনেক এখানে কাটিয়ে অন্য কোথাও যাবে। হোটেলে উঠতে পারত, কিন্তু স্টেশনটা তার কাছে বেশি নিরাপদ মনে হয়েছে। আগে ভাগে মাদ্রাজের একখানা টিকিট কেটে রিটায়ারিং রূমের একখানা বেড দখল করেছে।

আমরা একখানা ঘর খালি পেয়েছি, তাতে দুখানা বেড। মেট্রন বলল, স্বাতিকে একখানা বেড দিতে পারে পাশের ঘরের মেয়েটির সঙ্গে।

মামা বললেন: গোপালের কী হবে?

ব্যবস্থা একটা হবেই। আর কিছু খালি না হলে এই ঘরেই একটা অতিরিক্ত বিছানা দেওয়া যাবে এক টাকায়। মাটিতে শোওয়া সম্ভব হবে।

বললুম: চমৎকার।

স্বাতি গেল পাশের ঘরের মেয়েটির সঙ্গে ভাব করতে। আমি তাকে

বলেছিলুম: একটু পরে যেও। এখনই তাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

স্বাতি ফিরেই আসত, কিন্তু মেয়েটিকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে গেল।

মামী স্নানের আর প্রসাধনের ঘর দেখে ফিরে আসছিলেন। বললেন: ঘরদোর খারাপ নয়, কিন্তু ব্যবস্থাটা ভাল হল না।

মামা একখানা বেতের আরাম চেয়ারে বসে পাইপ ধরাচ্ছিলেন, বললেন: কেন?

স্বাতি অন্য ঘরে শোবে। তাও অন্য মানুষের সঙ্গে।

সে তো পাশের ঘরেই, আর একটা মেয়ের সঙ্গে। ও মেয়েটা তো একাই আছে।

ওদের আলাদা কথা।

আলাদা কেন?

আমাদের সমাজে—

বাধা দিয়ে মামা বললেন: এও তো আমাদেরই দেশ।

মামার কথায় আমি আশ্চর্য হলুম।

বাঙলা দেশ থেকে এত দূরে এসেও যদি আমরা এ দেশকেও নিজের দেশ ভাবি, তাহলে আর মন আমাদের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। প্রাদেশিকতার ক্লেদ থেকে আমরা অনায়াসে মুক্তি পাব। ভারতের কল্যাণের জন্যই আজ এই মুক্তির প্রয়োজন।

মামী উত্তর দিলেন মামার কথার, বললেন: তবে আর কী! ঘরবাড়ি করে এ দেশেই থেকে যাও।

মামা বললেন: সে কিছু নতুন হবে না। এ দেশেও অনেক বাঙালী আছে।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন: বুঝলে গোপাল, দিল্লীতে দেখছি কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে। সবই স্বার্থের ব্যাপার। দেশের জন্যে প্রাণ কাঁদে, এমন মানুষ আর কটা! মুখে কাঁদলেই

হল। বড় গোঁফ রেখে ঠোঁটের হাসিটি শুধু আড়াল করতে হবে। ভাল করে দল পাকাও, সবাইকে লোভ দেখাও পয়সা আর প্রতিপত্তির। বড় রাজ্যগুলো দু-ভাগ হবে তোমার জন্যে। উঁচু উঁচু গদি পাবে, খাতির খেতাব খেয়ে ফুরবে না। আর কী চাই!

এ নিশ্চয়ই আপনার রাগের কথা।

বেশ তো, নিজের চোখে দেখেই বিশ্বাস কোরো। দিল্লীতে এলে আমি তোমায় সবই দেখাব।

একটু থেমে বললেন: আমার কথাই ধর না। কোন কালে আমি দেশসেবা করেছি, না আমার বাপ পিতামহ করেছে! দেশসেবার নামে তো পেজা ঠেঙিয়েছি, আর—

কথাটা মামা শেষ করলেন না।

জিজ্ঞাসা করলুম: আর কী?

থাক সে কথা। যা বলছিলুম সে অন্য ব্যাপার। আজ আমিও জুটেছি দিল্লীর দরবারে। কিন্তু কোন্ গৌরবে জান? মোটাচাঁদা দিই, পিছনে দল আছে। ভেবেছ বোকার মতো খরচ করছি! তাহলে তুমি অঘোর গোস্বামীকে চেনো না!

মামার মুখে এক রকমের অদ্ভুত হাসি দেখলুম। পরম ঘৃণায় মানুষ এমনি করে তাকায়, কিন্তু হাসে না। মামা হেসে বললেন: বাণিজ্যের সুবিধা হয় গোপাল, দালালের কাজটা নিজেই করতে পারি। দরবারের টিকিট হল সরকারের ছাড়পত্র। অঘোর গোস্বামী এম.পি.র পারমিট সরকারী দপ্তর থেকে সুড়সুড় করে বেরোয়। আড়ালে ওরা বলে, গান্ধীটুপিকে বিশ্বাস নেই, কে কার কুটিল বেরিয়ে পড়বে, শেষটায় চাকরি নিয়ে টানাটানি, দিয়ে দাও পারমিট। কালোবাজার তো আমরাই বাঁচিয়ে রেখেছি।

মামী বিরক্ত হচ্ছিলেন, বললেন: যা-তা কী বলছ এ সব?

উত্তর না দিয়ে মামা পাইপের ধোঁয়া টানতে লাগলেন।

মামার ক্ষোভের কারণ আমার অজ্ঞাত। মনে হল যে খুব ধাক্কা-

খাওয়া মানুষ। সমাজটাকে তাই বাঁকা চোখে দেখছেন। বাঁকা চোখে আজকাল অনেকেই দেখে। বাঁকা দৃষ্টি নিয়েই তারা জন্মায়। কিন্তু মামার কথা স্বতন্ত্র বলেই আমি বিস্মিত হলুম।

কাপড় গামছা নিয়ে মামী স্নানের ঘরে চলে গেলেন। মামাও মুখ থেকে পাইপ নামালেন। বললেন: ঐ মেয়েটা কি কখনও আমাদের সমাজে মিশতে পারবে? কখনও না। ও যাতে কারও সঙ্গে মিশতে না পারে, তার জন্যে সকলেই সতর্ক আছে। লেখাপড়া শিখলেও ওকে ওরই সমাজে বিয়ে দিয়ে দেবে। চাকরি করতে চাইলে বলবে, নিজের দেশে কর। আর এই নিজের দেশ তো ভারতবর্ষ নয়, কর্ণাটকও নয়। একটুখানি দেশ কুর্গ। শৈশব থেকেই ওকে শেখানো হচ্ছে যে তার নিজের দেশ হল কুর্গ। এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি। ইংরেজরা যখন এই শিক্ষা দিত, তখন তার একটা অর্থ ছিল। ভারতবর্ষ নামে একটা বিরাট দেশ গড়ে উঠলে তেত্রিশ কোটি লোক সামলাবে কে! তার চেয়ে যত পার গণ্ডি টানো, বিবাদ বাধাও, লাঠালাঠি দাঙ্গা-হাঙ্গামা: হিন্দু-মুসলমানে, বাঙালী-বিহারীতে, কমুনিস্ট আর কংগ্রেসীতে। ভুলিয়ে দাও যে তারা এক দেশের লোক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন: আজও আমরা ভুলে আছি। ভুলে থাকতেই হবে। তা না হলে অনেকের স্বার্থে যে বড় আঘাত লাগবে।

মামা খানিকক্ষণ পাইপে ধোঁয়া টানলেন, তারপর বললেন: আচ্ছা গোপাল, দেশ স্বাধীন হবার পর কোন বড় স্বার্থত্যাগের কথা তুমি কাগজে পড়েছ?

চট করে আমার কোন উত্তর মনে পড়ল না। কিন্তু মামা বললেন: আমি পড়ি নি। কেউ বলে নি যে আমার গদিটার দরকার নেই, পাশের ভদ্রলোকই আমার কাজটা চালাতে পারবেন। গদিটার তো অনেক দাম, দেশের নেংটে লোকের ট্যাক্স কিছু কমবে।

মামা হয়তো আরও অনেক কিছু বলতেন। কিন্তু তার সুযোগ হারালেন। নিচের রিফ্রেশমেণ্ট রুম থেক দুজন বেয়ারা অনেক জিনিসপত্র এনে টেবিলে রাখল। স্নানের ঘর থেকে মামীর বেরোতে যে সময় লাগবে, মামা তা জানতেন। তাই স্বাতির খোঁজ করলেন : মেয়েটা কী করছে ?

বললুম : ডেকে আনি।

কিন্তু আমাকে উঠতে হল না। স্বাতি নিজেই এল। বোধহয় সে চায়ের সরঞ্জাম দেখতে পেয়েছিল। বলল : বাবা, একজন ভাল সঙ্গী পাওয়া গেল।

সত্যি নাকি !

হ্যাঁ বাবা, ঐ মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে বেরোব। আমি বলে এসেছি। একা যে ওর অসুবিধা হচ্ছিল, তা কিছুতেই স্বীকার করবে না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।

মামা বোধহয় মামীর কথা ভেবে সম্মতি দিতে পারছিলেন না। সন্দেহ করে স্বাতি বলল : হিন্দু মেয়ে বাবা, মা রাজী হবেন।

জাতিভেদ যে হিন্দুদেরই, সে কথা আমি মনে করিয়ে দিলুম না। খ্রীস্টান ও মুসলমান সমাজে অস্পৃশ্য নেই, অস্পৃশ্য হিন্দু সমাজের গৌরব। গান্ধীজী সেই অহংকার ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন কি ? কুসংস্কারে মানুষের আদিম অভিরুচি, প্রবৃত্তি তার সংস্কারবিরোধী। প্রবৃত্তিকে যে জয় করে সে তো মানুষ নয়, অতিমানুষ। পুরাণে সে দেবতা। ভারতবর্ষে একদিন তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল, আজ কি একটিও নেই ?

মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন : গোপাল কী বল ?

স্বাতি আমাকে উত্তর দিতে দিল না। বলল : বুঝলে গোপালদা, মেয়েটা অদ্ভুত ভাল আর ভদ্র। লেখাপড়াও অনেক করেছে। বলছিল, এ দেশের স্থাপত্য নিয়ে পড়াশুনো করছে। টেবিলের ওপর ওর বইগুলো দেখলে তুমিও ভয় পাবে।

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : আমরা স্বাধীন দেশের লোক। কড়ি না পেলে কোন কাজ করি না। আমার সমর্থন যদি পেতে চাও তো ঐ বইগুলো আমাকে দেখাতে হবে।

স্বাতি বলল : তাই হবে।

আর মামা বললেন : বখরার ব্যবস্থাটা আড়ালে করতে হয়, তুমি এখনও কাঁচা আছ।

স্বাতি তখন চা ঢালতে বসেছে। বলল : তাপ্তি বলছিল, কাল ও এখান থেকে হাসান নামে স্টেশনে যাবে। সেখান থেকে বেলুর আর হালেবিডের মন্দির দেখবে, আর দেখবে শ্রবণবেলগোলার জৈনমূর্তি। এখান থেকে নাকি মোটরে যাওয়া যায়, বাসও যায়। আমরা কী করব?

মামা বললেন : ট্যাক্সি যদি পাওয়া যায় তো আমরাও ঘুরে আসতে পারি।

স্বাতি বলল : তাপ্তিকে আমি তাই বলছিলাম। একাই যেন হাসান চলে না যায়। আমরা হয়তো মোটরেই যাব। অনায়াসে সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

আমার মনের প্রশ্নটি মামার মনেও জাগল। বললেন : একটা অজানা অচেনা মেয়ের জন্যে তোমার এত দরদ কেন বল তো?

ভাবছ কোন মতলব আছে?

কী আছে তাই ভাবছি।

আমার বয়সী একটা মেয়ে একা আছে, তাই ভাবছি। আমিও তো কোন দিন একা হতে পারি!

স্বভাবত স্বাতি কৈফিয়ৎ দেয় না। এই কৈফিয়ৎ শুনে মনে হল যে সে ফাঁকি দিল। কিন্তু ফাঁকি কিসের জন্যে! কাকে ফাঁকি!

চা খেতে খেতে মামা আমাকে বললেন : ভাল একটা প্রোগ্রাম কর।

তার সরকারী বইপত্র স্বাতি অবিলম্বে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

সেগুলো না দেখেই বললুম : আজ আমরা কোথাও যাব না, কাল বেরোব শহর দেখতে।

বেলুর যাবে তো ?

যাব বৈকি, মাইসোরে তো মানুষ মন্দির দেখতেই আসে। হয়শাল রাজাদের মন্দির, পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা নেই। মন্দির না দেখে আমরা ফিরব না।

স্নান সেরে মামী বার হচ্ছিলেন। আমার শেষের কথাটি শুনতে পেয়ে খুশী হলেন, বললেন : আজই কি মন্দির দেখাবে ?

আমার সব কথাটি শুনলে যে তিনি মোটেই খুশী হতেন না, আমি তা জানি। আমি মন্দিরের কথাই বলছিলুম, মন্দিরের দেবতার কথা নয়। বেলুর আর হালেবিডে লোকে মন্দির দেখতে যায়— মন্দিরের স্থাপত্য ও কারুশিল্প। মন্দিরে কোন দেবতা আছে কিনা তা জানি না। এ সব কথা মামীকে জানালুম না। ভাল ছেলের মতো বললুম : আজ নয় মামীমা, কাল সকালে আমরা বেরোব।

মামা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। স্বাতিও বিস্মিত হল। বললুম : প্রথমে আমরা চামুণ্ডি মার দর্শনে যাব। এখানে তিনি জাগ্রত দেবতা।

স্বাতি আমার ছল বুঝল, বোধহয় মামাও বুঝলেন। মামা কথা কইলেন না, কিন্তু স্বাতি বলল : যাই, তাপ্তিকে খবরটা দিয়ে আসি।

তাপ্তি কে ?

মামী ফিরে দাঁড়ালেন।

উল্লসিত ভাবে স্বাতি বলল : আলাপ করবে মা ? খুব ভাল মেয়ে। যাই ডেকে আনি তাকে।

মামীর সম্মতির অপেক্ষা স্বাতি করল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাপ্তিকে সে ঘরের ভিতরে টেনে আনল। আমি চমকে উঠেছিলুম। মনে হয়েছিল যে এক ঝলক রূপোলি রোদ এসে মেঝেয় লুটিয়ে

পড়ল। সব চেয়ে আশ্চর্য তার শাড়ি পরবার ধরনটি। পরে দেখে নিয়েছিলুম যে শাড়ির এক প্রান্ত তার পিঠের কাছে জড়ো করা। বাঁ কাঁধের তলা দিয়ে ডান দিকে টেনে তুলেছে। গিঁট বেঁধেছে সুবিধে মতো। আর এক খণ্ড কাপড় দিয়ে মাথার চুল জড়ানো। অনেককে শখ করে সোনা রূপোর জরি দেওয়া কাপড়ও মাথায় বাঁধতে দেখেছি।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হল। তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কথা কইতে পারলেন না। বাঙলায় কথা কইলে যে কাজ হবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নীরবে তাকে কাছে ডাকলেন। স্বাতি সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি তার ইংরেজী বলার ধরন দেখে হাসছিলুম বলে আমার উপরে চটেই উঠল। বলল: তুমিই কথা বল, আমার কর্তব্য আমি শেষ করেছি।

এটি সে বাঙলাতেই বলল। তাপ্তি বুঝতে না পেরে করুণ চোখে চাইল আমার দিকে। বললুম: এবারে আমাকে কথা কইতে বলছে।

তাপ্তি কিছু বলবার আগেই মামা বললেন: বস, চা খাও।

চা মামীই ঢেলে দিলেন।

মেয়েটিকে তাঁদের যে খারাপ লাগে নি তা বুঝতে পারছিলুম। কিন্তু তাঁদের ভাল-লাগাটুকু হয়তো বোঝাতে পারবেন না, পারলেও তা সময়সাপেক্ষ। মামী ইংরেজী জানেন না। মামা জানেন, কিন্তু ইংরেজীতে কথা বলার অভ্যাস নেই। শুধু ভদ্রতা রক্ষা করতে পারেন। কাজেই তাপ্তি যদি আমাদের সঙ্গী হয় তো স্বাতি ও আমাকে কথা কইতে হবে। স্বাতি সরে দাঁড়ালেই আমি একেবারে একা। স্বাতির হাসি দেখে মনে হচ্ছে যে তার কোন দুরভিসন্ধি আছে।

মামা বললেন: তোমার প্রোগ্রাম কী?

তাপ্তি বলল: আমি কয়েকটা মন্দির দেখতে এসেছি।

মামা বললেন : বেশ তো, তাহলে আমাদের সঙ্গেই দেখো। গোপাল কোন ব্যবস্থা করছ কি ?

বাস থেকে নেমে এখানে আসতেই আমাদের সময় বয়ে গেছে। নিচে নামবার সময় এখনও পাই নি। বললুম : এইবারে ব্যবস্থা করব।

মামা বললেন : একটা ট্যাক্সি নিও। যা কিছু দেখবার আছে, সেই হতভাগাই দেখাবে।

আমার চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা বললেন : এখনি বেরোচ্ছ কেন, এখন বিশ্রাম কর। কাল সকালে ব্যবস্থা হবে।

বাহিরে তখন অন্ধকার নেমেছে। মামী বললেন : সেই ভাল।

৭

সকাল বেলার চায়ের পর্ব শেষ হতেই স্বাতি বলল: তাপ্তিকেও সঙ্গে নিয়ে যাও গোপালদা, সে তোমাকে সাহায্য করবে।

বাঙলায় কথা। বুঝতে না পেরেও তাপ্তি আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল: চলুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।

স্বাতি হাসল। আর আমরা দুজনে বেরিয়ে এলুম এক সঙ্গে।

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেও নিচে নামা হল না। তাপ্তি বলল: এখানে দেখবার জায়গার একটা ধারণা নিশ্চয়ই আপনার আছে?

স্বীকার করতে লজ্জা হল না যে আমার কোন ধারণাই নেই।

তাপ্তি বলল: আপনি দু মিনিট দেরি করতে পারেন?

নিশ্চয়ই পারি।

তবে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে নিজের ঘরের ভিতর ডেকে আনল।

আমি একটা টেবিলের উপর খান কয়েক মোটা মোটা বই দেখতে পেলুম। স্বাতি ঠিকই বলেছে। ভারতীয় স্থাপত্যের উপর কয়েকখানা মূল্যবান বই। পাতা ওল্টাবার সময় পেলুম না। তাপ্তি কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দিল। বলল: এখানকার মানচিত্র দেখুন।

প্রথমে একখানা পুরনো মহিসুর রাজ্যের মানচিত্র খুলল। দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ছবি এঁকে দেখানো হয়েছে। রেলপথ ও রাজপথ আছে আঁকা। পশ্চিমের একটা বিন্দু দেখিয়ে তাপ্তি বলল: কুর্গের এই মারকারা শহর থেকে আমি বাসে এসেছি পেরিয়াপাটনা হয়ে।

এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা হল তার দেশ সম্বন্ধে কিছু জানতে

চাই। কিন্তু তখুনি নিজেকে সংবরণ করে নিলুম। এ কথা জানতে চাইবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, তার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না। মানচিত্রে আমি মনোযোগ দিলুম।

কাছাকাছির মধ্যে দক্ষিণে নাঞ্জনগুড। পশ্চিমে সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রম। উত্তরে বামে কৃষ্ণরাজসাগর আর দক্ষিণে শ্রীরঙ্গপাটনা। উত্তর-পশ্চিমে গেলে ব্যাঙ্গালোর, তার পশ্চিমে কোলার স্বর্ণখনি। নন্দী ছিল উত্তরে।

শহর থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরে গেলে মেলকোট আর শ্রবণবেলগোলা। পশ্চিমে বেলুর আর হালেবিড। আরও পশ্চিমে শৃঙ্গেরী মঠ আর জোগ ফল্‌স্‌। এ ছাড়াও আছে শিমোগা ভদ্রাবতী আর চিত্র দুর্গ।

উদ্বিগ্ন ভাবে আমি বললুম: এ সব আপনার দেখা হয়ে গেছে?

তাপ্তি হেসে বলল: আমি তো আজই এসেছি।

তারপরেই প্রশ্ন করল: ক'দিন থাকবেন আপনারা?

দিন তিনেক।

তবে আর ভাবনা কী। এক দিন শ্রবণবেলগোলা বেলুর আর হালেবিড, আর এক দিন শ্রীরঙ্গপাটনা সোমনাথপুর শিবসমুদ্রম, তৃতীয় দিন এই শহর আর নাঞ্জনগুড

বাধা দিয়ে আমি বললুম: আজ আমাদের চামুণ্ডি পাহাড়ে যেতে হবে। মামীমা পূজো করবেন।

তাপ্তি লজ্জা পেয়ে বলল: নিশ্চয়ই করবেন। আজই আমরা শহর দেখব। সময় থাকলে নাঞ্জনগুড

বলে আর একখানি মানচিত্র খুলে ধরল। মাইসোর শহরের মানচিত্র। প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রেলওয়ে অফিস, একজিবিশন বিল্ডিং, কৃষ্ণরাজেন্দ্র হাসপাতাল, শ্রীচামরাজেন্দ্র টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। জগন্মোহন প্যালেস, ললিতা মহল, রাজবাড়ি। চিড়িয়াখানা, গির্জা

আর মসজিদ। সিল্ক আর স্যাণ্ডালউড ফ্যাক্টরি। পাহাড়ের উপর নন্দী চামুণ্ডি মন্দির আর রাজেন্দ্র বিলাস প্যালেস। বৃন্দাবন গার্ডেন আর স্যানাটোরিয়াম॥

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : সবই দেখতে হবে ?

তাপ্তি এবারেও হাসল, বলল : মাইসোরে তো সবই দেখবার জিনিস। ছবির মতো শহর। ভারতবর্ষে এমন শহর আর আছে কিনা জানি নে।

ঘরের বাহিরে এসে তাপ্তি আবার ফিরে দাঁড়াল। বলল : চাবিটা দিয়ে যাই। তাহলে আর ওপরে আসতে হবে না।

তার ঘরের চাবি তাপ্তি স্বাতির হাতে দিয়ে এল। তারপর আমরা নিচে নামলুম।

স্টেশনের সামনে তখন একটাও ট্যাক্সি নেই। একজন রেলের কর্মচারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে ট্রেনের সময় ট্যাক্সি আসে, আর তারপরেই ফিরে যায়। একটু পরে তারা আসবে।

একটু পরে মানে ?

বেলা এগারোটার পরে ট্রেন।

বললুম : তার আগে একটা ব্যবস্থা হয় না ?

কোথায় যাবেন ?

এখন চামুণ্ডি পাহাড়, তারপর বেলুর হালেবিড শ্রবণবেলগোলা।

ভদ্রলোক যে উৎসাহী তাতে সন্দেহ নেই। এই সব নাম শুনেই বললেন : তাহলে তো আপনাদের একটা ভাল ট্যাক্সি চাই। একটা জানাশুনো লোক।

তাপ্তি তাদের দেশের ভাষায় কিছু বলল। উত্তরও পেল সেই ভাষায়। আমাকে বলল : আমি কয়েকটা ট্যাক্সিকে খবর দিচ্ছি টেলিফোনে।

কয়েকটা কেন, একটাই তো যথেষ্ট।

কয়েকজন না এলে দরে তো সুবিধে পাবেন না। বাজারে গেলে আরও সুবিধা পেতেন।

ভদ্রলোক যখন ট্যাক্সি ডাকতে গেলেন, তখন আমার এক অদ্ভুত ভাবনা মনে এল। রেলের সেই কর্মচারীটির চোখেও আমি যেন এক রকমের বিস্ময় দেখেছি। তাপ্তির বেশে তার দেশের পরিচয় আছে। এমন অভিনব বেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমার বেশেও আমার দেশের পরিচয় আছে। ধুতি পাঞ্জাবী বাঙালীর পোশাক। এ পোশাক আর যারা পরে, তাদের আমরা চিনতে পারি। এরা সঠিক চিনতে না পারলেও কিছু অনুমান করতে নিশ্চয়ই পারে। যা অনুমান করতে কিছুতেই পারবে না, সে আমাদের যোগাযোগের কথা। তাপ্তির সঙ্গে কী করে আমি একত্র হলুম, কেন আমরা এক সঙ্গে বেড়াব—সেই কথা। ভদ্রলোক মুখে কিছু জানতে না চাইলেও চোখে তাঁর এই প্রশ্ন দেখেছি।

তাপ্তি বলল: কাল আমরা দূরের পাল্লায় বেরোব। একটু বেশি সকালে, যাতে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে পারি।

তার ভাবনার ধারা আমার ভাল লাগল। আমরা তো ভ্রমণে বেরিয়েছি। ভ্রমণই আমাদের একমাত্র ভাবনা হোক। আমি অন্য কথা ভাবছিলুম বলে মনে মনে লজ্জা পেলুম। বললুম: ও সব জায়গার দূরত্ব সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই।

তাপ্তি বলল: এখানে এসেই আমি এ সংবাদ সংগ্রহ করেছি! সব চেয়ে কাছে শ্রীরঙ্গপাটনা, দশ মাইল পথ। অন্য দিকে বৃন্দাবন গার্ডেন বারো মাইল, আর নাঞ্জনগুড পনের মাইল।

কাল বাসে আমরা এই জায়গার উপর দিয়ে এসেছি, কিন্তু এর বেশি আর কিছু শুনি নি।

শোনেন নি! তেমন বিখ্যাত নয় বলেই বোধহয় শোনেন নি। কপিলা নামে একটা ছোট নদীর তীরে শ্রীকান্তেশ্বরের মন্দির।

স্থানীয় তীর্থ বলেই পরিচিত। দেখতে না পেলে দুঃখ করবার মতো কিছু নয়।

তারপর ?

তারপরে সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রম তিরিশ আর পঁয়তাল্লিশ মাইল। একই পথে কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। তবে শুনেছি সোমনাথপুর দেখে শিবসমুদ্রম যাওয়া যায়।

সোমনাথপুরের বিখ্যাত মন্দিরের কথা কিছু শুনেছি।

তাপ্তি প্রচুর খুশী হয়ে বলল: শুনবেনই, এ সব মন্দিরের কথা সকলকেই শুনতে হবে।

সেই সঙ্গেই যোগ করল: শিবসমুদ্রম দেখবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই।

কেন ?

কাবেরীর দুটো ধারা এখানে গড়িয়ে গড়িয়ে দুশো ফিট নিচে নেমেছে। আমরা জলপ্রপাত বলি। জোগ ফল্‌স্ এর চেয়ে অনেক সুন্দর। এই শহরের বিদ্যুৎ ঐখান থেকেই আসছে। কল কারখানা দেখার শখ আমার নেই।

আপনার শখের পরিচয় আমি পেয়ে গেছি।

পেয়েছেন !

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যে আপনার অনুরাগ। আপনি বেলুর আর হালেবিড দেখতে পেলে আর কিছু দেখতে চাইবেন না।

তাপ্তি হেসে বলল: আমার দুর্বলতা আপনি ধরে ফেলেছেন দেখছি।

কী করে তার মনের কথা জানলুম তাপ্তি হয়তো সে কথা জানতে চাইত। কিন্তু তার আগেই সেই রেলের কর্মচারীটি এসে বললেন: খান কয়েক ট্যাক্সি এখনি এসে পড়বে। কিন্তু পয়সা তারা অনেক চাইছে।

আমাদের পথ কত মাইল ?

তা কম নয়। বেলুর-হালেবিড বোধ হয় একশো বারো মাইল, শ্রবণবেলগোলা পঞ্চান্ন। তবে একই পথে বলে সুবিধে আছে। বেলুরের রাস্তা থেকে আট দশ মাইল ভিতরে গেলে শ্রবণবেলগোলা।

তা হলে প্রায় আড়াই শো মাইল হল।

তারপর সোমনাথপুর, শিবসমুদ্রম।

বেশিক্ষণ আমাদের হিসেব করতে হল না। প্রায় একই সঙ্গে চার পাঁচখানা ট্যাক্সি হুড়মুড় করে এসে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে যাবারও আমরা সময় পেলুম না, ড্রাইভাররা এসে আমাদের ছেঁকে ধরল। রেলের ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন: আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

দেশীয় ভাষায় কথা, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। এইটুকু বুঝেছি যে মাইলের হিসেব নয়, দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখিয়ে মোট একটা টাকার ব্যবস্থা করছেন। তিন দিন গাড়ি আমাদের কাছে থাকবে। টাকার অঙ্ক শুনে তাপ্তি আমাকে বলল: এরা বাড়াবাড়ি করছে। এর চেয়ে হাসানের রেস্ট হাউসে থেকে বাসে ঘোরা ভাল। বেলুর আর হালেবিড দশ-বারো মাইল তফাতে, এক দিনেই দেখা যাবে। আর সেদিকে যাবার পথে শ্রবণবেলগোলা। এর জন্য দুশো টাকা খরচ করবার মানে হয় না।

এরা আর কিছু দেখাবে না?

সবই দেখাবে। সোমনাথপুর শিবসমুদ্রম আর শহরের আশে-পাশের জায়গাগুলো।

মামা মামীকে আমি দেখতে পাই নি। স্বাতির হাসি শুনে ফিরে তাকালুম। তাপ্তিকে বলল: এ ভদ্রলোককে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তো?

কেন?

তাপ্তি সত্যিই আশ্চর্য হল।

স্বাতি বলল: তাহলে এখনও হন নি, হলে বলবেন।

মামা বললেন : তোমার গাড়ি ঠিক হল গোপাল ?

এরা বেয়াড়া দাম চাইছে।

তোমার বেয়াড়ার ধারণাও আবার বেয়াড়া কিনা। কত চাইছে ?

দুশো।

মামী তাঁর চোখ কপালে তুললেন, বললেন : দুশো !

তাইতেই তো আমরা পিছিয়ে এসেছি।

তাপ্তি বলল : দেড়শো টাকায় নেমেছে দেখছি, আরও নামবে।

মামা বললেন : কোন্ কোন্ রাজ্য জয় হবে ?

আমি সংক্ষেপে তিন দিনের হিসেব দিলাম। মামা চমকে উঠলেন, বললেন : বল কি গোপাল ! তিন দিনে যে কোমর ভেঙে যাবে !

তবে ?

আপাতত দু দিনই রাখ। ভবিষ্যৎ বহাল থাকলে তৃতীয় দিন বেরনো যাবে।

রেলের ভদ্রলোককে আমি মামার অভিপ্রায় জানালুম। তিনি চট করে সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রম বাদ দিয়ে দিলেন। ভাড়া একশো তিরিশ থেকে একশো কুড়িতে নামল। শুনে মামা বললেন : একশো টাকাই যথেষ্ট, ঠিক নয় কি ?

এই গাড়ি, এই গাড়ি !

বলে ড্রাইভাররা নিজের নিজের গাড়ির দিকে ছুটে গেল। সবাই রাজী, সবাই চায় তার গাড়িতেই আমরা উঠি। সেও এক বিপদ।

মামী বললেন : তোমরাও যেমন, একটু সবুর করলে দর আরও নামত।

একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে ঘুর ঘুর করছিল। সে বলল : বাজারে গেলে সত্তর আশিতেই পাওয়া যেত।

মামা তাকে একটা ধমক দিলেন, বললেন : দু বছর পরে এলে দুশো টাকা দিতে হত।

লোকটা পালিয়ে বাঁচল।

রেলের ভদ্রলোক আড়ালে ডেকে আমাদের একটা গাড়ি নিতে বললেন। লোকটা নাকি খুবই বিশ্বস্ত, অনুগতও বটে। সে সঙ্গে থাকলে গাইডেরও দরকার হবে না। আমরা তারই গাড়ি পছন্দ করলুম।

আবার বিপদ হল ওঠবার সময়। সামনে দুজন ওঠার অসুবিধা আছে, পিছনেও চারজন বসার অসুবিধা। মামাকে সামনে দিলে পিছনে আমরা চারজন বসতে পারি, কিন্তু কে কার পাশে বসবে। তাপ্তি আমাদের রক্ষা করল, আমাকে বলল: আসুন না, আমরা দুজনেই সামনে বসি।

বলে নিজেই আগে উঠে বসল।

পাতলা ছিপছিপে মেয়ে, আমার দেহও ভারি নয়। কাজেই অসুবিধা একটুও হল না। শুধু স্বাতি একটুখানি হাসল।

রেলের ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন: কোন অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন।

ড্রাইভার বলল: আমি থাকতে অসুবিধা কেন.হবে!

সে তো ঠিক কথা।

সবাই উঠে বসতেই গাড়ি এগিয়ে চলল।

৮

তাপ্তি চুপি চুপি বলল: এখানে আপনারা এই প্রথম এলেন, তাই না?

বললুম: হ্যাঁ। আপনি?

আমি প্রথম না হলেও নতুন বটে। শৈশবে বাবা মার সঙ্গে এসেছিলাম, এখন সবই নতুন ঠেকছে।

ড্রাইভারকে বলা ছিল, সে আমাদের সব চিনিয়ে দেবে। স্টেশন থেকে বেরিয়েই সে তার কাজ শুরু করল। রাস্তার ওপারেই রেলওয়ে অফিস, তারপর একজিবিশন বিল্ডিং। এখনও প্রদর্শনী জমজমাট আছে। দশেরার আসল রাতটা পেরিয়েছে। কিন্তু উৎসব এখনও চলছে। দশেরাই তো মহিসুরের জীবন। সারা বছর ধরে সমস্ত মানুষ এই পর্বের অপেক্ষা করে থাকে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম: দশেরার উৎসব আপনি দেখেছেন?

একবার এসেছিলাম।

কেমন লেগেছিল?

তাপ্তি হেসে বলল: নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল। প্রচুর আলো, প্রচুর লোকজন, আর প্রচুর গোলমাল—এইটুকুই শুধু মনে আছে। দশেরা আপনাদের দেশে নেই?

আছে। বাঙলা দেশে আমরা দুর্গোৎসব বলি। দুর্গার পুজো। তিন দিন পূজোর পরে চতুর্থ দিন বিসর্জন। দুর্গাপুজো বাঙালীর প্রাণের পুজো।

তাপ্তি আমার মুখের দিকে চাইল।

বললুম: উত্তর ভারতে বলে রামলীলা। দশেরার রামলীলা।

রামের জীবন নিয়ে বিরাট অভিনয়। এ সবের গোড়ার কথা একই। দুর্গা মহিষাসুর বধ করলেন, আর রাম রাবণকে বধ করলেন। এতে সেই একই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে—অধর্মের উপর ধর্মের প্রাধান্য।

তাপ্তি বলল: এ দিকে শুনেছি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও অভিনীত হয়। সেও তো একই সত্য।

ড্রাইভার তখন মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতাল চিনিয়ে দিচ্ছে। কৃষ্ণরাজেন্দ্র হাসপাতাল, তার পর শ্রীছামরাজেন্দ্র টেকনিকাল ইনস্টিটিউট। ছাত্রদের এই ইনস্টিটিউটে নানা রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়—রোজ ও চন্দন কাঠের কাজ, হাতির দাঁত ও ধাতুর জিনিস, আসবাব ও খেলনা তৈরির শিক্ষা। ড্রাইভার বলল: সময় করে এর শো-রুমটা একবার দেখবেন।

বাজারে আমরা নামলুম না, জগন্মোহন প্যালেসও দেখলুম না। সোজা চলে গেলুম চামুণ্ডি পাহাড়ের দিকে। দেবতার দর্শন সকালেই প্রশস্ত। মামী খুশী হবেন, প্রসন্ন থাকবেন সারা দিন। সেইটুকুই আমার লাভ। গাড়িতে উঠবার আগে এই কথাই ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি। চামুণ্ডেশ্বরীর পূজোর পর যেখানে খুশি নিয়ে যেও, যতক্ষণ খুশি ঘুরিও। খাবার সময় ইন্দ্রভবন। রেলের ভদ্রলোকটি বলে দিয়েছেন, ইন্দ্রভবনের খাবার এখানে সবচেয়ে ভাল। তারা উত্তর ভারতের লোক। দক্ষিণ ভারতের হলেও ক্ষতি ছিল না। ভারত একটা হলেই আমরা বেশি খুশী হই!

আস্তে আস্তে তাপ্তি বলল: আপনার দেশের সঙ্গে এখানকার দেবীর তাহলে মিল আছে। চামুণ্ডি দেবীও নাকি এ দেশের দানব রাজা মহিষাসুরকে বধ করে এই রাজ্য স্থাপন করেছেন। বর্তমান রাজবংশ দেবীরই প্রতিষ্ঠিত।

এ কথা আমিও শুনেছি

শুনেছেন বুঝি!

তাপ্তি লজ্জিত হল।

তার মুখের দিকে চেয়ে আমি বললুম: আপনি লজ্জা পেলেন কেন?

এও আপনি লক্ষ্য করেছেন। মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই যে অন্য মানুষও কিছু জানে।

স্বাতি এ কথা শুনতে পেলে খুশী হত অপরিমিত। বললুম: আমি তো সারাক্ষণই এ কথা ভুলে থাকি। এর জন্য আমার ভারি বদনাম।

তাপ্তি আমার মুখের দিকে চাইল।

বললুম: ঠিকই বলছি। স্বাতিকে কোন সময় জিজ্ঞাসা করবেন। যতটুকু জানি তার সবটুকু না বলা পর্যন্ত আমি আনন্দ পাই নে। শুধু অনুযোগ নয়, লোকে নিন্দাও করে। নিজেকে নাকি সবজান্তা বলে জাহিরের চেষ্টা করছি। এ আমার স্বভাবের দোষ, কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না।

তাপ্তির দৃষ্টিতে আমি বুঝি বেদনা দেখতে পেলুম। লজ্জা পেলুম। একটা নতুন মেয়ের কাছে এ সব কথা বলা বোধ হয় উচিত হল না। কেন বললুম!

তাপ্তি একটু ভেবে বলল: এ বোধ হয় জানবার ইচ্ছা থেকে জন্মে। যে কিছু জানে, তার আরও জানবার শখ। সেই শখ তাকে অসতর্ক করে।

তাপ্তির কথায় আমি বুঝি অনমনস্ক হয়েছিলুম। তার কথাতেই আবার চেতনা ফিরে এল। বলল: এই নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীরা। তাঁদের জানবার ইচ্ছা যত প্রবল হয়, তাঁরা তত নির্বাক হন। শেষে মৌন হয়ে তপস্যা করেন হিমালয়ের নির্জন গুহায়।

ড্রাইভার বলল: পাহাড়ের গায়ে ছ মাইল পথ দিন রাত এক রকম। দিনে সূর্যের আলো, রাতে বিজলির। পাহাড়ের নিচে থেকে এক হাজার সিঁড়ি ভেঙেও উপরে ওঠা যায়।

ড্রাইভার বলল : পাহাড় খুব নিচু ভাববেন না, প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু।

পিছন থেকে মামা বললেন : তাহলে তো প্রায় আবু পাহাড়ের সমান হল।

স্বাতি বলল : সে তো শুনেছি চার হাজারের বেশি। তাই না গোপালদা ?

আমি খুব আস্তে আস্তে তাপ্তিকে বললুম : দেখলেন তো, সব কিছু জানার দায়িত্ব আমার।

বাঙলার একটা কথাও যে তাপ্তি বুঝতে পারে নি, তা আমি পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম। সেটুকু ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিতেই সে হাসল। তার হাসিতে কোন শব্দ নেই।

স্বাতি বলল : ঘুমিয়ে পড়লে নাকি গোপালদা ?

এ নিশ্চয়ই তার দুষ্টুমি। আমাদের কথা সে যে একেবারেই শুনতে পাচ্ছে না, তা বিশ্বাস হয় না। পুরোপুরি শুনতে না পেলেও দুজনে যে কথা কইছি তা তার বোঝা উচিত। বললুম : জাগিয়ে দিয়েছ।

স্বাতি বলল : পীঠস্থানের বর্ণনা কর।

বাধা দিয়ে ড্রাইভার বলল : আজ বিকেল বেলায় মস্ত মেলা বসবে।

কিসের মেলা ?

ড্রাইভার যা বোঝাল তার মানে হল যে টেপ্পাকুলম সরোবরে আজ দেবীর নৌকা বিহার। মন্দির থেকে দেবী আসবেন পাল্কীতে চেপে, নৌকায় উঠে বিহার করবেন। সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য। এমন আলোর মেলা পৃথিবীর আর কোথাও নাই। একবার দেখলে সারা জীবন মনে থাকবে। আজ সন্ধ্যেবেলায় যদি আবার আমরা পাহাড়ে না উঠি, তাহলে জীবন আমাদের ব্যর্থ থাকবে। দুদিন আগে এলে রথযাত্রা দেখতে পেতুম।

নবরাত্রির উৎসব শেষ হয়েছে। দশেরার শোভাযাত্রা দেখতে পাব না। কিন্তু উৎসবের শেষ এ রাজ্যে নেই। এখনও অনেক কিছু দেখতে পাব। অনেক ফুল, অনেক আলো, অনেক উৎসব, অনেক প্রদর্শনী।

এক সময় আমরা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছে গেলুম। দক্ষিণের পথে গেলে মহারাজার বিশ্রামগৃহ রাজেন্দ্রবিলাস প্রাসাদ। রাজপরিবারবর্গ চামুণ্ডি দেবীর পূজায় এলে এই প্রাসাদে স্নান প্রসাধন ও বিশ্রাম করেন। আজ বিকেলে মহারাজা আসবেন।

চামুণ্ডি দেবীর মন্দির বামে। পথের উপর দণ্ডায়মান মহিষাসুরের মূর্তি দেখে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূরে মন্দিরের বিরাট গোপুর দেখা যাচ্ছে। স্বাতি বলে উঠল: ঠিক এক রকম।

সত্যিই এক রকম। দক্ষিণের যত জায়গায় মন্দিরের গোপুর দেখছি, সর্বত্র একই রকম মনে হচ্ছে। কারুকার্যের প্রভেদ হয়তো আছে, তা সহজে চোখে পড়ে না।

মন্দির খোলা ছিল। সবাই মিলে আমরা ভিতরে গেলুম। মামা মামী যখন পূজার ব্যবস্থা করছিলেন, আমি তখন দেবীর মূর্তি আবিষ্কারে যত্ন নিচ্ছিলুম। মনে হল যে দেবীর মর্মর মূর্তি, অষ্টভুজা সিংহবাহিনী। অসুরের নরাকৃতি মহিষমূর্তি, তার বক্ষস্থল ত্রিশূলবিদ্ধ। বাঙলা দেশের মতো লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্তিক গণেশ এখানে অনুপস্থিত।

তাপ্তি বলল: শুনেছি দক্ষিণ ভারতে এ রকম মূর্তি আর নেই।

এ কথা মেনে নিয়ে বললুম: আমরা কোথাও দেখি নি। যা দেখতে পেয়েছি, তা হয় শিব নয় বিষ্ণু। কার্তিক গণেশ দেখেছি, দেখেছি মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী। কিন্তু মহিষমর্দিনী দেবী দেখি নি। এ তো আমাদের বাঙলার দেবতা।

সত্যি !

একটি শব্দে তাপ্তি তার বিস্ময় প্রকাশ করল।

স্বাতি আজ মামীর কাছে ঘেঁষে আছে। আমাদের দুজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে মুখ টিপে হাসল, কিন্তু নিজে বেরিয়ে এল না। তাপ্তিও তার হাসি দেখতে পেয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল কিনা, আমি তা দেখতে পাই নি।

বাহিরে বেরিয়ে বলল : একখানা ছবি নেব।

এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করি নি যে তার কাঁধে ক্যামেরা ছিল। ছোট ক্যামেরা, তার চামড়ার ব্যাগের আড়ালে ঢাকা ছিল। তাপ্তি গোপুরের একটা ছবি নিল।

আজ মন্দিরের রাস্তায় পুলিশের প্রহরা আছে। তাপ্তি তাদেরই একজনকে বলল : টেপ্পাকুলমটা কোন্ দিকে ?

লোকটা পাশের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল।

রাস্তাটা প্রশস্ত নয়। দুধারে ছোট ছোট বাড়ি। খানিকটা এগিয়ে দেখলুম যে পথ আর সমতল নয়, ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অনেকটা নেমে গেলে সেই সরোবর। সেখানে আজ রাতে দেবীর নৌকা বিহার। বললুম : ওখানে যাবেন ?

তাপ্তির দৃষ্টিতে উৎসাহ ছিল, কিন্তু উত্তর দিল : থাক। ওঁরা খুঁজবেন আমাদের।

বললুম : যাব আর আসব।

তাপ্তি হেসে বলল : তাতেও অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে আসুন, এই ছায়ায় একটু দাঁড়াই।

হেসে বললুম : আপনি খুব ভদ্র।

কেন বলুন তো ?

ওঁদের দেরি হতে দিতে চান না, এই তো ?

আপনার মতো অধিকার থাকলে আপত্তি করতাম না।

আমার অধিকারের কথা শুনে হাসি পেল। কেন জানি না,

সত্য কথা গোপন করতে আমার ইচ্ছা হল না, বললুম : আপনার চেয়ে আমার অধিকার একটুও বেশি নয়।

তাপ্তির বোধহয় এ কথা বিশ্বাস হল না। তাই তার বড় বড় চোখ আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম : সত্য কথাই বলছি। আজ স্বাতি আপনাকে সঙ্গী হতে ডেকেছে। কয়েক দিন আগে এঁরা সবাই আমাকে ডেকেছিলেন। সেদিন আমাকে তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল।

আপনি তো এঁদের আত্মীয় ?

বললুম না যে দুপুরুষ আগে রক্তের সম্বন্ধ ছাড়াই আত্মীয়তা হয়েছিল, তারপর সবাই সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এবারে আবার নতুন পরিচয় সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরে। তাপ্তির প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

তাপ্তি কী বুঝল সে-ই জানে, আর কিছুই জানতে চাইল না। সৌজন্যের অভাব ঘটবে বলে আর প্রশ্ন করা তার চলে না। নিজে থেকে এর বেশি বলার সময় আমার এখনও আসে নি।

পথের পাশে একটি ছোট গাছের ছায়া। সংকীর্ণ। দুজনে সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিচে সরোবর দেখলুম। অনেক জল, অনেক গাছ, অনেক আয়োজন। উপর থেকে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভাল করে দেখতে হলে আরও নিকটে যেতে হবে। সব কিছু জানতে হলে একেবারে কাছে যেতে হবে। তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাকালুম পিছনের দিকে। স্বাতিকে যে পিছনে ফেলে এসেছি !

তাপ্তি বলল : সে আমাদের দেখে গেছে।

কে ?

স্বাতি।

আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। স্বাতি তো নিজেই এল না, তবু সে আমাদের নজরে রেখেছে !

তাপ্তি বলল : ওকে ডেকে আনব ?

না না, তার কী দরকার আছে ?

এক সঙ্গে থাকলে আমাদের বেশি ভাল লাগত।

বলে তাপ্তি উপরে উঠতে লাগল। আপত্তি না করে আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

পূজা সেরে মামী যখন বাহিরে এলেন, আমি তাঁর প্রসন্নতা দেখে আশ্চর্য হলুম। আমার সঙ্গেই প্রথমে কথা কইলেন, বললেন : গোপাল, একবার জয়পুরে আমাদের নিয়ে চল।

এত তীর্থ থাকতে জয়পুরের কথা কেন মনে পড়ল বুঝতে পারলুম না। মামাও পারেন নি। তাই জিজ্ঞাসা করলেন : জয়পুর কেন ?

জয়পুরে নাকি এমনি দেবতা আছেন।

মামা স্মরণ করবার চেষ্টা করে বললেন : অনেক দিনের কথা, ভাল মনে নেই।

স্বাতি বলল : সামনের পূজোতেই আবার বেরোব। রামখেলাওন থাকলে গোপালদার আর দরকার হবে না।

মামী তাকে ধমক দিলেন।

আমার মনে হল যে স্বাতির দৃষ্টিতে আমি কৌতুক দেখি নি, দেখেছি বেদনা। এই বেদনার কথা সে বোধহয় কাউকে বলবে না। আমরা গাড়িতে ফিরে এলুম।

পাহাড় থেকে নামবার পথে ড্রাইভার আমাদের নন্দী দেখাল। একখানা বিরাট পাথর থেকে কেটে বার করা নন্দী। ষোল ফুট উঁচু। রাস্তার ধারে মোটর থামিয়ে ধাপ বেয়ে খানিকটা উঠতে হয়। পাহাড়ে উঠবার পথে আমরা দেখতে পাই নি। পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে এখানে দুটো পথ আছে। এই রাস্তাটা খানিকটা এগিয়েই আবার অন্যটার সঙ্গে মিলে যাবে। মূর্তিটা আমরা

খানিকক্ষণ ধরে দেখলুম। এক দিকে পাহাড়, অন্য দিকে আকাশ। পাহাড়ের গায়ে এত বড় মূর্তি বোধহয় আমরা কোথাও দেখি নি। নন্দীর গলায় সারি সারি মালা। মাথার উপরেও মালা, এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত বাঁধা। শুধু পাথরের উপর কারুকার্য করা মালা নয়, ভক্তদের দেওয়া ফুলের মালাও আছে অগণিত। নন্দী এখানে পাথরের মূর্তি নয়, শিবের বাহন দেবতা। নন্দীর পূজা না হলে শিবপূজা যে অসম্পূর্ণ থাকে।

পাহাড় থেকে নেমে ড্রাইভার আমাদের ললিতা মহল দেখাল। মহা সম্মানিত অতিথির জন্য বিরাট একটি প্রাসাদ। ভিতরের সব কিছু শ্বেত মর্মরের। আমাদের সঙ্গে প্রাসাদ দেখার অনুমতিপত্র ছিল না। দ্বারী সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বাধা দেয় নি। তার পুরস্কারের লোভ আছে। উপর ও নিচের ঘরগুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। একটি প্রশস্ত নাচের ঘর, আর একটি ভোজের। প্রচুর আসবাব, রাজকীয় ব্যবস্থা।

হার্ডিঞ্জ সার্কল ও নিশাতবাগের ভিতর দিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় এলুম। অনেকক্ষণ ধরে দেখলুম পশু পাখী আর সরীসৃপগুলো। সেই সঙ্গে ফুলও দেখলুম। মহিসুরের পথে ঘাটে ফুলের অভাব কোথাও দেখি নি। নানা বর্ণে শহরের পথঘাট আলো হয়ে আছে।

জগন্মোহন প্রাসাদে আমরা চিত্রশালা দেখলুম। কত শিল্পীর কত চিত্র। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রবি বর্মার ছবিরও শেষ নেই! ত্রিবেন্দ্রামের চিত্রশালা দেখে আনন্দ পেয়েছিলুম, এখানেও পেলুম। এরই সঙ্গে একটি ছোট জাদুঘর আছে। সেখানে নানা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের নমুনা, হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সময়ের চিত্র, অনেক যত্নে অনেক সুন্দর করে সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, এবারে আমরা একজিবিশন দেখব, না সিল্ক আর স্যাণ্ডাল অয়েল ফ্যাক্টরি দেখতে যাব?

মামা বললেন : এখন আর অন্য কিছু নয়। কী ভবন তোমাদের—

বলে আমার দিকে তাকালেন।

তাঁকে মনে করিয়ে দিলুম : ইন্দ্রভবন।

মামা বললেন : ইন্দ্রভবনে কেউ খেতে যায় এই প্রথম শুনছি। দেবতারা তো উর্বশীর নৃত্য দেখতে যেতেন।

মামী বললেন : এখন খেতে যাও ক্ষতি নেই। এ দেশ ছাড়বার আগে সিল্ক আর চন্দন দুইই সঙ্গে নিতে হবে। এখানকার আতর শুনেছি বিখ্যাত।

মামা বললেন : একজিবিশনে গেলে আরও অনেক বিখ্যাত জিনিস দেখতে পাবে। বোঝার কথা একটু মনে রেখো, এই নিবেদন। এখনও অনেক পথ বাকি আছে।

পথ ফুরোয় না।

৯

বিকালে আমাদের বৃন্দাবন গার্ডেনে যাবার কথা ছিল। কিন্তু শোনা গেল যে আজ সন্ধ্যায় সেখানে বাতি জ্বলবে না। রঙীন আলোয় আজ সেখানে স্বপ্নপুরী নির্মাণ হবে না। সপ্তাহে তিন দিন বৃন্দাবন হয় নন্দন কানন—বুধ শনি রবি। কাল হয়েছিল। দুদিন পরে আবার হবে। এও জানা গেল যে ভবিষ্যতে হয়তো রোজই বাতি জ্বলবে। মামা বললেন : আজ থাক, দুদিন পরেই যাব।

স্বাতি বলল : বিকেলটা তাহলে কী করে কাটবে ?

মামী বললেন : এখন তো একটু গড়িয়ে নাও, বিকেলের কথা পরে ভাবা যাবে।

গাড়ি চাই কি ?

চাই না। যাবার জায়গা নেই। প্রদর্শনী তো স্টেশনের গায়েই, মাঝখানে রেলের অফিস।

ড্রাইভার জানিয়ে গেল যে সে কাল ভোর ছটায় আসবে। ভোর বেলায় না বেরোলে দুপুরে কষ্ট হবে। অতগুলো দেখবার জায়গা ভাল করে দেখাও হবে না।

মামা বললেন : অত সকালে কি সবাই তৈরি হতে পারবে ?

মামী বললেন : কেন পারবে না! শেষ রাতেই আমি সবাইকে জাগিয়ে দেব।

খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ?

মামী বললেন : গোপালের হাতে ছেড়ে দাও। পারবে না বাবা ?

পারতেই হবে। নিজের জন্যে যা পারি নে, পরের প্রয়োজনে তা করতেই হবে। বললুম : সে জন্যে ভাববেন না।

মামা-মামী নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে গেলেন। স্বাতিও গেল। তাপ্তি একবার আমার দিকে চেয়ে বলল : আপনি কী করবেন ?

একটু ঘুরে বেড়াব।

স্বাতি তার হাত ধরে টানল, বলল: চল না, আমরাও একটু গড়িয়ে নিই।

গড়াবার ইচ্ছা হয়তো তাপ্তির ছিল না। তবু যেতে হল। আমি গেলুম স্টেশনের ওয়েটিং রুমের দিকে।

জীবনের অনেক সমস্যার মধ্যে এও এক সমস্যা—মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার। এড়িয়ে গেলে অভদ্রতা, আর সহজ হলে হ্যাংলামি। এ তো অন্য লোকের কথা। মেয়েরা নিজেরা কী ভাবে তা জানা নেই। স্বাতির সঙ্গে আমার মেলামেশা দেখে এত দিন কে কী ভেবেছে, আমি তা ভেবে দেখি নি। কিন্তু এবারে তাপ্তির সঙ্গে আমার ব্যবহার স্বাতি দেখছে ঈগল পাখির মতো। তার ভাবনাকে আমি ভয় করি, তার অবজ্ঞা আমার সইবে না। সম্মান হারানোর চেয়ে মৃত্যু আমার শ্রেয় মনে হয়। শুধু তার কাছে কেন, জগতের যে কোন লোকের কাছে।

পিছনে হঠাৎ ডাক শুনে আমি থমকে দাঁড়ালুম। দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারার ভদ্রলোক। মালকোঁচা মারা ধুতির উপর লম্বা টেনিস সার্ট ঝুলিয়েছেন। বললেন: চিনতে পারছেন?

সেই ভদ্রলোক। কোথায় দেখা হয়েছিল সহসা মনে পড়ল না, মনে পড়ল তাঁর শিকারের গল্প। কিশতোয়ার থেকে কুমায়ুন। মেরেছেন সিকিম স্ট্যাগ ক্লাউডেড লেপার্ড মুস আর মাস্ক ডিয়ার। হিমালয়ে মেরেছেন মার্কহর আইবেক্স ইয়াক শাপু ভারল, কাশ্মীরে সেরো, কুমায়ুনে টাহর, তরাইনে মেরেছেন বাঘ প্যান্থর শ্লথ বিয়ার শম্বর, স্পটেড সোয়াম্প হগ আর বার্কিং ডিয়ার, চার শিং-ওয়ালা অ্যান্টিলোপ আর নীল গাই। পাঞ্জাবে ব্ল্যাক বাক আর র‍্যাভাইন ডিয়ার। আসামে মেরেছেন পাগলা হাতি আর মাইসোরে এসেছেন বাইসনের লোভে। বললুম: চিনতে আর পারব না। আপনার বাইসন শিকার হল?

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : সব মনে আছে দেখছি।

নিজে সিগারেট খাচ্ছিলেন। আমার দিকেও একটা বাড়িয়ে দিলেন। নিলুম না দেখে বললেন : সরি, আপনি যে ভাল ছেলে মনে ছিল না।

নিজেই আর একটা ধরালেন। ভদ্রলোক যে দেশলাই ব্যবহার করেন না সে কথা আমার মনে আছে।

কোথায় বসবেন আসুন।

বলে আমায় ওয়েটিং রুমে টেনে আনলেন।

প্রশ্ন করলুম : উঠেছেন কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন : ব্যাঙ্গালোরে এক শিকারী বন্ধুর বাড়ি।

এখানে?

এই আপনার মতো। আজ রাতের গাড়িতে ফিরব। আপনারা কি ট্রেনে এসেছেন ব্যাঙ্গালোর থেকে?

বললুম : না। উটি থেকে বাসে এসেছি।

ভদ্রলোক বললেন : খুব ভাল। ট্রেনে না চেপে মোটরে যাবেন ব্যাঙ্গালোরে। একটা অভিজ্ঞতা হবে।

হেসে বললুম : পথে জন্তু-জানোয়ার আছে নাকি?

ভদ্রলোক বিরক্তভাবে বললেন : জন্তু-জানোয়ার নয় মশাই, আপনারা যে জন্যে বেরিয়েছেন তাই দেখতে পাবেন। এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর তো পঁচাশি মাইল পথ, যেতে যেতে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

বললুম : বলুন না কী দেখবার আছে?

ভদ্রলোক বললেন : পঁচিশ মাইল এগিয়ে দেখবেন ক্লোজ পেট, তার নতুন নাম হয়েছে রামনগর। গ্রামে স্বাস্থ্যের কী করে উন্নতি করা যায় তারই চেষ্টা হচ্ছে।

বলে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একবার দেখলেন।

আরও পনর মাইল এগিয়ে চেন্নাপাটনা। সিল্ক খেলনা আর

ল্যাকার ইণ্ডাস্ট্রির জন্য বিখ্যাত। সেখান থেকে ষোল মাইল এগোলে মাণ্ড্যর চিনির কল। রাজ্যের প্রায় সমস্ত চিনি এইখান থেকে যাচ্ছে। ফরাসী সৈন্যের প্রথম ঘাঁটি ফ্রেঞ্চ রক দেখতে পাবেন। একটু ভেতরে এগোলে দুটো প্রাচীন শহর টোন্নুর আর মেলুকোট। রামানুজের নাম শুনেছেন?

বৈষ্ণব আচার্য রামানুজ?

অত শত জানি নে মশাই। বললে, এক রামানুজ ও অঞ্চলে বারো বছর কাটিয়েছেন, সে প্রায় হাজার বছর আগে, তাঁরই স্মৃতি এখনও সজীব আছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়, মাইল ত্রিশেক। দেখে নেবেন। ভাঙা মন্দির আর ঠাকুর দুই-ই আছে। টোন্নুরের পুরনো নামটা ভুলে গেলুম—যাদবগিরি না ঐ রকম কিছু—সেখান থেকে মেলুকোট আধঘণ্টার রাস্তা—পাহাড়ের নাম বোধ হয় যতু গিরি। দুটো পুকুর আছে—মোতি তালাও আর কল্যাণী—একটা টোন্নুরে আর একটা মেলুকোটে। ফরাসীর ইতিহাস, রামানুজের ধর্ম-বিশ্বাস, ভাঙা কেল্লা আর জাগ্রত দেবতা—সবই পাবেন। ভ্রমণ আপনাদের সার্থক হবে।

ভদ্রলোক যে নিজে এ সমস্ত দেখতে বার হন নি, তা আমি জানি। তাই বললুম: আপনার শিকারের গল্প বলুন।

ভদ্রলোক এবারে উৎসাহিত হয়ে বললেন: শিকার এখনও হয়নি, তবে আর একটা শখ মিটেছে। হাতি ধরা দেখে এলুম। এরা বলে খেদা অপারেশন। এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কারাপুর জঙ্গলে গিয়েছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে। সে মশাই এক অদ্ভুত দৃশ্য। আপনি ভাবতে পারবেন না কী করে তারা একটা গোটা দল বুনো হাতিকে এক সঙ্গে বন্দী করে ফেলেছে। এ সব আমাদের ধারণার অতীত।

ভদ্রলোক পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করে পুরনোটার আগুনে ধরিয়ে নিলেন। বললেন: বিশ্বাস করুন, প্রায়

হাজার তুই জংলী লোক। এই কাজের জন্যেই নাকি তাদের ভর্তি করা হয়। সরকারী লোকের সঙ্গে তারাও কাজ করে। শেখাতে কিছুই হয় না, কেননা প্রায় প্রতি বছরই তারা এই কাজ করছে। কোমরে কাড়া নাকাড়া খালি টিন ক্যানেস্তারা বেঁধে তারা এগিয়ে আসে।

হাতির সঙ্গে কি তারা লড়াই করে?

তা না হলে আর রঙ্গ কিসের!

ভদ্রলোক বেশ খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে, তারপর বললেন: মাইসোরের হাতি দেখেছেন তো, কেমন সুশ্রী সুন্দর গড়ন!

স্বীকার করতে লজ্জা হল না যে হাতির সৌন্দর্য আমি কোন দিন লক্ষ্য করি নি।

লক্ষ্য করেন নি! আরে ছি ছি, তাহলে করেছেন কী! রূপ কি ভেবেছেন মানুষেরই একচেটে!

আমি ভয় পেলুম, এবারে হয়তো তিনি জানোয়ারের রূপ বর্ণনা শুরু করবেন। তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। তাড়াতাড়ি বললুম: না না, তা ভাবব কেন! মাইসোরের হাতি তো খুবই সুন্দর। তা না হলে কি এ দেশের রাজা সেই হাতির পিঠে চড়ে দশেরার শোভা-যাত্রায় বেরোন!

দশেরা দেখেছেন বুঝি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম: কোথায় আর দেখতে পেলুম!

আমি দেখেছি। সে গল্পও আপনাকে বলব।

হাতির গল্পটা আগে শেষ করুন।

হাতি এরা কেন ধরে জানেন তো?

বোধহয় পোষবার জন্যে।

ভদ্রলোক হাহা করে হেসে উঠলেন। অট্টহাস্য। তারপর বললেন: বড় লোকের মতো উত্তর দিলেন দেখছি।

বোকার মতো যে বলেন নি, এই আমার ভাগ্য।

বললেন : যে যুগে মানুষের পেট চলে না, সে যুগে এত আড়ম্বর করে হাতি ধরবে পোষবার জন্যে! বেশ বলেছেন আপনি।

তবে কি চিড়িয়াখানায় বিক্রি করবে?

চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি, আর এ দেশের মন্দিরেও হাতি চাই। তার ওপর রাজা-মহারাজাদের দরকার শিকারের জন্যে। হাতি ধরবার আরও একটা কারণ আছে, আর সেইটেই প্রধান। দলে দলে বুনো হাতি এসে ধান আর আখের ক্ষেতের বড় ক্ষতি করে। দেশের গরিব প্রজাকে তো হাতির উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হবে!

ভদ্রলোক বলে চললেন : কারাপুরের জঙ্গলে গাছের চেয়ে হাতি বেশি। বাঁশের পাতা খেয়ে তারা বাঁচে, আর মাঝে মাঝে লোকালয়ে নেমে আসে মুখ বদলের জন্যে। হাতি ধরার ওস্তাদেরা সব ওৎ পেতে আছে, শয়ে শয়ে বুনো লোক রোজ তাদের লক্ষ্য করছে। কোথা থেকে লক্ষ্য করবে, তাও ছকে বাঁধা। হাতির দলের সন্ধান যেই পাওয়া গেল, অমনি দেওয়া হল সংকেত। আর কথা নেই, চারি দিক থেকে সেই বুনো লোকগুলো বীভৎস আওয়াজ করে হাতির দিকে এগোতে লাগল। ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া টিন ক্যানেস্তারা, তার সঙ্গে অমানুষিক চীৎকার। এ যে কী শব্দ, কানে না শুনলে কল্পনা করা যায় না। ভয়ে হাতিরা পালাবার চেষ্টা করে। তার জন্যে একটি মাত্র পথ। সেই পথে গিয়ে তারা খোঁয়াড়ে আটকা পড়বে। চারি দিকে খাল কাটা, তার একটি গেট। ঢুকলে আর বেরোবার পথ নেই। লক্ষ্য রাখতে হয় ওদের দলপতির উপর। সে বেচারা কাবু হলেই আর সবাই কাবু। তাকে অনুসরণ করে সবাই এক দিকে যাবে।

তারপর?

তারপরেই সব চেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপার। হাতির গলায় দড়ি পরানো। মাহুতগুলো অদ্ভুত কুশলী। পুরনো পোষমানা হাতির পিঠে চড়ে এক একটাকে ভুলিয়ে আনে ছোট খোঁয়াড়ে, আর দড়ি

পরায়। তারপর আর কী! তাদের চরিয়ে চরিয়ে পোষ মানানো।

অনেকক্ষণ থেকে একজন ভদ্রলোক বাহিরে ঘোরাঘুরি করছিলেন। কঠিন চেহারার মানুষ। মাঝে মাঝে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখছিলেন। ঠিক এই সময়ে আর একবার মুখ বাড়াতেই বললুম : কাকে চাই আপনার?

সঙ্কুচিত ভাবে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কি ওপরে রিটায়ারিং রুমে আছেন?

বললুম : হ্যাঁ।

কত নম্বর ঘরে?

আপনার দরকার?

দরকার আর কী, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলুম।

শিকারী ভদ্রলোক বললেন : স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করুন।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন : আর একটা কী বলব বলেছিলুম?

দশেরার গল্প।

ও হ্যাঁ। ও একটা শোভাযাত্রা। ভুখা মিছিল দেখেছেন?

দেখেছি।

বড়বাজারে মারওয়াড়ীর বিয়ের মিছিল?

তাও দেখেছি।

তফাৎ বলুন তো?

জাঁকজমক।

ঠিক ধরেছেন। কল্পনা করতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না। সে মারওয়াড়ীর ব্যাপার, আর এ রাজার। জাঁক বলে জাঁক, মাথা ঘুরে যায়, দম যায় আটকে। প্রতিপদ থেকে সাজ সাজ রব। দোকানপাট ঘরবাড়ি রাস্তা পথঘাট সব সাজানো। যত ফুল তত বাতি। শুনতে পাই যে লোকে ঘরের ভিতরেও সাজায়। যার

আলমারি শো-কেস আছে, সে সেগুলো ঝেড়ে মুছে খেলনা পুতুল ও দেখবার-দেখাবার মতো সব জিনিস দোকানের মতো সাজাবে। যেন ছোট ছোট সব জাদুঘর। তারপর আত্মীয় বন্ধু আর পড়শীকে দেখাবে নেমন্তন্ন করে। মিষ্টিমুখ করাবে। একজিবিশন তো দেখেছেন, সেও চলছে। কার্নিভাল। দশেরার দিন ষোলকলা পূর্ণ হবে। সন্ধ্যেবেলায় একবার বেরিয়ে রাজবাড়ির অবস্থা দেখবেন। বিজলীর আলোয় এখনও তেমনি সাজানো। মহারাজা এক বিরাট হাতিতে চাপবেন। যেমন হাতির সাজ, তেমনি মাহুতের, হাওদার ভেতর রাজাও বসবেন সেজেগুজে। চাপরাশী বরকন্দাজ ফৌজ পেয়াদা, সঙ্গে রাজ্যের ছোট বড় সমস্ত প্রজা। যেন জগন্নাথদেবের রথের দড়ি ধরতে এসেছে।

তারপর ?

তারপর আর কী! শহরের প্রান্তে একটা জায়গা আছে, সেইখানেই শোভাযাত্রার শেষ।

এত সব আপনি কখন দেখলেন ?

কখন! দীর্ঘ দিন তো এ দেশে পড়ে আছি!

শুধু বাইসনের লোভে!

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন: দুনিয়ায় লোভের শেষ নেই। শেষ থাকলে দেশটা বেশ হত। শুনেছি স্বর্গে লোভ নেই বলে লোভীরা সব নরকে যায়। আমারও নরকবাস অনিবার্য।

জনকয়েক ভদ্রলোক এই সময়ে হৈ হৈ করতে করতে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকলেন। বললেন: আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন, আর আমরা আপনাকে সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আমার তো এখানেই থাকবার কথা ছিল।

আসুন আসুন।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে বললেন: আচ্ছা ভাই।

বলে বেরিয়ে গেলেন।

আমিও বাহিরে এলুম। খানিকটা এগিয়ে দেখলুম যে সবাই মিলে একটা জিপে উঠলেন। এই জিপেই বোধহয় ব্যাঙ্গালোরে ফিরবেন।

বইএর দোকানের কাছে দেখলুম সেই ভদ্রলোক, আমাকে যিনি ঘরের নম্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে এড়িয়ে চলে গেলুম। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যে আমার উপর সজাগ আছে, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। এ আবার কোন্ আপদ!

১০

পরদিন ভোর ছটাতেই আমি তৈরি হয়ে নিচে নামলুম। উপর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমাদের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সবাই তৈরি হচ্ছেন। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারাকে বকশিশ দিয়ে শুধু চা পাওয়া গেছে। রুটি মাখন আর সিদ্ধ ডিম রাতেই কিনে রেখেছিলুম। কিছু খাওয়া গেছে, কিছু সঙ্গে যাবে। কলা আর আপেলও কিছু কিনে রেখেছি।

কিন্তু নিচে নেমেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সেই লোকটা। কঠিন মুখশ্রী, রুক্ষ বেশবাস, মাথার পাগড়িটা আজ নোংরা দেখাচ্ছে। এই লোকটার জন্যই কাল রাতে আমি অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারি নি। দরজা খুলে বাহিরে এসে বারান্দায় পায়চারি করেছি অর্থহীন ভাবে। আশঙ্কা ছিল যে লোকটাকে বারান্দায় দেখতে পাব, সামনের কিংবা পিছনের বারান্দায়। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছি, নিচে তাকিয়ে দেখেছি, নিজের দু কান উৎকর্ণ রেখেছি পদধ্বনি শোনবার জন্য। কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি, শুনতেও পাই নি কোন শব্দ। তাপ্তি ও স্বাতি হয়তো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, মামা মামীও ঘুমিয়েছেন। এক সময় ক্লান্ত দেহে ঘরে এসে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

আমার এই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেউ না জানলেও আমি তাপ্তির ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখেছি। দেখেছি তার দুর্ভাবনার ইঙ্গিত। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন বেরোচ্ছিলুম, এই লোকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দেখলুম যে তাকে দেখতে পেয়েই তাপ্তি চমকে উঠে শক্ত হয়ে সোজা চলতে লাগল। কিছুতেই আর কোন দিকে তাকাল না।

সারা রাস্তায় সে একটা কথাও বলে নি। প্রদর্শনীতে আমার কাছ ঘেঁষে চলেছে, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারি দিকে। আমিও রেখেছিলুম। সেই লোকটাকে আমরা দেখতে পেয়েছি। দূরে দেখেছি। সে কাছে আসে নি, কথা কয় নি, কিন্তু নজর রেখেছে আমাদের উপর।

ভেবেছিলুম যে তাপ্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু তা পারি নি। মনে হয়েছে যে আমার ধৃষ্টতা হবে। সে নিজে থেকে যদি কিছু না বলে তো আমাকে নীরবেই থাকতে হবে।

প্রদর্শনীতে মামী আতর পেলেন না। এরা আতর বলে না, বলে চন্দনের তেল। সে তেল নাকি কারখানায় গিয়ে কিনতে হবে। চন্দন সাবান আছে, সে সাবান কলকাতাতেও পাওয়া যায়। মামী চন্দন কাঠের কিছু জিনিস কিনলেন। একে ওকে দেবার জন্য শৌখিন জিনিস। ড্রয়িং রুমেও রাখা চলে।

খেয়েদেয়ে আমি তাপ্তির ঘরে বই দেখব ভেবেছিলুম। কিন্তু সে মন আমার ভেঙে গেছে। তাপ্তির ভয় দেখেই আমারও ভাবনা হয়েছে। সেই ভাবনা দূর না হলে বই পড়ার বাসনা আমার জাগবে না।

সে লোকটা আমার দিকে এগিয়ে এল না, বরং সরে গেল আমার সামনে থেকে। আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। আমার বুঝতে বাকি নেই যে সে তাপ্তিকেও এমনি দেখা দিয়ে সরে যাবে। তার উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু সেটা যে ভাল নয় তা অনুমান করতে পারি। ভাল হলে এমন লুকোচুরির দরকার ছিল না, তাপ্তিও তাকে দেখে ভয় পেত না।

একবার ভাবলুম যে সেই লোকটাকেই চেপে ধরি। সেই বলুক তার উদ্দেশ্যের কথা। কিন্তু—

কিন্তু কী! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো! না না, তা কখনোই হতে পারে না। তাপ্তির জীবনে এমন কোন

দুর্ঘটনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তবে কেন লোকটা আসে, কেন ভয় দেখায়, কেন পালিয়ে যায়!

আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার এগিয়ে এসে বলল: গাড়ি এই দিকে বাবু।

গাড়ি কোন্ দিকে আমি জানতুম, কিন্তু আমার আচরণে অন্য রকম মনে হয়েছে। সে কথা স্বীকার না করে বললুম: খাবার জিনিসপত্র বোধহয় কিছু সঙ্গে নিতে হবে।

ড্রাইভার বলল: হাসানে হোটেল আছে বটে, কিন্তু তেমন ভাল নয়।

তাহলে ওপর থেকেই নিয়ে আসি।

আবার আমি উপরে গেলুম। উদ্দেশ্য শুধু খাবার আনাই নয়, তাপ্তিকে একটু আড়াল করে রাখা, একটু ভুলিয়ে রাখা। ঐ লোকটাকে দেখতে পেলে হয়তো সারা দিনটা তার বিষণ্ণ হয়ে যাবে।

তাপ্তি তৈরি হয়ে স্বাতির অপেক্ষা করছিল, মামা অপেক্ষা করছিলেন মামীর। ঘরের এক কোণায় বসে মামী হাত ঘুরিয়ে চলেছেন। সারা দিনের নামে বেরনো, জপতপটা সংক্ষেপে সেরে বেরোলেও মনে শান্তি থাকে।

তাপ্তি বলল: আপনি ফিরে এলেন যে?

আসল জিনিসটাই সঙ্গে নেওয়া হয় নি।

সে আবার কী?

খাবার।

খাবারকে আপনি আসল জিনিস বলছেন!

আসল জিনিস নয়! খাদ্যের প্রয়োজন না থাকলে পৃথিবীটা অন্য রকম হত। বনের পশুও মানুষ হয়ে যেত।

তা হত। কিন্তু সব মানুষ মানুষ হত না। পেটের ক্ষুধা ছাড়াও যে মানুষের অনেক ক্ষুধা আছে। পেটের ক্ষুধায় মানুষ অসহায় হয়, অসৎ সব সময় হয় না।

এর বেশি তাপ্তি বলতে চাইল না। বলা হয়তো শোভনও হত না। কিন্তু আমার মনে হল যে তাপ্তি শুধু দেহের ক্ষুধাকেই ঘৃণা করছে না, করছে আরও অনেক ক্ষুধাকে। দেহের ক্ষুধা চিরকালই ছিল, থাকবেও চিরকাল। কিন্তু এই শতাব্দীর মানুষ নানা ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পৈশাচিক লোভ, তার যন্ত্রণা নারকীয়।

তাপ্তিকে আমার ভুলিয়ে রাখার দরকার। কোন দিকে না চেয়ে সে গাড়িতে গিয়ে উঠবে, সারাক্ষণ অন্যমনস্ক থাকবে। তারপর স্টেশন ছেড়ে গেলেই আমার কর্তব্যের শেষ। বললুম: আপনার তো পুরাতত্ত্বে অনুরাগ। আমাদের ভালই হল। আজ অনেক কথাই আপনার কাছে জানতে পাব।

আমাকে লজ্জা দেবেন না।

লজ্জা কিসের?

লজ্জা নয়! আমি তো জানতে বেরিয়েছি। শিখতে চাই। গুরুর দরকার আমারই তো সব চেয়ে বেশি।

গুরু তো আর আমরা হতে পারব না, কাজেই আমরা আপনার চেলা হয়ে গেলুম।

মামা বাহিরে বেরোচ্ছিলেন, আমাকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশী হলেন। বললেন: এই যে গোপাল, খাবারের জিনিসপত্র নিয়ে তোমার মামী ভারি বিপদে পড়েছেন।

সেইজন্যেই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি।

বলে ভিতরে ঢুকে পড়লুম। মামী টিফিন বাস্কেটটা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। আমি সেটা তাঁর কাছ থেকে নিলুম, হাতলওয়ালা কুঁজোটাও নিলুম।

মামী বললেন: আহা তুমি কেন বইবে!

বললুম: তাতে কী হয়েছে!

কিন্তু ঘরের বাহিরে আসতেই তাপ্তি ছোঁ মেরে আমার হাতের বেতের বাস্কেটটা কেড়ে নিল একেবারে অতর্কিতে। আমি আপত্তি

করবার আর অবকাশ পেলুম না। স্বাতিও বাহিরে ছিল। সে শুধু হাসল।

আমি সকলের আগে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলুম। উপর থেকে ড্রাইভারকে বলেছিলুম গাড়িটা কাছে আনতে, যত কাছে আনা যায়। এই একটুখানি পথ কি তাপ্তিকে লুকিয়ে রাখতে পারব না!

নিচে নেমে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। ধারে কাছে সেই লোকটাকে কোথাও দেখতে পাই নি। মনে হয়েছিল যে আর সে আসবে না। বোধহয় ভয় পেয়েছে। কিন্তু সে ঠিক সময় মতোই দেখা দিল। গাড়ি ছেড়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা থামের আড়াল থেকে সে সরে দাঁড়াল। তাপ্তি আজ তাকে দেখতে পেয়েও চমকাল না। আজ সে বুঝতেই দিল না যে কিছু হয়েছে। সে বুঝি এর জন্য প্রস্তুত ছিল।

অল্প একটু এগিয়েই ড্রাইভার পেট্রল নিল। টাকা নিল মামার কাছে। তারপর আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বেশিক্ষণ প্রভাত হয় নি। ধীরে ধীরে পৃথিবীর ঘুম ভাঙছে। সোনালী রোদের দিকে তাকিয়ে তাপ্তি বলল: আজকের সকালটি ভারি মিষ্টি, তাই না!

স্বাতি হলে তার কানে কানে বলতুম, মিষ্টি আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু তাপ্তিকে তা বলা চলে না। উত্তরে বললুম: রোদের রঙ যে এখনও সোনালী!

রৌদ্র ক্রমে প্রখর হবে, পৃথিবী জাগবে, কলরব হবে কোলাহলে পরিণত। তখন এই যাত্রাটি এমন মিষ্টি মনে হবে কিনা, কে জানে।

তাপ্তি বলল: রূপোলী রোদ বুঝি আপনার ভাল লাগে না?

রূপোলী রোদে আলো বেশি। যা দেখতে চাই না, তাও দেখতে পাই।

তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর আর কোন কথা বলল না।

পিছন থেকে মামা বললেন: গোপাল যেন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেছ।

বললুম: লোকে বড় বদনাম করছে।

কিসের বদনাম?

বেশি বকার জন্যে। অনেক কিছু জানা তো পাপ নয়, এখন দেখছি বলাটা পাপের কাজ।

মামা খানিকক্ষণ হাসলেন, তারপর বললেন: তুমি স্বাতির কথা বলছ।

তাড়াতাড়ি বললুম: স্বাতি তো একটা নয় মামাবাবু, গোটা দেশটাই তো স্বাতিতে ভর্তি।

স্বাতি বলল: গোপালদা বুঝি একটা!

এখন তো একটাই মনে হচ্ছে।

ফাঁকা রাস্তায় আমাদের গাড়ি সবেগে ছুটে চলেছে। মসৃণ প্রশস্ত পথ। এ পথে বাধা নেই, উৎকণ্ঠা নেই, নিশ্চিন্ত নিরাপদ পথ। গতির সঙ্গে কল্পনাকেও উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। মামা বললেন: ফাঁকি দিলে চলবে না গোপাল, তুমি গল্প বল।

ড্রাইভার বলল: শ্রীরঙ্গপাটনা আমরা ফেরার সময় দেখব।

মামা বলল: এখন নয় কেন?

রোদ বাড়বার আগেই শ্রবণবেলগোলা পৌঁছতে হবে। তা না হলে কষ্ট পাবেন।

আর একটা আশঙ্কার কথা আমাদের মনে হল না। ফিরতে দেরি হলে এ জায়গাটা দেখাই হবে না। ফেরার পথে দেখার কিছু না থাকলে সোয়া শো মাইল পথ কত নিশ্চিন্তে আসা যেত। এ জায়গা দেখে না গেলে সর্বত্র আমাদের উদ্বেগ থাকবে। এ হয়তো

ড্রাইভারের একটা চাল। সন্ধ্যের আগেই সে বাড়ি ফিরতে পারবে; রাত করবার উপায় নেই।

আমরা পর পর দুটো পুল পেরিয়ে গেলুম। ড্রাইভার বলল: শ্রীরঙ্গপাটনা আমরা ছেড়ে এলাম।

এ তাহলে কাবেরীর পুল। দুভাগে বিভক্ত হয়ে কাবেরী শ্রীরঙ্গপত্তনকে ঘিরে রেখেছে। টিপু সুলতানের রাজধানী। এখন তাহলে সে গল্প থাক।

মামা বললেন: কিছুক্ষণ তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গোপাল এইবারে শুরু কর।

আমার সেই শিকারী ভদ্রলোক ও তাঁর গল্পের কথা মনে পড়ল। হাতি ধরার গল্প নয়, তাঁর ভ্রমণের গল্প। টোন্নুর আর মেলুকোটের কথা। বেশি নয়, তিরিশ মাইল পথ। এই রাস্তার উপরেই। মামাকে আমি মেলুকোটের গল্প বললুম।

মেলুকোটের কথায় রামানুজের কথা এসে পড়ে। রামানুজ তখন শ্রীরঙ্গমে তাঁর বৈষ্ণব মত প্রচার করছেন। বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। ত্রিচিনপল্লীর শাসনকর্তা কৃমিকান্ত চোল এ সব সহ্য করতে নারাজ। রামানুজকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে রামানুজ পলাতক হলেন।

তারপর তাঁকে যাদবপুরীতে দেখা গেল। এ স্থান মেলুকোটের রাজার অধীন। রাজা বল্লাল জৈন ছিলেন, কিন্তু উদারচেতা ও সাধুভক্ত বলে রামানুজকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করেন নি।

আমি বাঙলায় গল্প বলছিলুম। এইবার ইংরেজীতে তার সারমর্ম তাপ্পিকে শুনিয়ে দিলুম। তাপ্পি বলল: রামানুজের সম্বন্ধে অনেক দৈব গল্প আছে।

সত্যি নাকি!

ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস না থাকলে আপনারা নিশ্চয়ই হাসবেন।

বললুম: হাসব না, আপনি বলুন।

তাপ্তি বলল : প্রথম গল্প হল ব্রহ্মদত্যের। রাজকন্যাকে ব্রহ্মদৈত্যয় পেয়েছে। কত ঝাড় ফুঁক চিকিৎসা, কত শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ যজ্ঞ—সব বৃথা। সারা ভারতের বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। রাজকন্যার জীবনের ভরসা কিছুতেই পাওয়া গেল না। এই সময়ে রামানুজ এলেন রাজা বল্লালের দেশে। বললেন, তিনি রাজকন্যাকে রক্ষা করতে পারেন। তথাস্তু। রামানুজ মন্ত্র পড়লেন, ব্রহ্মদৈত্য যেন পালাতে পথ পায় না। দেখতে দেখতেই রাজকন্যা তাঁর পুরনো স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। আর রাজা হলেন বৈষ্ণব, তাঁর নাম হল বিষ্ণুবর্ধন।

মামা বললেন : কী গল্প গোপাল ?

আমি বাঙলায় সেই গল্প শোনালুম। তারপর তাপ্তির দিকে চেয়ে বললুম : দ্বিতীয় গল্প ?

তাপ্তি বলল : একটু ভূমিকা আছে। সেটুকু বোধহয় ইতিহাস। রাজা বৈষ্ণব হওয়াতে জৈন আচার্যরা খুশী হতে পারলেন না। রাজার কাছে নানান নালিশ রোজ আসতে লাগল। রাজা রামানুজকে বললেন, গুরুদেব, এখন উপায় ? গুরু বললেন, সবাইকে তর্কে ডাকো। বড় বড় জৈন পণ্ডিতরা এগিয়ে এলেন। কিন্তু হেরে গিয়ে কেউ বৈষ্ণব হলেন, কেউ দেশ ছেড়ে পালালেন। যাদবপুরীর জৈন মন্দিরের জায়গায় নারায়ণ স্বামীর নতুন মন্দির উঠল। এই যাদবপুরীরই বর্তমান নাম টোন্নুর। এর পর রামানুজ এক দিন স্বপ্ন দেখলেন। নারায়ণ স্বামী সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস, তুমি মেলুকোটে যাও। সেখানে বিগ্রহ আছে রমাপ্রিয়। সেই মন্দিরটি তোমাকে সংস্কার করতে হবে। আর কথা নেই। সকালে উঠেই রামানুজ মেলুকোট যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে শুনলেন যে উত্তরাপথের সেনাপতি মেলুকোট লুণ্ঠন করে মন্দিরের বিগ্রহটিও নিয়ে গেছে। রামানুজ উত্তরাপথে ছুটলেন। উপস্থিত হলেন রাজসভায়। রাজা নির্মম নন, বললেন, আপনার

বিগ্রহ আপনি চিনে নিয়ে যান। অসংখ্য বিগ্রহ এনে তাঁর সামনে রাখা হল। কিন্তু রমাপ্রিয়র বিগ্রহ সেখানে নেই। তিনি ধ্যানে জানলেন যে সে বিগ্রহ রাজকন্যার কাছে। দিবসে তাঁর খেলনা, রাতে তাঁর সহচর। দেবতা মানবস্বরূপে রাজকন্যার মনোরঞ্জন করেন। রামানুজ মন্ত্রবলে এই বিগ্রহকে আকর্ষণ করে আনলেন। বাহুবন্ধনে বন্দী করে মেলুকোটে নিয়ে এলেন।

তাপ্তি থেমেছিল। আমি বললুম: তারপর?

তারপর: তাপ্তি হাসল নির্মল হাসি: ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যা এলেন রামানুজের কাছে। কিন্তু রাজকন্যা আর স্বতন্ত্র রইলেন না, মেলুকোট পর্বতের নিকট তাঁর দেহ বিগ্রহের সঙ্গে লীন হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, সেইখানে গিয়ে দেখে আসবেন। আজও সেখানে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে।

মামা বললেন: তোমরা এত আস্তে কথা বল যে পেছনে আমরা কিছুই শুনতে পাই নে।

তাপ্তির গল্পটা আমি জোরে জোরে তাঁকে শোনালুম। তারপরে বললুম: রামানুজ পুরনো মন্দির সংস্কার করিয়েছিলেন, আর বারো বৎসর সেই মন্দিরে থেকে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

তারপরে কি মারা গেলেন?

না। মারা গেল ত্রিচিনপল্লীর শাসনকর্তা কৃমিকান্ত চোল। সেই খবর পেয়ে রামানুজ তাঁর প্রিয় মন্দির শ্রীরঙ্গমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি একশো কুড়ি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: এ কত দিন আগের ঘটনা বলতে পার?

প্রপন্নামৃত বলে একটি গ্রন্থ আছে। তাতে কিছু সন তারিখ পাওয়া যায়। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে চিঙ্গলপুট জেলার শ্রীপেরম্বদুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী। তিনিও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পনর বছর পর্যন্ত রামানুজ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। তারপর শ্রীরঙ্গমে আচার্য মহাপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে

বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। বিষ্ণুভক্তি তাঁর বাল্যকাল থেকেই। মাতুরায় বৈষ্ণব মতে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি কাঞ্চীতে বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে আসেন। সেইখান থেকেই তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার।

স্বাতি বলল : কিছু যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

মামা বললেন : বাদাম্বুবাদের গল্প তো এক দিন শুনিয়েছিলে।

মামী বললেন : মেলুকোটের মন্দির আমরা দেখব না।

ড্রাইভারকে আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। ড্রাইভার বলল : সে পথ তো আমরা অনেকক্ষণ আগে ছেড়ে দিয়েছি।

পথের দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সত্যিই তাই। সেই মসৃণ বাঁধানো পথ ছেড়ে আমরা অন্য পথ ধরেছি। এ পথ খুব প্রশস্ত নয়, তত মসৃণও নয়। তবু একে খারাপ বলব না। কিছু রুক্ষ ও অসমতল হলেও মোটর চলবার উপযুক্ত পথ। বাঙলা দেশে এমন পথও খুব কম আছে।

সেই যমজ পাহাড় ফ্রেঞ্চরক্‌স্ আমরা দেখতে পেলুম না। হায়দর আলিকে সাহায্য করবার জন্য ফরাসী সৈন্য নাকি সেখানে তাঁবু ফেলেছিল। মতি তালাও দেখাও আমাদের হল না। ন শো বছর আগে দুটো পাহাড়ী নদীকে বেঁধে এই সরোবরের সৃষ্টি হয়েছিল। এরই কাছে সেই টোন্নূর গ্রাম, একদা যার নাম ছিল যাদবগিরি। আজ আর সেই সীমান্ত দুর্গের কোন চিহ্ন নেই।

মেলুকোট কিন্তু সগৌরবে বেঁচে আছে। সুন্দর সরোবরটির নাম কল্যাণী। ইতিহাস বলে যে এরই তীরে রামানুজ খুঁজে পেয়েছিলেন নারায়ণের বিগ্রহমূর্তি। বেদপুষ্করিণী সেই পাহাড়ী ঝর্ণাটির নাম। প্রাচীন দুর্গের দেওয়াল আজ ভেঙে পড়ছে। লতাগুল্মে সব ঢেকে গেছে। কিন্তু সেই বিশাল সিংহদ্বার ঢাকা পড়ে নি। গোপাল

রায় সিংহদ্বার, অসম্পূর্ণ, তবু অপূর্ব। এখানে সেখানে কত শিলা-লিপি ছড়িয়ে আছে। কত বীরত্বের কত গৌরবের কথা। এক হাজার বছরের ইতিহাস।

ড্রাইভার বলল : চৈত্র মাসে মেলুকোট আসতে হয় বৈর মুদি দেখতে। দেবতার শোভাযাত্রা বার হয়। তাঁর মাথায় হীরের মুকুট। সাত শো বছর আগে এক হয়শাল রাজা এই মুকুট দিয়েছিলেন। আজ টাকায় তার দামের হিসেব হয় না।

রামানুজেরও দানের হিসেব হয় না। বৌদ্ধ ও জৈনদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার জন্য শঙ্কর প্রচার করেছিলেন তাঁর মায়াবাদ। বলেছিলেন, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। সাধারণ লোকে ভেবেছিল, জীবমাত্রেই পূর্ণ ব্রহ্ম ও জগৎটা মিথ্যা। কাজেই আর চাই কী! যথেচ্ছ জীবন যাপন করো।

রামানুজ এই সব ভ্রান্ত মানুষের নাস্তিকতা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন। বুঝতে পারলেন যে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে ধর্মের প্রচার আবশ্যক। তিনি কোন নতুন ধর্ম-মত প্রচার করেন নি। প্রাচীন মতকেই রূপান্তর দিয়েছেন মাত্র। ভারতে একদা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত বলে যা প্রচলিত ছিল, তারই অন্য রূপ। তিনি চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। চিৎ ও অচিতের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ—এই তিনই আছে। ঈশ্বরের পাঁচ রূপ। তাঁর উপাসনাও পাঁচ প্রকার। ঈশ্বর তর্কের জিনিস নন, তিনি ধর্মের। বুদ্ধি দিয়ে তাঁর দর্শন নেই, হৃদয় দিয়ে তাঁর উপলব্ধি। ভক্তি দিয়ে প্রেম দিয়ে তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা। রামানুজ সাধারণ মানুষের জন্য বললেন :

অকিঞ্চনোঽনন্যগতিং শরণং
তৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে।

হে শরণ্য, আমি অকিঞ্চন ও অনন্যগতি হয়ে তোমার পাদমূলে শরণ নিচ্ছি।

সাধারণ মানুষ তাঁকে উত্তর দিল :

শ্রীমান রামানুজ স্বামী শেষ অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার ॥

দেবতা তো মানুষ হয়ে জন্মায় না, মানুষই দেবতা হয় কর্মে।

আমরা শ্রবণবেলগোলার দিকে ছুটেছি। প্রত্যূষের আলস্য আর পৃথিবীর গায়ে লেগে নেই। পরিচ্ছন্ন আলোয় চারিধার একাকার হয়ে গেছে। দুধারের ক্ষেতে প্রান্তরে অনেক মানুষের পরিশ্রমের বিজ্ঞাপন।

তাপ্তি আমায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল: শ্রবণবেলগোলা তো জৈনদের তীর্থস্থান।

বললুম: তীর্থের লোভে আমরা যাচ্ছি না।

লজ্জিত ভাবে তাপ্তি বলল: আমি আপনার কথা ভেবে বলি নি। মামা মামীর কথা ভেবেছেন তো! তাঁরাও কতকটা দেশ দেখতেই বেরিয়েছেন। তীর্থদর্শন তাঁদের উপরি লাভ। কিংবা তার উল্টো। তীর্থমানসে বেরিয়েছেন, দেশ দেখাটাই উপরি লাভ।

তাপ্তি যেন একটু আশ্চর্য হল। বললুম: মামীর লক্ষ্য ছিল রামেশ্বর তীর্থ। সে তো দেখেছেন, তার ওপর শ্রীরঙ্গম মাদুরা ও কন্যাকুমারী হয়ে গেছে। এখানে চামুণ্ডি দর্শনও হল। যাত্রা শেষ হবার আগে যদি আরও কিছু দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমার সাত খুন মাপ হয়ে যাবে।

আর—

মামাবাবু? মানুষটা সেকেলে বটে, কিন্তু মনটা আধুনিক। এ যুগের অনেক কিছু তিনি ভালবাসেন, মামীর মতো কনজারভেটিভ নন।

পিছন থেকে মামাবাবু বললেন: কী কথা হচ্ছে গোপাল?

ভেবেছিলুম যে গাড়ির শব্দে মামা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। এখন মনে হল যে বোধহয় অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছেন। বললুম: শ্রবণবেলগোলার কথা উঠেছে। আমরা কেন জৈন তীর্থ দেখতে যাচ্ছি, সেই কথা।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : এ আবার তীর্থ নাকি!

তীর্থস্থানই তো।

মামা বললেন : আমি ভেবেছিলুম, কোন দ্রষ্টব্য স্থান।

মামী বললেন : তীর্থস্থান কি দেখবার জায়গা নয়?

না না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, দ্রষ্টব্য স্থানও এমন অনেক আছে, যা তীর্থ নয়। এও বোধ হয় সেই রকম কিছু।

চুপি চুপি স্বাতি বলল : আমারও সেই ধারণা।

সেই ধারণা তো! খুবই স্বাভাবিক। ছবিতে অত বড় একটা বিরাট মূর্তি দেখে মনে হয়েছে যে মূর্তিটা মিশরের মতো। কবে কোন্ কালে কেউ তৈরি করেছে, এখন শুধু দেখতেই যাওয়া।

মামা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন : তোমার ইতিহাস কী বলে?

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। সে বলল : তোমার প্রশ্ন শুনে গোপালদা ভারি খুশী হয়েছেন বাবা।

মামা হাসলেন। কিন্তু আমি দমে গেলুম না। বললুম : না জানলে খুশী হতুম না। পরীক্ষা দিতে এখনও আমার ভাল লাগে, লিখতে না পারলেও নতুন কিছু জানা যায়। জানাতেই তো আনন্দ!

মামা আমাকে সমর্থন করে বললেন : ঠিকই বলেছ। অজ্ঞানের যে আনন্দ সে তো অন্ধের হাতি দেখার মতন। সে আনন্দের আর মূল্য কি!

স্বাতি বলল : এইবারে শুরু কর।

হেসে বললুম : তোমার অনুমতির অপেক্ষা আমি করছি না, মামাবাবুর আদেশ পেয়েছি। আমি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কথা ভাবছি।

মামা বললেন : কেন?

বললুম : স্কুলের ইতিহাসে পড়েছি যে অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন পরিত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং এইখানেই তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি

মৃত্যু বরণ করেছিলেন অনশনে। এ সম্বন্ধে নাকি শিলালিপিও পাওয়া গেছে। আর সম্রাট অশোক যে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এই স্থান পরিদর্শন করে গেছেন, তারও নাকি প্রমাণ আছে।

সে তো—

দু হাজার বছরেরও পুরনো কথা।

তখনও ঐ মূর্তি ছিল ?

বললুম : এ মূর্তি অনেক পরের।

তবে তুমি চন্দ্রগুপ্তের কথা ভাবছ কেন ?

ভাবছি এইজন্যে যে ভদ্রবাহু নামে একজন জৈন সাধু খ্রীষ্টের জন্মের তিন চার শো বছর আগে এইখানে দেহরক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রুত কেবল।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : শ্রুত কেবল মানে কী ?

বললুম : মহাবীরের যে ছয় জন শিষ্য তাঁর প্রত্যক্ষ উপদেশ লাভ করেছিলেন, তাঁদেরই একজন ছিলেন ভদ্রবাহু। উত্তর ভারতে কঠিন দুর্ভিক্ষের জন্য ভিক্ষান্নে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল বলেই নাকি তিনি সশিষ্যে দক্ষিণ ভারতে চলে এসেছিলেন। শোনা যায় যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর অনুচর ছিলেন। তবে হাজার বছর আগে গঙ্গা বংশের রাজত্বকালে যে জৈন ধর্ম এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের সময়েই শ্রবণবেলগোলা দক্ষিণ দেশে দিগম্বর জৈনদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মনে হয় যে গঙ্গারাজ রাজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ডরায়ের আমলে এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। সে ঘটনা দশম শতাব্দীর, বোধহয় ৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের। অরিষ্টনেমি নামে সে যুগের একজন বিখ্যাত স্থপতি এই মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন।

তাপ্তির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথোপকথন বুঝবার চেষ্টা করছে। হয়তো কিছুই বুঝতে পারে নি, তবু বলল : আপনি ইতিহাসের কথা বলছেন, তাই না ?

ঠিক তাই। আপনি কি বাঙলা বোঝেন?

না। কতগুলো নাম করলেন, যা ইতিহাসের। তাইতেই মনে হল, আপনি হয়তো ইতিহাসের আলোচনা করছেন।

বললুম: ইতিহাস কিনা জানি নে, লোকে এই সব কথা বলে।

বিস্মিত ভাবে তাপ্তি বলল: কিন্তু আপনি তো কারও সঙ্গে কথা বলেন নি।

উত্তরে আমি বললুম: ছেলেবেলায় ইতিহাসের বইতেই পড়েছি।

স্বাতি যে শুনতে পেয়েছিল তা তার মন্তব্য শুনেই বুঝতে পারলুম। বলল: খুব আত্মপ্রসাদ পেলে তো গোপালদা!

তা একটু পেলুম বৈকি। কিন্তু—

কিন্তু কী?

সে কথা মামা মামীর সামনে না বলাই ভাল। স্বাতি যে আমাদের কথায় কান পেতে আছে, তার প্রমাণ পেয়ে গেলুম। বললুম: সে কথা থাক।

ছোট ছোট গ্রাম আমরা অনেক ছেড়ে এসেছি। ছোট সমৃদ্ধ গ্রাম। কোন কোন জায়গায় স্কুল দেখেছি, পোস্ট অফিস আর সরকারী ডাক বাংলো। সে সমস্ত জায়গার নাম মানচিত্রে নেই, নেই কোন পুঁথি-পত্রে। তার প্রয়োজনও নেই। আমরা যেখানে যাচ্ছি, আমাদের ড্রাইভার সে জায়গা চেনে। তার কাছে কোন মানচিত্র নেই, তার স্মৃতিতে পথের চিহ্ন আছে। হঠাৎ এক জায়গায় পৌঁছে সে মোড় ফিরল। বাঁধানো পথ ছেড়ে অনাদৃত পথে অগ্রসর হল। অসমতল রুক্ষ পথ। বললুম: কোথায় চললে?

ড্রাইভার বলল: যে পথে বাস আসে, সে পথ আমরা অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছি। এ হল সংক্ষেপের রাস্তা। শ্রবণবেলগোলা থেকে আমরা বড় সড়ক ধরব।

এই কথা বলতে না বলতেই তাকে থামতে হল। বললুম: কী হল?

চাকায় হাওয়া নেই।

লাফিয়ে নেমে সে পিছন থেকে পাম্প বার করল। হাওয়া ভরল সামনের চাকায়। তারপর পাম্পটা রেখে এসে চালাতে বসল। পুরনো প্রথায় চাকায় হাওয়া ভরতে দেখে আমার আশ্চর্য লাগল।

ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম্য পথে আমরা ঘুরে ঘুরে চলতে লাগলুম।

খানিকটা এগিয়েই আবার সে থামল। বললুম: আবার কী হল?

আরও হাওয়া দিতে হবে।

আর কি চাকা নেই?

আছে।

কিন্তু চাকা সে বদলাল না। আমার সন্দেহ হল যে সত্যিই তার আর চাকা নেই। তাই হাওয়া ভরেই এগোচ্ছে। মামা উদ্বিগ্ন হলেন। এখানে অচল হলে কিছুতেই চলবে না। আশ্বাস দিয়ে ড্রাইভার বলল: এবারে সামনে দেখুন।

সামনে! সামনে তো একটা ছোটখাট পাহাড় দেখছি।

আর তার চূড়োয়?

তাইতো! ঐ তো শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর মূর্তি। ছবিতে তো ঠিক এমনটিই দেখেছি। কিন্তু এত ছোট কেন!

পনের মাইল দূর থেকে এই মূর্তিটি দেখা যায়। কাছে গেলেই বড় দেখবেন।

পিছন থেকে মামা বললেন: আমাদের কি ঐ পাহাড়ে উঠতে হবে!

মামা যে ভয় পেয়েছেন, তা তাঁর কণ্ঠস্বরেই প্রমাণ হল। মামী সান্ত্বনা দিলেন: মোটরেই হয়তো পৌঁছে যাব।

ড্রাইভারকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হল না। শুনেছি এই পাহাড় নাকি সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। তবে ভরসা এই যে আমরাও অনেকটা উঁচুতে আছি।

চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তার উচ্চতা পাঁচ শো ফুটও হবে না।

স্বাতি বলল : বেশ মজা লাগছে।

তা তো লাগবেই : মামা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন : এমন জানলে কি—

মামী আবার আশ্বাস দিলেন : অত ভাবছ কেন। আমাদের তো তীর্থ নয় যে মৃত্যুপণ করে উঠতে হবে। আমরা না হয় নিচেই বসে থাকব।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : তাও কি সম্ভব !

গাড়ি আবার আটকাল। বললুম : তোমার চাকা আছে তো বদলে নাও না বাপু।

মামা বললেন : তা কি আর আছে! আমাদেরই ডোবাবে।

মামী বললেন : বেরোবার সময় এ সব দেখে বেরোতে হয়।

মামা বললেন : এদেরও আক্কেল দেখ না!

পাহাড়ের দূরত্বটা এখান থেকেও অনুমান করা যাচ্ছে না। উপরে উঠবার পথ উল্টো ধারে। যদি হাঁটতেই হয়, তাহলে সবাই মিলে পৌঁছতে পারব তো! হাওয়া ভরতে ভরতে ড্রাইভার আমাদের আশ্বাস দিল : শ্রবণবেলগোলায় পৌঁছে চাকাটা বদলে নেব।

গাড়ি আর আটকাল না। পাহাড়টা দক্ষিণে রেখে ঘুরে আমরা বাজারের ভিতর এলুম। অন্য দিক থেকে একটা বাঁধানো রাস্তা এসে এইখানে মিলেছে। দুধারে ছোট ছোট দোকান। সেগুলোর শেষ প্রান্তে এসে গাড়ি দাঁড়াল। এইখানে আমাদের নামতে হবে।

কিন্তু মূর্তি কোথায়!

খানিকটা এগিয়ে একখানা বিরাট পাথর দেখতে পেলুম। একখানা পাথরই যেন একটা পাহাড়। তার গায়ে ধাপ কাটা। এঁকে-বেঁকে উপর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু মূর্তি দেখা যাচ্ছে না। তবে কি ঐ মূর্তি পাহাড়ের অন্য ধারে!

কয়েকজন লোক এগিয়ে এসেছিল। কারও হাতে গাইড-বই—শ্রবণবেলগোলা, বেলুর, হালেবিড, সোমনাথপুর। কারও হাতে ছবি। কেউ প্রশ্ন করছে, গাইড চাই!

স্বাতি বলল: এখানে আবার গাইডের কী দরকার, এই সিঁড়িই তো গাইড।

মামা এই পাহাড়ের দিকে একবার করুণ চোখে চাইলেন। মামী বললেন: ভয় পাচ্ছ কেন, ধীরে ধীরে বেশ ওঠা যাবে।

ইতিমধ্যেই আমি জেনে নিয়েছিলুম যে এই পাহাড়টা চারশো সত্তর ফুট উঁচু আর পাঁচশো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। কিন্তু সে কথা আমি তাঁদের বললুম না। তাপ্তির সঙ্গে আমি এগিয়ে গেলুম। স্বাতি আমাদের সঙ্গে এল না।

এখন বুঝতে পারলুম যে ড্রাইভার আমাদের শ্রীরঙ্গপত্তন না দেখিয়ে কেন এখানে তাড়াতাড়ি এনেছে। রোদ প্রখর হয় নি। তা হলে এই পাহাড়ে উঠতে পরিশ্রম বেশি হত।

তাপ্তি বলল: আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, ওঁদের আসতে দিন।

পিছন ফিরে আমি সবাইকে দেখলুম। স্বাতি মামা মামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠছে। ওঁদের সঙ্গে তাপ্তির ভাল লাগবে না। বললুম: তার দরকার নেই। ওঁরা ধীরে ধীরেই আসুন।

ইচ্ছা করলে স্বাতি আমাদের সঙ্গে আসতে পারত। সে ইচ্ছা নেই বলেই সে পিছনে পড়ে রইল।

তাপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে স্বাতির ব্যবহারের একটা সঙ্গত কারণ সে খুঁজছে। যে তাকে অত আগ্রহে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়েছে, সে কেন পিছিয়ে গেল। তারা সমবয়সী, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনাও হবে সমগোত্রীয়। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এমন কী ঘটল যে তার সঙ্গ পাবার বাসনা গেল ফুরিয়ে। মনে হল, আমার উত্তরটা সম্পূর্ণ হয় নি। তাই বললুম:

ব্যক্তি ঐ রকমই। তার অনেক আচরণের অর্থ আমি খুঁজে পাই নে।

তাপ্তির ভারি বিস্ময় বোধ হল। আমি তার চেয়েও বিস্মিত হলুম পিছনের দিকে তাকিয়ে। একটা পাহাড়ে আমরা উঠছি। ওধারে ঠিক এমনিই আর একটা পাহাড়। মাঝখানে একটা সুন্দর সরোবর। এরা কল্যাণী বলে। পরে জেনেছিলুম যে আমরা যে পাহাড়ে উঠেছিলুম তার নাম ইন্দ্রগিরি বা বিন্ধ্যগিরি। স্থানীয় লোকে ইন্দ্রবেট্টা বা ডোডাবেট্টাও বলে। এই পাহাড়ের উপরেই গোমতেশ্বরের মূর্তি। ওধারের পাহাড়ের নাম চন্দ্রগিরি বা চিক্কা বেট্টা। সেটা দুশো কুড়ি ফুট উঁচু। তার উপরে আছে দ্রাবিড় শৈলীতে তৈরি পনেরটা বস্তি আর পাথরের কয়েকটা দীপস্তম্ভ। এই পাহাড়ের অনেক কিছুই ইন্দ্রগিরির চেয়ে দেড় হাজার বছরের বেশি পুরাতন। আড়াই হাজার বছর আগে এ দেশে যে সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখানকার চন্দ্রগুপ্ত বস্তিটি সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর গুরু ভদ্রবাহুর জীবনের নানা ঘটনা এই মন্দিরের গাত্রে ও শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে। অদূরের একটি বস্তিতে আছে আটশো বছরের পুরাতন পার্শ্বনাথের মূর্তি। এই মন্দিরের সম্মুখে মহাস্তম্ভ ষাট ফুট উঁচু, তার উপরে কুড়ি ফুটের একটি মণ্ডপ। এই পাহাড়ের সবচেয়ে প্রাচীন দ্রষ্টব্য হল ভদ্রবাহুর গুহা। একটি পাথরে তাঁর পায়ের চিহ্ন আছে। এই গুহাতেই তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন এবং লোকে বিশ্বাস করে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও এইখানে বারো বছর তপস্যা করে সমাধি লাভ করেন।

তাপ্তি একখানা ছবি নিতে চাইল। বললুম: ওই গেটটার নিচে থেকে ছবি ভাল হবে।

ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট তোরণ। মাথার উপর কিছু কারুকার্য। দেখতে বেশ লাগছে। একটুখানি ছায়ার জন্য আরও ভাল লাগল। বিশ্রামও হল।

তাপ্তির ছবি তোলা হলে আবার আমরা উঠতে যাচ্ছিলুম। স্বাতির ডাক শুনে দাঁড়াতে হল। স্বাতি তাড়াতাড়ি কয়েকটা ধাপ উঠে এসে বলল: তোমরা একটু দাঁড়াও গোপালদা, একটা ছবি তুলব।

তাপ্তি উপরে দাঁড়িয়ে নিচের ছবি তুলেছিল, আর স্বাতি নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তুলল। স্বাতির এই প্রস্তাব শুনে তাপ্তি হেসেছিল, কিন্তু আপত্তি করে নি।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাপ্তি বলল: আমাদের ছবি তোলার শখ ওর কেন হল?

ওকেই এ কথা জিজ্ঞেস করতে হয়।

মনে হল যে আমার উত্তরটা খুব ভদ্র হল না। কিন্তু তাপ্তি সহজ ভাবে বলল: দুষ্টুমি আছে।

ষোল আনা।

তবে আপনি রাজী হলেন কেন?

আমি আঠারো আনা দুষ্টুমি করব।

সে কি!

বললুম: আপনিও আমাদের একটা ছবি তুলবেন। আমাদের দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি এই বিস্ময়ের কারণ অনুমান করতে পারি। স্বাতি যে আমার বোন নয়, সে কথা বলাই হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু বললুম: জানেন, এক দিন আমার মুখ দেখে স্বাতি হেসেছিল, বাঁদরের মতো মুখ বলেছিল কিনা মনে নেই। সেই দিনই এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, স্বাতিকে আমার বোন বলে বেশ চেনা যায়।

তাপ্তি হেসে উঠল। তৃণগুল্মহীন শুকনো পাথরের উপর মনে হল ঝর্ণার শব্দ পেলুম। ভারি মিষ্টি হাসি। তাপ্তি হাসতে জানে।

আমি নিশ্চয়ই জানি, নিচে থেকে স্বাতি এই হাসি শুনতে পেয়েছে। আমিও হেসে উঠলে বোধহয় আরও বেশি কৌতুক হয়, আরও বেশি রোমাঞ্চ। এই লোভটুকু ছাড়তে পারলুম না, আমিও হেসে উঠলুম। হয়তো একটু দেরি হয়ে গেছে, হয়তো সুর মেলে নি। তাতে ক্ষতি কী! স্বাতির কানে এ ত্রুটি ধরা পড়বে না।

সিঁড়ির শেষ যেখানে মনে হচ্ছিল, সেখানে শেষ হল না। খানিকটা সমতল পাথরের উপর দিয়ে আর নিচু নিচু ধাপ পেরিয়ে এগিয়ে গেলুম। তারপর আবার উঁচু সিঁড়ি আর দুর্গের মতো একটা দরজা পেরিয়ে মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেল। অত বড় উঁচু মূর্তি তখনও দেখা যাচ্ছে না। একেবারে অঙ্গনে ঢুকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। এত বড় বিরাট মূর্তি জীবনে কখনও দেখি নি। মূর্তি যে এত বড় হতে পারে, এ কথা যেন কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু ফিরে আসবার পরে একটা হিসাব আমি মেলাতে পারিনি। একখানা ইংরেজী গাইড-বইএ দেখলুম যে এই মূর্তিটি সত্তর ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় গাইড-বইএ সাতান্ন ফুট দেখেছিলুম। সরকারী পুস্তিকাতেও এই মূর্তির উচ্চতা সাতান্ন ফুট। কর্ণাটক রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া জেলায় এই রকমের বিরাট মূর্তি নাকি আরও দুটি আছে কর্কল ও ভেনুর নামে দুটি অনাদৃত স্থানে। ম্যাঙ্গালোর থেকে মুদবিদ্রি বাইশ মাইল দূরে। পথ বেশ ভাল। এখানকার একটি জৈন মন্দিরের স্থাপত্যকলা দেখবার মতো। সেখান থেকে কর্কল বারো মাইল উত্তরে এবং আরও ষোল মাইল পূর্বে ভেনুর। ম্যাঙ্গালোর থেকে বাসে এই সব জায়গা দেখা যায়।

ফার্গুসন সাহেবের কথাও শুনেছি। শ্রবণবেলগোলার এই মূর্তি দেখে তিনি বলেছিলেন যে মিশরের বাহিরে পৃথিবীর আর কোথাও এর চেয়ে চমৎকার দর্শনীয় বস্তু নেই এবং সেখানেও কোন জানা মূর্তি এর চেয়ে উঁচু নয়। সরল কথায়, এখানকার এই মূর্তির জুড়ি পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

এ মূর্তিটি নিচে তৈরি করে নিশ্চয়ই এই পাহাড়ের উপরে তোলা হয় নি। নিচের কোন পাথর তুলে আনাও সম্ভব নয়। মনে হয় যে একটা বিরাট উঁচু পাথর এই পাহাড়ের উপরেই ছিল, তাকেই কেটে খোদাই করে এই মূর্তির আকার দেওয়া হয়েছে। শুনলুম, এই মূর্তি সাতান্ন ফুট উঁচু। একখানা পাথর কেটে তৈরি। তার পায়ের নিচে একটি ধাতুর মূর্তি। ধাতুর মূর্তির উপরেই গোমতেশ্বরের পূজা হচ্ছে। জন কয়েক জৈন নরনারী ফুল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করছিলেন। অত বড় মূর্তির সামনে তাঁদের পুতুল বলে মনে হচ্ছিল।

তাপ্তি বোধ হয় ঠিক আমারই মতো ভাবছিল। বলল: ছবি দেখে কিছুই অনুমান করতে পারি নি।

সত্যিই তাই। ছবিতে আমরা মূর্তির উপরের অংশ শুধু দেখেছি। দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি। একতলার মেঝে থেকে দোতলার ছাদ পর্যন্ত অংশ আমরা দেখতে পাই নি। কী করে দেখব! দশটা মানুষের চেয়েও যে বেশি উঁচু!

তাপ্তি যখন ছবি তোলবার চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরে দেখছিল, আমি তখন ভাল করে দেখছিলুম এই মূর্তিটি। এই বিশাল নগ্ন-মূর্তিটি যেন পার্থিব সব কিছু ত্যাগের প্রতীক; আর মূর্তির অনমনীয় দৃঢ়তায় কঠিন সংযম প্রকাশ পাচ্ছে। পায়ের দু পাশের বল্মীক স্তূপ থেকে যে লতা তাঁর পা ও হাত জড়িয়ে উপরে উঠেছে, তাই দেখে তাঁর সমাধির গভীরতা বোঝা যায়।

তাপ্তি কোনখান থেকেই পুরো মূর্তিটা দেখতে পেল না। শেষ পর্যন্ত আধখানা ছবিই নিল। আমাকে বলল পিছনের রেলিঙের পাশে দাঁড়াতে। ছবিতে একটা মানুষ থাকলে এই মূর্তির উচ্চতা খানিকটা অনুমান করা যাবে।

ততক্ষণে মামা মামী ও স্বাতি এসে উপরে পৌঁছে গেছেন। ক্লান্ত শরীরে মামা চাতালের উপরেই বসে পড়লেন। হাঁপালেন

খানিকক্ষণ ধরে, তারপর আমাকে দায়ী করলেন এখানে আনবার জন্যে : এ সমস্তই গোপালের কারসাজি।

মামী বললেন : তোমাদের তো কারও শখ ছিল না, গোপাল একাই দায়ী।

এই কষ্টের কথা বললে কি আর রাজী হতুম।

মামা তখনও হাঁপাচ্ছেন। আর স্বাতি হাসছে। বুঝতে পারলুম যে এ হাসি মামার মন্তব্যের জন্য নয়, এ হাসি আমার হাসির উত্তর। আমি কোন কথা বললুম না, কতক্ষণ সে হাসে আমি তাই দেখতে চাই। সূর্যের আলোয় পৃথিবী তখন হাসছে।

মামী বললেন : এ তো দেখছি বুদ্ধের মূর্তির মতো।

সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্তি। বুদ্ধের নগ্ন মূর্তি কোথাও দেখি নি, কোথাও আছে বলে শুনি নি কারও কাছে। তাইতেই সকলের ধারণা যে এ জৈন মূর্তি। জৈনদের দিগম্বর সম্প্রদায় আছে। নগ্নতায় তাদের বিশ্বাস। বললুম : বুদ্ধের নয়, এ জৈন মূর্তি, গোমতেশ্বরের।

মামা একটু সুস্থ বোধ করছিলেন, বললেন : আদিনাথ পার্শ্বনাথের নাম শুনেছি। এ তো দেখছি নতুন নাম।

বললুম : ইনি তো চব্বিশ তীর্থঙ্করের একজন নন, তাই এঁর নাম আমরা জানি না।

একজন অল্প বয়সের ছেলে খানকয়েক বই হাতে এগিয়ে এল। তাকিয়ে দেখলুম যে বারান্দার এক ধারে একটা বইএর দোকানও আছে। যে অঙ্গনের মাঝখানে মূর্তি, তার চারিধারে ঘর ও বারান্দা। যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করে। ছেলেটি বলল : গোমতেশ্বরের গল্প এই বইএ আছে। ভারি চমৎকার গল্প।

মামা বললেন : তোমার বইএর দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি, তুমি গল্পটা আমাদের শোনাও।

এ প্রস্তাব ছেলেটির কাছে অদ্ভুত মনে হল। গল্প শোনাতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু বই না নিয়ে দাম দেবে, সে আবার কী কথা!

মামা বললেন: বিশ্বাস হচ্ছে না? এই নাও তোমার বইএর দাম।

বলে একটা টাকা দিলেন।

ছেলেটি বই দিল, খুচরো পয়সাও ফেরত দিল। তারপর তার গল্প শোনাল। উত্তর ভারতে গোমতেশ্বরের নাম বাহুবলি। অনেকে ভুজবলিও বলে। ইনি ছিলেন জৈন সম্রাট আদি তীর্থঙ্কর বৃষভদেবের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম ভরত। রাজ্যের অধিকার নিয়ে এই দুই ভাই-এ বিবাদের পর দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল। বাহুবলি জয়লাভ করেও রাজ্য গ্রহণ করেন নি। মনে বৈরাগ্য আসায় বিজিত বড় ভাইকে রাজ্যের অধিকার ছেড়ে দিয়ে নিজে বনবাসী হয়েছিলেন তপস্যার জন্য। রাজা ভরত এই ত্যাগী পুরুষের সিদ্ধিলাভের পর পাঁচশো পঁচিশ ধনুর সমান লম্বা এক মূর্তি স্থাপন করেন। এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। এ মূর্তি গঙ্গারাজ রাজমল্লের সেনাপতি চামুণ্ডা রায়ের কীর্তি। চামুণ্ডা রায় যখন বাহুবলির মূর্তির অনুসন্ধান করেন, তখন সেই মূর্তির নাম হয়েছিল কুক্কুটেশ্বর। বিপদসঙ্কুল স্থান। সকলকে দর্শনও দেন না। নিজে দর্শন না পেয়ে চামুণ্ডা রায় এই নূতন মূর্তি স্থাপন করেন।

সমস্ত গল্পটা শুনে মামা বললেন: নতুন মূর্তিই বটে। দেখছ তো গোপাল, হাজার বছরের জলঝড় গেছে এর ওপর দিয়ে। একটা আঁচড় নেই, দাগও লাগে নি একটাও।

বালকটি বলল: এখানকার সব চেয়ে বড় উৎসব হল মহামস্তকাভিষেক। আপনারা দেখেন নি বুঝি?

আমি বললুম: না।

উৎসাহিত হয়ে বালকটি বলল: ইস! একটা অদ্ভুত জিনিস আপনারা দেখেন নি। উনিশশো সাতষট্টি সালে আবার আসবেন চোদ্দ বছর পর পর মস্তকাভিষেক হয়।

এ সবের ইতিহাস তার মুখস্থ। বলল: আগে অনেক দিন পর

পর হত ১৩৯৮ সালে বোধহয় প্রথম হয়েছিল তখন পণ্ডিতেরা পাঁজিপুঁথি দেখে গ্রহনক্ষত্রের বিশেষ সমাবেশের সময় মস্তকাভিষেকের বিধান দিতেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল: এখানে আসবার পথে একটা ঘরে অনেক বাঁশ আর খুঁটি দেখতে পান নি ?

দেখেছি তো।

ঐ সমস্ত কাজে লাগে। দাঁড়ান, আপনাদের ছবি দেখাচ্ছি।

বলে সে তার দোকান থেকে একখানা ছবি নিয়ে এল। বিক্রির জন্যেই রাখে। তাতে দেখলুম, মূর্তির চারিদিক ঘিরে মাচা তৈরি হয়েছে। বাড়ি তৈরি বা মেরামতের জন্যে যেমন ভারা তৈরি হয় তেমনই, তবে অনেক যত্নে অনেক সুন্দর করে বাঁধা। বালকটি বলল: পুরোহিতরা এই ভারা বেয়ে ওপরে উঠবেন, আর তারপর মস্তকাভিষেক হবে। ষোল রকম উপাদান লাগে—দুধ দই মধু সোনা রূপোর টাকা হীরে জহরৎ আর কত কী! ভারতের সমস্ত জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আসে। এই পাহাড়ে আর পাথর থাকে না, সব মানুষে ঢেকে যায়।

বললুম: সাবাস।

বালকটি বলল: এই পাহাড়ে আটটা বস্তি আছে, আর তীর্থঙ্করদের মূর্তি আছে তেতাল্লিশটি। বস্তি কাকে বলে জানেন ?

বললুম: না।

মন্দিরকেই বস্তি বলে। এই পাহাড়ে ওডেগাল বস্তিই সবচেয়ে বড়। এখানে বাহুবলির পিতা আদি তীর্থঙ্কর বৃষভদেবের মূর্তি আছে।

মামা বললেন: এই একটিই আমাদের কাছে যথেষ্ট।

তখন অল্প অল্প বাতাস আসছে। স্নিগ্ধ বাতাস। ক্লান্তি জুড়িয়ে যাচ্ছে। মামীও বিশ্রামের জন্য বসেছিলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাপ্তি স্বাতির সঙ্গে কথা কইছিল। মামা বললেন: একটা অভিজ্ঞতা হল।

কষ্টের না আনন্দের সে কথা তিনি বললেন না। আমি নীরব থেকে তাঁকে আরও কিছু বলবার অবকাশ দিলুম।

মামা বললেন: পৃথিবীর লোকে আমাদের একটা অসভ্য জাত বলে জানে্। আজকাল আমরা যেমন আদিবাসীদের উন্নতির জন্যে লেগেছি, তেমনি পৃথিবীর একটি আদিবাসী জাতকে ইংরেজ নাকি সভ্য করে গেছে! পৃথিবীর লোক এসে এই সব দেখে যাক।

বললুম: দেখবে না, প্রয়োজন হলে তারা চোখ বুজে থাকবে।

পাহাড়ে উঠতে বেশি কষ্ট, না নামতে, সে তর্কের কথা। লোকে উঠতেই বেশি কষ্ট বলে। যত চড়াই, তত কষ্ট। হাঁফ লাগে, দম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নামতে সে সব নেই। হাল্কা পায়ে গড়গড়িয়ে নামা যায়। নামতে যে কষ্ট আরও বেশি, সে কথাও অনেকে বলে। খুব শক্ত কাজ, খুব সাবধানতার কাজ। পা হড়কালেই প্রাণ গেল। মামাকে দেখলুম দ্বিতীয় দলে। তিনি ওঠবার সময় যা বলেছিলেন, নামবার সময় তার উল্টো বললেন: এখন দেখছি নামতেই বেশি কষ্ট।

মামী বললেন: কিছু করতে হলেই তো তোমার কষ্ট।

তবে আর কী, তোমার মনোরঞ্জনের জন্যে হয় মিথ্যে বলি, নয় পাহাড় ভাঙি।

স্বাতি বলল: ঐ পাহাড়টায় আমরা উঠব বাবা?

বলে সে কল্যাণীর অপর পারের চন্দ্রগিরি পাহাড়টা দেখাল।

মামা বললেন: আবার পাহাড়!

আমার দিকে ফিরে বললেন: বুঝলে গোপাল, পাহাড়ের ধারে কাছে আর নয়। তোমার বেলুর আর হালেবিড যদি ঢিপির ওপরেও হয় তো এইখান থেকেই ফিরে চল।

মামী বললেন: দেশে ফিরে একতলার বসবার ঘরটায় তোমার

শোবার ব্যবস্থা করে দেব। তাহলে আর ওপর-নিচ করতে হবে না।

মামা বললেন : প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

অনেকটা পথ নেমে আসবার পরে একটা শব্দ কানে আসতে লাগল। ঠক ঠক করে ধাতুর জিনিস পেটাইএর শব্দ। অবিশ্রান্ত একটানা শব্দ। কোন ছেদ নেই, বিরাম নেই। পরে শুনেছিলুম যে এখানে পিতলের বাসন তৈরি হয়। এ অঞ্চলে এই বাসন-শিল্পের নাম আছে।

উপরে উঠতে আমাদের আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম সময়েই আমরা নিচে নেমে এলুম।

একেবারে নিচে নেমে মামা বললেন : কাণ্ড দেখেছ গোপাল ?

কৌতূহলী হয়ে আমি চারি দিকে চাইলুম। কিন্তু দেখতে কিছুই পেলুম না।

মামা বললেন : এখানেও ডাব বিক্রি হচ্ছে।

মামী বললেন : তেষ্টা পেয়েছে বুঝি ?

ততক্ষণে আমি ডাবের দাম চার থেকে তিন আনায় নামিয়ে ফেলেছি। এদের ভাষা জানলে হয়তো দু আনাতেই রফা হত। সবাই একটা করে ডাব খেলুম। স্বাতি বলল : তিন আনায় ডাবের কথা কাউকে বোলো না গোপালদা। কিছুদিন পরে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আরও কিছু সংবাদ পেলুম এইখানে। জৈন মঠে চন্দ্রনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দির আছে। চন্দ্রনাথ মন্দিরে আছে চব্বিশ তীর্থঙ্করের ফ্রেস্কো চিত্র এবং চুনী পান্না প্রবাল ও নীলার মতো মূল্যবান পাথরে তৈরি আটটি মূর্তি। ভাণ্ডারা বস্তিটিই এখানে সবচেয়ে বড়। এটি হয়শাল স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন।

গাড়িতে বসে মামা বললেন: এ সব দেখার কষ্ট আছে বটে, আনন্দও আছে।

এইটেই সব চেয়ে বড় সত্য। এই আনন্দের লোভেই তো মানুষ দুর্গম দুস্তর পথ কত ক্লেশে অতিক্রম করে। চলার নেশা কোন দিন ফুরোয় না, ফুরোবেও না। পৃথিবী যে সারাক্ষণ চলে। মানুষকেও চলতে হবে। পৃথিবী প্রতি দিন হাসে, মানুষও হাসবে।

এবারে আমরা বেলুরে যাব। বেলুর এখান থেকে ছাপ্পান্ন মাইল দূরে।

১২

এই অঞ্চলে কোন্ ধর্মের একাধিপত্য ছিল না। নর্মদার তীরে তীরে কাঞ্চীপুরে আরও কত স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের নানা নিদর্শন আছে ছড়িয়ে। তেমনি জৈন ধর্মেরও। এই শ্রবণবেলগোলাতেই না জানি কত সমৃদ্ধি ছিল। কত আয়োজন, কত অনুষ্ঠান! এক দিন অনেক ছিল বলেই আজও কিছু আছে। এখানে বাস আসে নানা জায়গা থেকে। মাইসোর আর ব্যাঙ্গালোর থেকে চেন্নারায় পাটনার উপর দিয়ে বাস আসে। দূরত্ব বাষট্টি আর একশো মাইল। চেন্নারায় পাটনায় একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্র্যাভলার্স বাংলো আছে। শ্রবণ-বেলগোলা থেকে সেটি আট মাইল দূরে। নিয়মিত বাস চলাচল করে। এই অঞ্চলের দর্শনীয় স্থানের প্রধান ঘাঁটি হল হাসান নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন। সেখান থেকে সবই কাছাকাছি। শ্রবণ-বেলগোলা বত্রিশ মাইল দূরে, বেলুর ও হালেবিডের দূরত্ব চব্বিশ আর কুড়ি মাইল। পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়া টুরিজ্‌ম ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন এখানে হাসান মোটেল নামে একটি ওয়েস্টার্ন স্টাইলের মোটেল স্থাপন করেছে। আর্থিকেরে নামে আরও একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। সেখান থেকেও বাস যাতায়াত করে এই সব স্থানে।

রাস্তা চমৎকার। যে পথে আমরা এসেছি, এ সেই অনাদৃত অসমতল পথ নয়। এ সদর রাস্তা। কিছু দূর এগিয়েই বড় রাস্তায় পড়েছে। সে রাস্তা গেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোর, তারই মাঝপথে হাসান।

তাপ্তি ভেবেছিল, রেল গাড়িতে এই হাসানে আসবে। উঠবে ডাক বাংলোয়। তারপর বাসে চেপে এক দিন শ্রবণবেলগোলা,

আর এক দিন বেলুর আর হালেবিড দেখবে। ও দুটো জায়গাই এক দিকে। বেলুর থেকে হালেবিড পৌঁছতে আধ ঘণ্টাও সময় লাগে না। মাত্র দশ মাইল পথ। হাসানে ফেরবার জন্য আর একটা সংক্ষেপের রাস্তা আছে পাহাড়ের ধার দিয়ে। রাস্তার ধারে ধারে অজস্র জংলী ফুল ফোটে। বেশ লাগে। এ সমস্তই আমরা দেখেছি।

তার আগে মামা বললেন: জৈনরা এত দক্ষিণেও এসেছিল!

ভয়ের ভাব দেখিয়ে স্বাতি বলল: দোহাই গোপালদা, এখন আর ধর্মের কচকচি নয়। তার চেয়ে বেলুর সম্বন্ধে যদি কিছু বলবার থাকে তাই বল।

তাপ্তি কী বুঝল সেই জানে, আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কী বলল স্বাতি?

বললুম: ধর্মের কথা সে শুনবে না।

তবে কি অধর্মের কথা শুনবে?

হেসে বললুম: প্রায় সেই রকম।

পিছন থেকে স্বাতির তর্জন শুনতে পেলুম, বলল: আর যাই কর, আমাকে নিয়ে তামাসা কোরো না।

ইচ্ছে করেই কথাটা বাঙলায় বলল। তাপ্তি বুঝবে না, বুঝব আমি। তাপ্তি প্রশ্ন করবে, আমি উত্তর দেব, আর সে হাসবে। কিন্তু তাপ্তি কিছু জানতে চাইল না। আমিও তার উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন: এত দিন একটা বেলুড়ের নাম জানতুম। বেলুড় মঠ। এ দেশেও যে বেলুর আছে, সে এখানে এসেই শুনলুম।

স্বাতি বলল: বেলুর নামটা কোথা থেকে এল?

প্রশ্নটা যে আমাকে, তাতে সন্দেহ নেই। উত্তর জানা ছিল বলে বললুম: বিদ্যার পরীক্ষা নিচ্ছ বুঝি?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: গোপালদার কথা শোন বাবা, আমি ওঁর বিদ্যার পরীক্ষা নেব।

তর্ক এড়িয়ে বললুম: কলকাতার বেলুড় আর এই বেলুরে বানানের তফাৎ আছে। কলকাতায় ড-এ বিন্দু ড়, আর এখানে ব-এ বিন্দু। আরও মজার কথা, এই বেলুর নামই এ দেশে আরও অনেক আছে। মাদ্রাজের সেলম জেলায় এক বেলুর আছে, আর্কট জেলায় আর একটি। বোম্বাই প্রদেশেও এক বেলুর আছে। আর সর্বত্রই কিছু না কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। আমরা যে বেলুর দেখতে যাচ্ছি, তা হাসান জেলার। এর পৌরাণিক নাম বেলপুর, ঐতিহাসিক নামও তাই। প্রাচীন শিলালিপিতে পাওয়া গেছে। কাজেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এতগুলো বেলুর নাম আমি জানতুম না। কাল সন্ধ্যেবেলায় তাপ্তির মুখে শুনেছি। এখন তা শুনিয়ে দিয়ে সবাইকে চমকে দিলুম। ইতিহাসের কিছু কথাও আমার জানা ছিল, বললুম: হয়শাল বংশের রাজা বিষ্ণুবর্ধন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মামা বললেন: রামানুজের কথায় তোমরা এই রাজারই কথা বলেছিলে না?

বললুম: ঠিক তাই। প্রথমে এঁরা জৈন ছিলেন। বিষ্ণুবর্ধনই প্রথম বৈষ্ণব হন, পরে এই বংশের রাজা শৈব হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

কী রকম?

বললুম: যতটুকু জানি, সান নামে এক ব্যক্তি ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়শাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষেরা হয় কল্যাণের চালুক্য রাজাদের, নয় দক্ষিণের চোল রাজাদের সামন্ত ছিলেন। দ্বারসমুদ্রে ছিল এঁদের রাজধানী। সেখানে আজও অনেক জৈন বস্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন বিষ্ণুবর্ধন। যেমন ধর্মে, তেমনি শিল্প-স্থাপত্যে ছিল তাঁর নিবিড় অনুরাগ। আর যুদ্ধে ছিলেন অপরাজেয়। তিনি কাঞ্চীর চোল, মাদুরার পাণ্ড্য, গোয়ার কদম্ব, মালাবারের পেরুমল ও গঙ্গ

রাজাদের পরাজিত করে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হন। বলতে গেলে তিনি ছোটখাট একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর রামানুজের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব হন ১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর আট বছর পূর্বে। তার পরেই প্রতিষ্ঠা করেন বেলুরের চেন্নাকেশব বিষ্ণুর মন্দির। চেন্না মানে সুন্দর।

চেন্না কথাটির আর একটা মানে আমি শুনেছিলুম অন্ধ্রের একটা স্টেশনে। তারা পেদ্দা মাস্টার বলছিল স্টেশন মাস্টারকে আর চেন্না মাস্টার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টারকে। আমি পেদ্দা আর চেন্না মানে বড় আর ছোট মনে করেছিলুম।

তাপ্তি আমাকে আর একটা নাম বলেছিল। জখনাচারির নাম। হয়শাল রাজাদের একজন বিখ্যাত স্থপতি। মহিসুরের শ্রেষ্ঠ তিনটি মন্দির হল বেলুর হালেবিড আর সোমনাথপুরে। এই তিনটিই নাকি তাঁরই পরিকল্পনায় নির্মিত। কিন্তু তাঁরই তত্ত্বাবধানে কিনা তাতে সংশয় আছে। তাপ্তি বলেছিল যে এই নিয়ে সে একটু গবেষণাও করবে। সত্যিই এ জিনিস গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

এইটুকু শুনে আমি থেমে গিয়েছিলুম। কিন্তু তাপ্তি থামে নি। আস্তে আস্তে বলেছিল: শুনেছি, ইয়োরোপেও এই সময়ে অনেক সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। লিঙ্কনের গির্জার নাম শুনেছেন? সেও এই সময়ে তৈরি। বইএ পড়েছি যে এই রকমের আরও গির্জা আছে ওয়েলস্ অ্যামিয়েন্স রীম্স প্রভৃতি স্থানে। সবই প্রায় সমসাময়িক। মনে হয় যে এ একটা যুগ, যখন স্থাপত্যের অনুরাগ ছিল পৃথিবীর সকল দেশে। নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ ছিল। সেই যোগসূত্রটি ধরতে পেলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।

পরিচ্ছন্ন রাজপথে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। আশে পাশে ঘর বাড়ি দেখে মনে হল যে আমরা একটি শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। সত্যিই তাই। আমরা হাসান শহরে প্রবেশ করছি।

জেলার প্রধান শহর এটি। ড্রাইভার বলল: ভাল কফির দোকান আছে, দাঁড়াব কি?

মামা বললেন: গোপাল কী বল?

উত্তর মামী দিলেন: সেই সাত সকালে বেরিয়েছ, কিছু খেয়ে নাও না।

মাথা দুলিয়ে মামা বললেন: এইজন্যেই গিন্নীদের কদর। শুধু দেহের নয়, দেহের অভ্যন্তরের খবরও তাদের জানা। বুঝলে গোপাল—

মামী বাধা দিয়ে বললেন: কী যা-তা বলছ?

মামা কিন্তু থামলেন না, বললেন: ডাক্তারের সঙ্গে গিন্নীদের একটা প্রকাণ্ড মিল আছে। দু দলই পাকা। ডাক্তার যেমন রোগীর বেলায়, গিন্নীরা তেমনি কর্তাদের ব্যাপারে।

স্বাতি হেসে উঠল।

ডাবের জলে মামার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, কিন্তু নেশার নিবৃত্তি হয় নি। এ সময় একটু চা কিংবা কফির অন্য রকম আস্বাদ। মামী এই দুর্বলতার সংবাদটি জানেন বলেই মামা প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন।

ড্রাইভার একটা রেস্তোরাঁর সামনে তার গাড়ি দাঁড় করাল। মামী নামতে চান নি। পরে কী ভেবে নামলেন, কিন্তু কিছু খেলেন না। আমরা কফি খেলুম, তার সঙ্গে মসালা ডোসা। এ সবে স্বাতির অদ্ভুত অনুরাগ। তারই আগ্রহে সবাইকে খেতে হল।

আমরা যখন বেলুরের মন্দিরে এসে পৌঁছলুম, মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড তখন মাথার উপর উঠেছেন। প্রখর রৌদ্র। পায়ের নিচে বাঁধানো চত্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু পায়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে।

মামা বললেন: যা দেখবার আছে, তাড়াতাড়ি দেখে নাও।

এ কথা সময়ের অভাবের জন্য নয়, এ উত্তাপ দেখে। মাথা পুড়ছে, পা ঝলসে যাচ্ছে। মস্ত বড় গোপুরের নিচে দিয়ে আমরা

মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণে পৌঁছেছি। চারি দিকে উঁচু দেওয়াল, মাঝখানে বেঁটে মন্দির। নিতান্তই বেঁটে। মন্দির যে এমন হয়, এ আমাদের ধারণার অতীত। চূড়ো নেই, গম্বুজ নেই, এমন কি একটা আলসেও নেই। কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তারার আকৃতির একটি ভিতের উপর উঠলেই মন্দিরের দরজা। সামনে কিছু কারুকার্য আছে বলে মনে হল, কিন্তু দূর থেকে উল্লসিত হওয়া চলে না। স্বাতি বলল: আমরা কি এই দেখতে এত দূর এলাম?

তাপ্তিও বোধহয় বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু হতাশ হয় নি। বলল: কাছে গিয়ে দেখতে হবে।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি আমরা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলুম। মন্দিরের টানে নিশ্চয়ই নয়, পায়ের আরামের জন্য। একটু ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে দেখবার আগ্রহ হবে।

নিকটে গিয়ে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলুম। এ কী অদ্ভুত দৃশ্য! পাথরে যে প্রাণ দেখতে পাচ্ছি।

স্বাতি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কথা কইতে পারল না। মামা মামীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তাঁরাও অপরিমিত আশ্চর্য হয়েছেন। হয় নি শুধু তাপ্তি। সে বোধহয় এই রকম কিছুরই প্রত্যাশা করেছিল।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে আমরা ভুলে গেলুম। দেবতার কথা আমাদের মনে পড়ল না। আমরা বাহিরের রূপ দেখতে লাগলুম মুগ্ধ চোখে।

মন্দিরের গাত্র নিচ থেকে উপর পর্যন্ত অপর্যাপ্ত কারুকার্যমণ্ডিত। মেঝের কাছে এক সারি হাতি সারিবদ্ধ হয়ে চলেছে। তার উপরের সারিতে নানা রকম ফুল লতা পাতা। দেবতার মূর্তি তার উপরের সারিতে। সারির শেষ নেই, মূর্তিরও নেই। একেবারে উপরের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্ময় বাড়ল। কারুকার্য করা থামের উপর নৃত্যপরা নারীমূর্তি। দেবীমূর্তিও হতে পারে। পায়ের কাছে

যুক্তকর ভক্তবৃন্দ। দেবীর এক পদ মাটিতে, অন্য পদ শূন্যে, ভঙ্গি নৃত্যের। কটিতে মেখলা, বক্ষ নিরাবরণ। সারা অঙ্গে নানা অলঙ্কার। অদ্ভুত জীবন্ত মূর্তি। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

শোনা গেল যে ব্র্যাকেটের উপর এই রকম মূর্তি সব শুদ্ধ আটত্রিশটা আছে। এর মধ্যে সরস্বতীর মূর্তিও নাকি আছে। পরে শুনেছিলুম যে কোন কোন মূর্তির হাতের বালা আর মাথার মুকুট নাকি নাড়ানো যায়, খুলে নেওয়া যায় না। গাইড নিলে তারা এই সব দেখায়।

স্ত্রী মূর্তিগুলির সাধারণ নাম মদলিকা। পূর্ব দিকের দরজার কাছে ব্র্যাকেটে একটি মদলিকা আছে দর্পণ হাতে। সেই দর্পণে মুখ দেখে সে কপালে সিঁদুরের টিপ পরছে। দক্ষিণের দরজার কাছে এমনি এক মদলিকা আছে নৃত্য শেষে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে। একটি ব্র্যাকেটের উপরে এক মদলিকা সহসা একটি বৃশ্চিক দেখেছে নিজের শাড়ির প্রান্তে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে সেটি তাড়াবার চেষ্টা অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে সেখানে ভরত নাট্যমের ভঙ্গিতে মদলিকাদের দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

মন্দিরের ভিতরে ঢোকবার দরজা তিন দিকে—উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে। দরজার দুই ধারের কারুকার্য আরও অপূর্ব। থমকে না দাঁড়িয়ে সরাসরি ভিতরে যাওয়া যায় না।

এই মন্দিরের ভিতরে একটি মাত্র ঘর। অন্ধকার অভ্যন্তর। তবু তার শিল্পকর্ম দৃষ্টি এড়াল না। দরজার পাশে স্তম্ভগাত্রে এমন কি উপরের ছাদে পর্যন্ত বিচিত্র কারুকার্য। শ্রমের এমন অজস্র অকৃপণ অপচয় ভারতের আর কোন মন্দিরে বুঝি নেই। এক খণ্ড পাথরকে আর পাথর থাকতে দেয় নি, সমগ্র মন্দিরটা একটা প্রাণের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। এক সময় স্বাতি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তার মুখে এখনও কোন কথা নেই।

প্রশ্ন করলুম: কেমন দেখছ?

বিশ্বাস হচ্ছে না।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

স্বপ্ন নয় তো!

হয়তো স্বপ্নই। শিল্পীর স্বপ্ন। স্বপ্নকে সে ধরে রেখেছে।

মামা মামী মন্দিরের বিগ্রহ খুঁজছিলেন। সে দরজা এখন বন্ধ। যাঁরা সকালে এসেছেন, তাঁরা বোধহয় সবই দেখেছেন।

একজন বললেন: এমন সুন্দর বিগ্রহ আমরা আর কোথাও দেখি নি।

তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন: প্লাস্টিক আর্টের নিদর্শন।

ইচ্ছা হল তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, সে আবার কী! কিন্তু তত ক্ষণে তাঁরা সরে গেছেন।

আমরা আশে পাশের মন্দিরগুলোও দেখলুম।

কাম্পে চেন্নিগরাযের মন্দিরে গণেশ দুর্গা ও সরস্বতীর মূর্তিও অপরূপ সুন্দর। সৌমনায়কী ও বীরনারায়ণের মন্দিরও আছে। এখানকার পুষ্করিণীটিও হয়শাল রাজাদের কীর্তি।

কতক্ষণ ধরে দেখলুম তা মনে নেই। পায়ের নিচের উত্তাপের কথাও মনে ছিল না, পেটের ক্ষুধার কথাও আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। যখন সব মনে পড়ল, তখন তাপ্তিকে আর দেখতে পাচ্ছিলুম না। তাপ্তি কোথায় গেল! সব চেয়ে ব্যস্ত হলেন মামা নিজে: মেয়েটা—

তাড়াতাড়ি আমি মন্দিরের পিছনে দেখতে গেলুম। সে সেখানেই ছিল। গভীর মনোযোগে সে দেওয়ালের ছবি তুলছিল। আমাকে দেখেই লজ্জা পেয়ে বলল: আপনাদের দেরি করে দিলাম বুঝি।

একটুও না।

সে কি! আমি যে অনেকক্ষণ আপনাদের ছেড়ে আছি!

এতক্ষণে আমাদের সে খেয়াল হল।

ক্যামেরা বন্ধ করে তাপ্তি বলল: এত ছবি কেন নিলাম জানেন?

না।

ইরানী আবদুর রাজাক এই মন্দির দেখেছিলেন ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বর্ণনা কিছুই লেখেন নি। বলেছিলেন, যা কিছুই লিখবেন, লোকে অতিশয়োক্তি বলবে।

মামা মামী দেওয়ালের ধারে ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উপরে একটু ছাদ আছে। বোধহয় যাত্রীদের বাসের ব্যবস্থা ছিল পুরাকালে। আমাকে দেখে মামী বললেন: খাবারটা এইখানে খেলেই বোধহয় ভাল হয়।

মামা মেঝের দিকে চাইলেন। বোধ হয় তাঁর নোংরা বোধ হল। মামী বললেন: গাড়ির চেয়ে এইখেনেই খেতে সুবিধে হবে। জল ঢালাঢালি—

মামা বসে বললেন: বুঝেছি।

আমি খাবার আনতে গেলুম। তাপ্তি ও স্বাতি আমার সঙ্গে এল। আমরা যেন এক পরিবারের লোক।

১৩

বেলুরের মন্দির ছেড়ে বাজার পেরিয়ে আমাদের গাড়ি হালে-বিডের দিকে ছুটেছে। দুধারে পথের দৃশ্য বড় মনোরম। শুধু এখানে নয়, সারা পথ আমরা সুন্দর দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখেছি। প্রকৃতি কি তার পাগলা রূপ এ দেশে উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে!

তাপ্তি আমার পাশে বসেছে। তার দেহের উত্তাপ পাচ্ছি, সৌরভও পাচ্ছি। সকাল বেলায় যাত্রার শুরুতে যে অনুভূতি ছিল, এখন আর তা নেই। এখন অন্য দিকেও মন দিতে পারছি, উপভোগ করতে পারছি প্রকৃতির দুরন্ত রূপ। কিন্তু তাপ্তি আমাকে তার দিকে ফিরিয়ে আনল। বলল: আমার একটা উপকার করবেন?

উপকার!

হ্যাঁ উপকার। কথা দিলে তবেই বলব।

এ তো ভারি মজার কথা। না জেনেই কথা দিয়ে দেব, রাখতে না পারলে!

রাখতে অনায়াসেই পারবেন, তাইতেই তো কথা চাইছি।

বেশ, বলুন।

তাপ্তি বলল: আমার জন্যে আপনারা খরচ করবেন না। আমি—

আমার জোরে জোরে হেসে উঠবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু চেপে গেলুম। আমার মুখের ভাব দেখে তাপ্তি বলল: কী হল?

কিছু না।

কিছু না নয়, একটা উত্তর দিন।

সত্যি কথা শুনবেন?

শুনব।

আমিও আপনার মতো অতিথি।

বড় বড় চোখ মেলে তাপ্তি আমার মুখের দিকে তাকাল। সহসা আমার কথা সে বিশ্বাস করতে পারল না। বললুম: বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

তাপ্তি তার অবিশ্বাসের কথা গোপন করল না, বলল: কী করে হবে।

বললুম: আপনার সঙ্গে যেমন মাইসোর স্টেশনে দেখা, আমার সঙ্গে দেখা হাওড়া স্টেশনে। তফাৎ এইটুকু যে আপনার সঙ্গে একেবারেই পরিচয় ছিল না, আর আমার সঙ্গে এই ক দিনের পরিচয়। তার পিছনে আছে একটুখানি পাতানো আত্মীয়তা।

তাপ্তির বোধহয় বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে বললুম: মামার চাকর হারিয়ে গিয়েছিল স্টেশনের ভিড়ের ভেতর। টিকিট কেনা ছিল। তাই আমাকে সঙ্গে নিলেন সাহায্য পাবার আশায়। সেই থেকে এই ভাবে ঘুরছি।

তাপ্তি অনেকক্ষণ কথা কইল না। তারপর করুণ ভাবে বলল: তাহলে কি স্বাতিকে বলব?

সেই তো আপনাকে সঙ্গে নিয়েছে।

কিন্তু—

কিন্তু কী?

আচ্ছা তাকেই বলব।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। তারপরেই তাপ্তি বলল: আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ল।

কেন বলুন তো?

আপনার কি কেউ নেই?

কেন থাকবে না! আপনারা সবাই তো আছেন! গোটা দেশটাই তো আমার, গোটা পৃথিবীটাই।

তাপ্তি বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললুম: ছোট একটা ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে আমার

মন ওঠে না। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, দম আটকায়। খোলা আকাশের নিচে আমি সুস্থ বোধ করি।

তাপ্তি কী বুঝল সেই জানে, বলল: আমারও কষ্ট হচ্ছিল। আমিও বেরিয়ে পড়েছি।

সত্যি!

সত্যি বই কি। কিন্তু আপনার মতো বাইরের টানে আমি বের হই নি। ঘরে থাকতে পারি নি বলেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

মনে হল, তাপ্তি আরও কিছু বলবে। কিন্তু বলল না। বলবার সময়ও ছিল না। হালেবিড গ্রামে আমরা ঢুকে পড়েছি। নিতান্তই অনাদৃত গ্রাম। আমাদের জীবনের মতো। কিছু ঐশ্বর্য আছে, তাই বেঁচে আছে। ঐটুকু ফুরোলেই স্মৃতির পাতা থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে যাবে। ইতিহাসের দ্বারসমুদ্রের নাম আজ কজনে জানে, কজন জানে দ্বারাবতীর নাম! নাম তো অমর হয়ে থাকে না, থাকে কীর্তি। হয়শাল রাজবংশের ঐতিহাসিক কীর্তির কথা লোকে ভুলে গেছে। তাই তাঁদের রাজধানীর নামও আর কারও মনে পড়ে না। আজ কয়েকটা মন্দিরের জন্য এই বংশের অমরত্ব। এই মন্দির যত দিন থাকবে, তত দিন আমরা হয়শালরাজ নরসিংহকে মনে রাখব, মনে রাখব তাঁর অদ্ভুতকর্মা শিল্পী-স্থপতি জখনাচারির কথা, মনে রাখব মধ্যযুগীয় ভারতের কৃষ্টি-সভ্যতার উৎকর্ষের কথা। আমাদের গাড়ি এসে হালেবিডের মন্দিরের সামনে দাঁড়াল।

এ যে বেলুড়ের মতো আদৃত মন্দির নয়, তা অনেকক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। পথ ধূলিধূসর জনহীন সংকীর্ণ। কিন্তু চিরকাল এর এই দশা ছিল না। একাদশ থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত তিনটি শতাব্দী এই স্থান ছিল হয়শাল রাজাদের রাজধানী—জনাকীর্ণ একটি সমৃদ্ধ নগর, তার নাম দ্বারসমুদ্র। এখন এর নাম হয়েছে হালেবিড। কানাড়া ভাষায় হালে মানে পুরাতন, আর বিড়ু মানে রাজধানী। হালেবিডের অর্থ তাই পুরনো রাজধানী। একখানা ইংরেজী বই-এ

পড়েছিলুম যে শ্রবণবেলগোলারও একটা মানে আছে, তা হল শ্বেত সরোবর। কথাটা ঠিক কিনা তা কোন স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখিনি। তবে সেখানকার সরোবরকে বেলাগোলা লেক বলতে শুনেছি।

গাড়ি থেকে নেমে বোঝা গেল যে মন্দিরটি অসম্পূর্ণও বটে। পোড়ো বাড়ির মতো উন্মুক্ত তার প্রবেশদ্বার। উচ্চশির প্রহরীর মতো কোন বিরাট গোপুর এই দ্বারের শোভাবর্ধন করছে না, মন্দিরের প্রাঙ্গণও কেউ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়নি। অনাদর ও অবহেলার চিহ্ন বড় স্পষ্ট হয়ে আছে।

এরই সঙ্গে পরিকল্পনার বিশালতা লক্ষ্য করতেও কষ্ট হল না। এক নয়, এটি জোড়া মন্দির,—দুটি গর্ভগৃহ আছে পাশাপাশি। এ মন্দির হয়শালেশ্বর শিবের মন্দির।

এই হয়শাল বংশের আদি পুরুষেরা জৈন ছিলেন। তখন তাঁরা জৈন মন্দির নির্মাণ করেছেন। এই দ্বারসমুদ্রেই এক বিশাল জৈন মন্দির ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ নাকি আজও আছে। তারপর তাঁরা বৈষ্ণব হয়েছিলেন। বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুবর্ধনের কীর্তি আমরা বেলুরে দেখেছি। অনেকে বলেন যে এই মন্দির তাঁর পুত্র রাজা নরসিংহের আমলে নির্মিত। ১১৪১ থেকে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর রাজত্বকাল। রাজা নরসিংহ কি তবে শৈব ছিলেন ?

একজন হয়শাল রাজার সঙ্গে হালেবিডের নাম জড়িয়ে আছে। তাঁর নাম বীর সোমেশ্বর, তিনিই পুরনো দ্বারসমুদ্রের সংস্কার করেছিলেন। অনেক শিলালিপিতে তাই তাঁকেই এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। শোনা যায় যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবার পরে তিনি পুষ্পগিরি নামে এক পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে রোগমুক্তির জন্য শিবের মন্দির স্থাপনের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। এই সূত্র ধরে অনেকে মনে করেন যে হয়শালেশ্বরের শিবের মন্দিরটির নির্মাণ-কার্য শুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

বীর সোমেশ্বরের রাজত্বকালে। আশি বছর ধরে এই মন্দিরটি নির্মিত হচ্ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ হবার আগেই তা ধ্বংস হয়ে যায়।

ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে দ্বারসমুদ্র ধ্বংস হয়েছিল দুবার, প্রথম বার—১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে, ষোল বছর পরে দ্বিতীয়বার। আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর গোটা দক্ষিণ ভারতটা তাঁর পদানত করে যান ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন দ্বারসমুদ্রের সিংহাসনে ছিলেন তৃতীয় বীর বল্লাল। কাফুর এই রাজধানী লুণ্ঠন করে বীর বল্লালকেও দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন। দ্বারসমুদ্রের দ্বার তিনি মুসলমানদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন বলে খিলজী সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পরে আবার ফিরে আসতে পেরেছিলেন। হিন্দুরাজাদের সুসংহত করে পুনরায় জয় করেছিলেন কর্ণাট ও তামিলনাড়ু। কিন্তু মাত্নরার সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। এই বংশের শেষ রাজা চতুর্থ বীর বল্লাল।

মন্দিরের কাছে গিয়ে মনে হল যে এর কারুকার্য বুঝি আরও সূক্ষ্ম, আরও সুন্দর। মন্দিরগাত্রে এতটুকু স্থানও উপেক্ষিত নয়। ভাল করে স্মরণ করে দেখলুম, বেলুরের মন্দিরেও কিছু পাথরের সন্ধান পেয়েছিলুম। শিল্পীর হাত সেখানে পড়ে নি। অবশ্য অনেক খুঁজে বার করতে হয়েছিল। কিন্তু এখানে খুঁজেও তেমন একটি স্থান পেলুম না। মূর্তিগুলিও আরও জীবন্ত মনে হল, আরও বৈচিত্র্যময়।

তাপ্তি আমার কাছে এসে বলল: আপনার কি একটা কথা মনে হচ্ছে না?

কী কথা বলুন তো!

দ্বারসমুদ্রে এই মন্দিরটাই শুধু ছিল না। সরকারি অফিস কাছারি রাজপ্রাসাদ সাধারণ প্রজাদের ঘর-বাড়ি, এ সমস্তও নিশ্চয়ই ছিল।

তা ছিল বৈকি।

সেগুলোও কি সুন্দর ছিল না? তা না হলে এই মন্দির যে বড় খাপছাড়া দেখাত।

তাপ্তি ঠিকই বলেছে। সাধারণ মানুষেরই ছিল শিল্পবোধ। যখনাচারি একা তো এই মন্দির গড়েন নি। তিনি হয়তো পরিকল্পনাটিই তৈরি করেছিলেন। মন্দিরের গায়ে এই শিল্পের নমুনা তো সাধারণ শিল্পীদেরই হাতের কাজ। এখানকার অনেক মূর্তির নিচে নাকি শিল্পীর নাম লেখা আছে। এ পর্যন্ত ছত্রিশটি নাম পাওয়া গেছে বলে পড়েছি। দ্বিতীয় লিতম তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুধু ছত্রিশ জন তো নয়, শত শত লোক কাজ করেছে, শত শত মজুর। তাদের মধ্যেই শিল্পী ছিল অনেক। তারা দিনের পর দিন বছরের পর বছর অক্লান্ত ভাবে এই পাথর কেটে কেটে এই স্বপ্ন রচনা করেছে। কত বিচিত্র কল্পনা, বলিষ্ঠ সংযত ও সুন্দর! আর কী স্বপ্নময় প্রকাশ! জীবনের আনন্দ ও বেদনা এই পাথরের গায়ে একাকার হয়ে আছে। বললুম: এ একটা যুগের সৌন্দর্য-চেতনা। সে যুগটাকে হারিয়ে আমরা তাকে মধ্যযুগ বলে নিন্দা করতে শিখেছি।

সে যুগটাকে আর কিছুতেই ফেরানো যায় না, তাই না?

কে ফেরাবে? আজও এ দেশে বড় বড় শিল্পী আছেন। তাঁরা একটা প্রাণবন্ত মূর্তি গড়তে পারেন, কিন্তু এমন একটা মন্দির গড়তে পারেন না। একজনের কাজ হলে হয়তো পারতেন। দশজনের কাজ হলেও সাহস করতেন। এ যে হাজার হাজার শিল্পী মজুরের কাজ। এ যুগে এমন একটা মন্দির গড়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাপ্তি বলল: আমি শিল্পীর কথা বলছি না, আমি সৌন্দর্য-চেতনার কথা বলছি।

সে আরও কঠিন। শিল্পের দিকে আজও মানুষ তাকিয়ে দেখে, কিন্তু তার দাম দেয় না। দাম দিতে ভুলে গেছে। যার দাম দেয়, সে শিল্প নয়, সৌন্দর্যও নয়। সে ভোগ। পৃথিবীর মানুষ আজ

ভোগ করতে শিখেছে। এই ভোগের ব্যাধি থেকে মুক্ত না হলে সৌন্দর্য-চেতনা আর ফিরে আসবে না।

তাপ্তি কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: আমি সিনিক নই, জীবনটাকে বাঁকা চোখে আমি কোন দিন দেখি না। কিন্তু তবু যা দেখতে পাই তা বড় নৈরাশ্যজনক। পৃথিবীর মানুষ আজ একটা জিনিস আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে—সে টাকা। ঐ টাকাই আজকাল মনুষ্যত্বের মান, ঐ টাকাই সমাজের ছাড়পত্র। যার টাকা আছে তার সব আছে, যার নেই তাকে সমাজ মানুষ ভাবে না। টাকা দিয়ে আজ সমস্ত পাপের সমস্ত দুষ্কৃতির সমস্ত পশুত্বের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর মনুসংহিতা এখন নতুন করে লেখা হচ্ছে।

নিজেকে বোধহয় আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আমার তো এমন হয় না। হঠাৎ আজ আমার এ কী হল! লজ্জিত ভাবে আমি থেমে গেলুম।

পিছন থেকে স্বাতি বলে বসল: থামলে কেন গোপালদা?

এ কি! স্বাতিও তাহলে সব শুনে ফেলেছে! ফিরে দেখলুম, মামা মামীও আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

মামা বললেন: কথাটা তুমি মিথ্যে বল নি। দিল্লীতে আমি হাড়ে হাড়ে সব অনুভব করছি।

গোপালদা কি দিল্লী দেখেছ?

সত্য তো এক জায়গায় আটকে থাকে না স্বাতি, চোখ মেলে থাকলেই তা দেখতে পাওয়া যায়।

মামা বললেন: তুমি একবার দিল্লী এসো। দিল্লীর শহর আর সমাজ দুটোই দেখে যাও। সরকার তো আমায় থাকবার আস্তানা দিয়েছে, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

বললুম: আসব।

সকৌতুকে স্বাতি বলল: কথা দিলে কিন্তু গোপালদা, ভুলে যাবার চেষ্টা করলেও মনে করিয়ে দেব। এই বড়দিনেই বেড়াতে এসো।

পাঞ্জাবীর পকেট দুটো ঝেড়ে দেখিয়ে দিলুম যে ও দুটো শূন্য। শূন্যই থাকে। ও দুটো ভরাবার জন্য মাথাব্যথাও নেই।

ছেলেমানুষের মতো স্বাতি বলল: আমরা তোমার কোন অজুহাত শুনব না।

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

তাপ্তি সরে গিয়ে মন্দিরগাত্রের চিত্রগুলি ভাল করে লক্ষ্য করছিল। আমরাও এগিয়ে গেলুম। এখানেও সেই হাতির সারি, সিংহ আর ঘোড়সওয়ার, পৌরাণিক পশু পাখি, ফুল লতাপাতা। আরও আছে পুরাণের নানা কাহিনীর চিত্র, দেবদেবী। ছোটখাট চিত্র এঁকেই শিল্পীরা সন্তুষ্ট হয় নি, বড় বড় মূর্তিও গড়েছে। সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত শিল্পঋদ্ধ সুন্দর মূর্তি। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

কে একজন বলেছিলেন, মানুষের বন্য বিশ্বাস আর উষ্ণ অনুভূতি —দুইই এই দেওয়ালে ধরা আছে। কথাটা মিথ্যা নয়।

এই মন্দিরের চারটি দ্বার, কিন্তু চার দিকে চারটি নয়। উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করে, পূর্বে দুটি। দ্বারের পাশে নানা মূর্তি। কোথাও তাণ্ডবেশ্বর, মকরের উপর সস্ত্রীক বরুণদেব, কোথাও দ্বারপাল।

মামা বললেন: দেবতাদের মূর্তিগুলো কি চিনতে পেরেছ?

কিছু কিছু চিনেছি বৈকি। ময়ূরবাহন কার্তিক সিদ্ধিদাতা গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র সূর্য পার্বতী সরস্বতী। এ ছাড়া বামন বরাহ নরসিংহের মূর্তি, মূর্তি গরুড় গজাসুরের। এক ধারে রামায়ণ মহাভারত এবং শিব ও বিষ্ণু পুরাণের অনেক চিত্র আছে। রাম-রাবণ কর্ণার্জুনের যুদ্ধ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন কৃষ্ণচরিত্র সবই সুচিত্রিত আছে।

নগ্ন মূর্তিগুলির কথা আমি বলতে পারলুম না। ভৈরবের নগ্ন মূর্তি দেখেছি গোটা ছয়েক আর সর্পবেষ্টিত মোহিনীর নগ্ন নারীমূর্তি আছে অনেকগুলি। সাজসজ্জাও দর্শনীয়। নর্তকীদের অনেকে ব্রিচেস পরিহিতা। ঘোড়সওয়ারেরা পরেছে লম্বা বুট। কোট পরিহিত পৌরাণিক পুরুষও আছে, তাদের কোমরে কোমরবন্ধ।

এই মন্দিরের নন্দী মণ্ডপের পূর্বে সূর্যের মন্দির। বীরভদ্রেরও মন্দির আছে একটি। এরই উত্তরে গুড্ডালেশ্বর নামে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও দেখতে পাওয়া যায়।

কেদারেশ্বরের মন্দির নাকি সোমনাথপুরের কেশব মন্দিরের মতো। কিছু মিল আছে, কিন্তু গরমিলই বেশি। স্থাপত্যরীতি চালুক্যদের মতো। কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন বীর বল্লাল ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে। রুদ্রেশ্বর মন্দিরটি কে নির্মাণ করেছিলেন তা জানিনে।

একদা যে জৈনদের কয়েক শো বস্তি ছিল, তার প্রমাণ আজও আছে। কয়েক শোর কয়েকটি বস্তি আজও টিকে আছে। তার মধ্যে আছে পার্শ্বনাথ ও শান্তিনাথের বস্তি। পার্শ্বনাথের বস্তিতে এমন কয়েকটি স্তম্ভ আছে যা শৌখিন আয়নার কাজ করে।

এই জায়গার চারিধারে ধ্বংসস্তূপ। কোথাও প্রাসাদ-দুর্গের ভাঙা প্রাচীর, কোথাও ধূলিসাৎ মন্দিরের ঢিবি। কোথায় কী ছিল আজ তার হদিস পাওয়া যায় না, কিন্তু অনেক কিছু যে ছিল তার প্রমাণ আছে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে।

ফেরার আগে আমরা এক বিদেশী যুবকের সন্ধান পেলুম। তরুণ বয়স, ভারি মিষ্টি চেহারা। কিন্তু একটু রুক্ষ ও উদাস। মনে হল, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছে। ভারতের মানুষ যে নয়, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তাই এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলুম।

যুবকটি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু চমকে উঠে হাত জুড়ে নমস্কার করল। মুখেও বলল: নমস্কার।

ভারি ভাল লাগল এক বিদেশীর কাছে এই ভারতীয় প্রথার

সমাদর। অল্পক্ষণেই পরিচয় হয়ে গেল। সে ফরাসী, ভারতবর্ষ দেখতে এসেছে। এক টুকরো কাগজে দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর নাম লিখে এনেছে। বম্বে থেকে অজন্তা ইলোরা দেখে ওয়ার্ধায় গিয়েছিল মহাত্মাজীর আশ্রম দেখতে। তার লোভ ছিল মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কিছু জানবার। যারা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছে আর তাঁর আদর্শ আজও নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করছে, তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে আনন্দ পেয়েছে। সেখান থেকে সেকেন্দ্রাবাদ এসেছিল। তারপর ব্যাঙ্গালোর-হাসান। আজ মাইসোর যাবে।

এর নিরভিমান সরলতা আমার ভাল লাগল। ইচ্ছে হল, একে সঙ্গে নিয়ে ফিরি। তাপ্তি আমার পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে। মনে হল, আমার মতো তারও ইচ্ছে হচ্ছে এই যুবকটিকে সঙ্গী করবার। বিদেশীর মুখে আমাদের দেশের কথা জানতে ইচ্ছা করে—কী ভেবে এসেছিল আর কেমন লাগছে। কিন্তু তাকে নিমন্ত্রণ জানাবার সাহস আমাদের হল না। মামার অনুমতি না নিয়ে এ কাজ করা সঙ্গত হবে না।

আশ্চর্য হলুম স্বাতির কাণ্ড দেখে। তাপ্তিকে বলল: তুমি আমার পাশে বসতে পারবে না? একটু না হয় ঘেঁষাঘেঁষিই হবে।

মামা বললেন: তার কী দরকার?

স্বাতি বলল: ঐ ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন।

বলেই সে যুবকটিকে তার অনুরোধ জানাল।

এ বোধহয় তার কল্পনার অতীত ছিল। চট করে কোন উত্তর দিতে পারল না।

আমি বললুম: বেশ তো, চলুন না।

সে লজ্জা পেল। এই সামান্য পরিচয় নিয়ে এই পরিবারের সঙ্গী হওয়া বোধহয় ধৃষ্টতার কাজ হবে। সসঙ্কোচে জবাব দিল: আমি বাসে এসেছি, বাসেই ফিরব।

মামীর অসন্তোষের ভয়ে আমরা আর জোর করলুম না।

১৪

সময় আমরা কোথাও নষ্ট করি নি। যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই, তার বেশি সময় আমরা একটুও নিই নি। শ্রীরঙ্গপত্তন আমাদের দেখতে হবে। সারাক্ষণ আমাদের মনে ছিল যে একটু আলো থাকতে যদি না পৌঁছতে পারি তো অন্ধকারে কি কিছু দেখতে পাব!

ড্রাইভার আমাদের সদর রাস্তায় আনে নি। এনেছে একটা নির্জন পথে। পাহাড়ের ধারে ধারে লাল সুরকির পথ। দুধারে বুনো ফুল। দূরে দূরে দু একটা ঘর বাড়ি, চাষের ক্ষেত। এ পথে যে মোটর বাস চলে না তা বোঝা যাচ্ছিল। পথের কোনখানে চাকার দাগ নেই। থাকলেও তা আমাদের নজরে পড়ে নি।

পথে কোন যানবাহন না দেখে মামা বললেন: এ আবার কোন্ পথে এল?

মামার দুর্ভাবনার কারণ আমার মনে পড়ে গেল। এখানে যদি চাকা বেগড়ায় তো বিপদের অন্ত থাকবে না। পথের ধারে পাহাড়। বন ঘন না হলেও হিংস্র জানোয়ার হয়তো আছে। দুর্ভাবনার কথাই বটে। জিজ্ঞাসা করলুম: সদর রাস্তা কত দূরে?

ড্রাইভার সংক্ষেপে বলল: হাসানে গিয়ে মিলবে।

মনে মনে আমি হিসেব করে বললুম: সে তো মাইল পঁচিশ পথ।

এ পথে মাইল পাঁচেক সংক্ষেপ হবে।

কিন্তু ড্রাইভারের কণ্ঠস্বরে কোন উদ্বেগের আভাস নেই।

মামা বললেন: চাকাটা বদলেছে তো?

ড্রাইভার বলল: পুরনোটাও মেরামত করে নিয়েছি।

অর্থাৎ এখনও তার হাতে একটা অতিরিক্ত চাকা আছে। কিন্তু চাকার অবস্থা আমরা দেখতেই পেয়েছি। ও বেগড়াতে সময় লাগবে না। পথের উপর একখানা পাথর কিংবা একটা গর্তই যথেষ্ট হবে।

তাপ্তি আস্তে আস্তে বলল: আপনাদের দুর্ভাবনা দেখে আমার মজা লাগছে।

কেন বলুন তো?

দেশ থেকে এত দূরে এসেও ঘরের ভাবনা! নাইবা ফিরতে পারলাম! ঐ রকম একটা কুটিরে কি একটা রাত কাটাতে পারব না!

কেন পারব না! ভাবতেও ভাল লাগে। কিন্তু যাঁরা পিছনে বসেছেন, তাঁদের জাত আলাদা।

আমাকে কি আপনার দলে নিলেন?

আপনার কথায় তাই ধরে নিলুম।

এর পরে তাপ্তি অনেকক্ষণ কথা কইল না। কিন্তু আমার মনে হল, সে এই সব কথাই ভাবছে। এক সময় বললুম: আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ছে।

কেন বলুন তো?

হালেবিডের পথে আপনি কয়েকটা কথা বলেছিলেন। আপনার ব্যক্তিগত কথা। আর কিছু জানতে চাইলে হয়তো আমার অন্যায় হবে।

অনেকক্ষণ পরে তাপ্তি বলল: অন্যায় কেন হবে! কিন্তু সে বড় অপ্রিয় কথা। অযথা আপনার মন ভারাক্রান্ত হবে।

হোক না। আপনার মন তো খানিকটা হাল্কা হবে।

তা হয়তো হবে।

কিন্তু তবু তাপ্তি কিছু বলল না। সে হয়তো এই কথাই ভাবছে দুদিনের পরিচয়ে কি জীবনের আগল খোলা উচিত! পথের পরিচয়

তো পথেই শেষ হয়ে যাবে। তবে আর আনন্দের মুহূর্তকে নষ্ট করে কী লাভ! বেদনার্ত জীবন কি কখনো রঙীন হবে!

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: সেও তো লাভ। চোখের ধারায় শোক যায় ধুয়ে, আর মুখের কথায় মন হাল্কা হয়।

তাপ্তি বলল: আমার দুটো অপরাধ আমাকে ঘর-ছাড়া করেছে।

অপরাধ!

আমি চমকে উঠলুম। এমন সুন্দর মেয়ে কি কোন অপরাধ করতে পারে! কোন পাপ! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সে নিজে যদি স্বীকার করে তাহলে আর বিশ্বাস না করে উপায় কী! রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

তাপ্তি বলল: চমকে উঠলেন তো! উঠবেনই। সেইজন্যেই আমি বলতে চাই নি।

না না, আমি চমকাই নি, আপনি বলুন।

তাপ্তি বলল: প্রথমটি আমার বাবার পয়সা, আর দ্বিতীয়টি—

তাপ্তি থেমে গেল। কিন্তু সেই অসমাপ্ত কথাটি বুঝতে আমার একটুও দেরি হল না। বললুম: দ্বিতীয়টি আমি জানি।

জানেন!

ও যে দেখতেই পাচ্ছি। আপনার রূপ সবাই দেখে।

তাপ্তির ফর্সা গালে রক্তের ছোঁয়া লাগল। অপরিসীম লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল।

বললুম: এ দুটো অপরাধের তো প্রায়শ্চিত্ত আছে। আপনি বিয়ে করুন না।

করেছিলাম।

করেছিলেন!

হ্যাঁ।

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে বললুম: তারপর?

তাপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল: সব শেষ হয়ে গেছে।

এত শীঘ্র! এমন অকস্মাৎ!

তাপ্তি এ কথার উত্তর দিল না।

পাহাড়ের ধারে ধারে অসমতল উঁচু নিচু পথে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। মনে হল, তাপ্তির জীবন আর ছুটছে না, সে থেমে গেছে। কিন্তু থেমে থাকতেও পারছে না। খোঁড়া পা দুটো নিয়ে সে ছুটবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। আমি তার সংযত আচরণেও যেন অস্থিরতার সংবাদ পেয়েছি।

স্টেশনের সেই বিশ্রী লোকটার কথা মনে পড়ল। এখন যেন তাকে খানিকটা চিনতে পারছি। কী নীচ, কী ইতর তার প্রবৃত্তি! কী কুৎসিত অভিসন্ধি! একটা অসহায় মেয়েকে সে কি খেলার পুতুল ভাবছে! লোকটার সম্বন্ধে কী একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেলুম। তাপ্তিকে বোধহয় আরও যন্ত্রণা দেওয়া হবে। তার চেয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখি। বললুম: আপনার কথাই ঠিক। বাড়ি থেকে এত দূরে এসেও আমাদের বাড়ির ভাবনা যায় নি।

তাপ্তি হাসল। বড় বিষণ্ণ হাসি। মনে হল যে তার কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু ড্রাইভার আমাকে রক্ষা করল। বলল: এদিকে না এসে উত্তর-পশ্চিমে গেলে আমরা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতাম।

কী রকম?

বাবা বুধন গিরিমালা। বেশি দূর নয়, সুন্দর রাস্তায় বেলুর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে চিকমাগলুর। তারপরেই মাটি যেন হঠাৎ উঁচু হয়ে গেছে। দু এক হাজার নয়, একেবারে ছ হাজার ফুট।

পাহাড়ের এমন অদ্ভুত নাম কেন হল ড্রাইভার তাও বলল। মক্কা থেকে এক মুসলমান পীর এসেছিলেন তিনশো বছর আগে, তাঁরই নাম বাবা বুধন। এদেশে আসবার সময় কয়েকটা কফির বীজ এনেছিলেন সঙ্গে করে। ঐ পাহাড়ে তাই পুঁতে দিয়েছিলেন। এখন এখানকার কফির চাষ দেশ-বিখ্যাত হয়েছে।

মামা বললেন : এ সব কথা আগে বললে আমরা দেখে আসতে পারতুম।

ড্রাইভার ইচ্ছা করেই হয়তো বলে নি। অন্ধকার হবার আগেই তাকে শ্রীরঙ্গপত্তন পৌঁছতে হবে। এই অন্ধকার পথেও সে জোরে জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। তার চাকার কথা যেন সে ভুলেই গেছে। কিন্তু আমরা ভুলি নি।

ড্রাইভারের কাছে আমরা আরও নতুন নাম শুনলুম। পশ্চিম ঘাট পাহাড়ের এই অঞ্চলকে বলে মালনাড। আর বাবা বুধন পাহাড়ে কেম্মান্ন গুণ্ডি হল পুরনো মহিসুর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস। তার সরকারী নাম কৃষ্ণরাজেন্দ্র হিল স্টেশন। সমুদ্রতল থেকে ৪৭৫০ ফিট উঁচু। বলল : চিকমাগলুর থেকে চল্লিশ মাইল পথ ঘন কফি বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে পথে পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠেছে।

দৃশ্য যে অপূর্ব হবে তাতে আমার সন্দেহ রইল না। কিন্তু ড্রাইভার বলল : বড় নিরিবিলি জায়গা। নতুন নতুন বাংলোগুলো এখানে-সেখানে লুকিয়ে আছে। লোক নেই, ভিড় নেই, কোলাহল নেই। অনেকেরই ভাল লাগে না। আগে মহারাজা একা যেতেন। এখন অনেকেই যায়। কিন্তু এমন নির্জন জায়গায় কেন যায়, তা সবাই বোঝে না।

পাহাড়ের পশ্চিমে নাকি বন আরও গভীর। এ রাজ্যের সেগুন আর চন্দন আসে সেই বন থেকে। লোহাও এদিকে আছে। লোহার মাটি। তিন মাইল লম্বা রোপওয়ে দিয়ে নিচে নামায়।

যায় কোথায়?

ভদ্রাবতী।

ভদ্রাবতীতে কি লোহার কারখানা? শুনি নি তো।

ভদ্রাবতী এ রাজ্যের পুরনো কারখানার শহর। শুধু লোহা আর ইস্পাত নয়, সিমেন্ট ও কাগজও এখানে তৈরি হয়। যদি শৃঙ্গেরী

যান তো ভদ্রাবতী অবশ্য দেখবেন। তুঙ্গ নদীর তীরে শঙ্করাচার্যের আশ্রম শৃঙ্গেরী, আর ভদ্রা নদীর তীরে ভদ্রাবতী। এধারে বাবা বুধন। রেলে চেপে যদি জোগ ফল্‌স্ দেখতে যান, তাহলে তো ভদ্রাবতী পথেই পড়বে।

ড্রাইভার আমাদের জানিয়ে দিল যে মহিসুর রাজ্যে সর্বত্র মোটর চলে। মোটরে চেপে জোগ ফল্‌স্‌ও দেখে আসতে পারি। ভদ্রাবতী থেকে চিতলদুর্গ মাত্র পঁয়ষট্টি মাইল।

সে আবার কেমন জায়গা?

এ দিকের মতো একেবারেই নয়। রুক্ষ দেশে একটা প্রাচীন দুর্গ। হায়দার আলি তৈরি করেন আর টিপু সুলতান করেন শক্তিশালী।

সত্তর মাইল উত্তরে সিদ্ধপুরে তিনটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। অশোকের শিলালিপি। এই সিদ্ধপুর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের দক্ষিণের সীমানা ছিল।

চিতলদুর্গের এক মাইল পশ্চিমে চন্দ্রাবলীর শ্যামল উপত্যকা। এই উপত্যকায় প্রচুর রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। রোম-সম্রাট অগাস্টাস ও টাইবেরিয়াসের মুদ্রা। ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য-সম্বন্ধ গভীর ছিল, এ তারই প্রমাণ।

ড্রাইভার বলল: চিতলদুর্গ থেকে হরিহর যাওয়া যায় এ রাজ্যের সীমানায়। একটি প্রাচীন মন্দিরের নামে এই শহরের নাম। এখানকার ব্যবসা বেশ জমজমাট। এইখান থেকে জেরুসোপ্পা বাষট্টি মাইল পথ, শিমোগা হয়ে যেতে হয়। সাগর বলে একটা শহর আছে, সেখান থেকে লোকে জলপ্রপাত দেখতে যায়। আর কিনে আনে চন্দন ও হাতির দাঁতের জিনিস। জোগ ফল্‌স্ দেখেছেন?

কোথায় আর দেখলুম!

ওঃ, সে এক অদ্ভুত জিনিস! যেমন পথ, তেমনি পথের শেষ রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। কয়েক মাইল পথ তো শিমূলের ফুলে

লাল হয়ে থাকে। আপনারা গিয়ে মাইসোর বাংলোয় উঠবেন। তার আগে সরবতী নদী পাবেন। হেলে দুলে এমন ধীরে সুস্থে বয়ে চলেছে যে তার আটশো তিরিশ ফুটের ঝাঁপ আপনারা বিশ্বাস করতেই পারবেন না। বাংলো থেকে ফল্‌স্‌টা দেখে অন্য নদী ভাববেন।

এই জলপ্রপাতের চারটি ধারা। ড্রাইভার আমাদের ধারাগুলোর নাম শুনিয়ে দিল—রাজা রাণী রকেট ও রোরার। রাজার রূপই সব চেয়ে সুন্দর। একটা গভীর প্রশস্ত ধারা আটশো পঞ্চাশ ফুট নিচে পড়ে শব্দে ও ফেনায় আবহাওয়াটা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আর এক ধারে রাণী নেমেছে নারীসুলভ লাবণ্য নিয়ে। মাঝখানে রকেট ও রোরার। চালে এদের আভিজাত্য নেই। রোরার রাজার সঙ্গে মিলেছে, আর রকেটের ধারাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে নেমেছে। প্রপাতের নিচে শুধু নৃত্যেরই ছন্দ নয়, আকাশের রামধনুও দেখতে পাওয়া যাবে।

ড্রাইভার বলল: মাইসোর বাংলোয় বুড়ো সাহেব কয়েকদিন রয়ে গেল। পূর্ণিমার রাতে প্রপাত দেখবে।

কোন্‌ সাহেব?

সাহেবের কথা বুঝি বলি নি! ঐ সাহেবই তো আমায় এ দিকে টেনে এনেছিল। একেবারে পাগল। বলল, তোমার গাড়ি চাই না, তোমার কাজও না। তুমি আমার পাশে শুধু বসে থাকবে। সাহেব নিজের গাড়ি এনেছিল, নিজেই চালাল। এ রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। আমি বসে বসে সব দেখলাম।

সত্যি?

সব সত্যি কথা। প্রথমটায় ভেবেছিলাম, বোধহয় রাস্তা দেখাতে হবে। তারও দরকার হল না। গাড়িতে সাহেব ম্যাপ খুলে বসেছিল, তাই দেখেই চালিয়ে গেল। ব্যাঙ্গালোর থেকে জেরুসোপ্পা মাত্র একশো পঁচাত্তর মাইল পথ। যাবেন আপনারা?

বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম: ভেবে দেখি।

১৫

হালেবিড থেকে শ্রীরঙ্গপত্তন প্রায় চুরাশি মাইলের পথ। এই দীর্ঘ পথ মুখ বুজে কে চলতে পারে জানি নে। পিছনের সিটে মামা তামাক ধরিয়েছেন, মামী চোখ বন্ধ কবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর স্বাতি পথের শোভা দেখছে নিবিষ্ট মনে। তার কান আমাদের দিকে পেতে রেখেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পিছন ফিরে কথা কইতে কিছু কষ্ট হয়। দেহের কষ্ট, কণ্ঠেরও বটে। জোরে কথা না বললে চলে না। অথচ পাশের এই মেয়েটার সঙ্গে বড় স্বচ্ছন্দে কথা বলা চলে। অভাব শুধু বিষয়বস্তুর। কী বলা যায়, তাই ভেবে পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত তাপ্তিই কথা কইল, বলল : বাঙলা দেশে মেয়েদের স্বাধীনতা কী রকম?

বললুম : স্বাতিকে তো দেখতে পাচ্ছেন।

দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে কিছুই পারছি না।

খুব পরাধীন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা পেটের দায়ে রোজগারে নেমেছে স্বাধীন হবার ইচ্ছায় নয়, নিতান্তই জীবনধারণের চেষ্টায়। ভাল পাত্র পেলে চাকরি ছেড়ে দিতে তারা ইতস্তত করবে না।

তাপ্তি আর প্রশ্ন করল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম : আমি সাধারণ নিয়মের কথা বললুম। স্বাধীন জীবন যাপনের লোভেই চাকরি-বাকরি করছে, এমন মেয়েরও অভাব হবে না।

সত্যি!

তাপ্তির দৃষ্টিতে এক রকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখতে পেলুম।

বলল : আপনার পরিচিত কেউ আছেন?

আমার পরিচিত!

সহসা কোন নাম আমি মনে করতে পারলুম না। কটা মেয়েকে আমি চিনি যে চিন্তা করলেই কারও নাম মনে আসবে! বললুম: আমার পরিচিত কেউ নেই।

তাপ্তির প্রশ্ন যেন ফুরোয় নি। তাই বললুম: আমার নিজের কোন সমাজ নেই বলেই কোন পরিচিত মেয়ের নাম মনে পড়ছে না। আমি একেবারে একা।

আমার সম্বন্ধে তাপ্তি বোধহয় এই রকমই কিছু ভেবেছিল। বলল: আপনাকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

এত মানুষের সঙ্গেও!

আপনার ব্যবহারে একটা ব্যবধানের ইঙ্গিত আমি দেখতে পাই। মিশে গিয়েও যেন মিল হচ্ছে না।

আমি তার মন্তব্য শুনে বিস্মিত হলুম। আমি কি নিজেই এই ব্যবধান সৃষ্টি করি নি! কিন্তু কেন করেছি! এ আমার চারিত্রিক দুর্বলতা নয় তো! কিন্তু দুর্বলতা কেন থাকবে! মানুষ যখন কিছু চায় তখন সে দুর্বল। আমার কেন এই দুর্বলতা আসবে! আমি কি কারও কাছে কিছু চাই!

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পর আমি প্রশ্ন করলুম: আমার পরিচিত কোন স্বাধীন মেয়ে থাকলে আপনি কী করতেন?

তাপ্তি এবারে ভাবনায় পড়ল, বলল: তাই তো!

আমি বলব?

আপনি বলতে পারবেন?

কেন পারব না! আপনিও যে তারই মতো স্বাধীন জীবনের পথ খুঁজছেন। হয়তো একটু উপদেশ কিংবা সাহায্যের দরকার বোধ করছেন।

চিন্তিত ভাবে তাপ্তি বলল: বোধহয় তাই।

বললুম: বোধহয় নয়, সত্যিই তাই। কিন্তু তার তো কোন

প্রয়োজন নেই। আপনার ক্ষমতা আছে, আপনার বাসনা আছে। সাহস করে আপনি নিজেই কেন এগিয়ে যাবেন না?

বাধার কথা আপনি কেন ভাবছেন না?

ডিঙোবার উৎসাহ যোগায় বলেই সে বাধা। বাধা না থাকলে মানুষ অলস হত, মানুষ ঝিমিয়ে যেত।

তাপ্তি হেসে বলল: আপনিও দেখছি বাধা।

কেন?

আপনিও তো বেশ উৎসাহ দিচ্ছেন। আপনার সংজ্ঞা অনুসারে আপনিও তাহলে বাধা।

তার কথায় আমি হেসে উঠেছিলুম। একেবারে অনাবিল হাসি। তারপরেই এলুম বুদ্ধির জগতে ফিরে। গাড়িতে মামী মামা আছেন। স্বাতি আছে। তাঁরা কী ভাবলেন!

কী ভাববেন তাঁরা! কেন ভাববেন! আমি তো শুধু হেসেছি। কিন্তু লক্ষ্য করি নি যে হাসি আমার অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাপ্তি তা লক্ষ্য করে বলল: হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লেন যে!

এর উত্তর আমাকে দিতে হল না। পিছন থেকে মামা বললেন: রহস্যটা একা একাই উপভোগ করবে গোপাল?

আমি পিছন ফিরে বাঙলায় বললুম: তাপ্তি রসিকতা জানে।

মামা বললেন: তাইতেই তো বলছি একটু জোরে বল। অমন ফিসফিস করে কথা কইবার দরকার কী!

আমার বিপদ বাড়ল। মামাকে এবারে কী বলি! প্রাণের দায়ে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলুম: হাসান আর কত দূর?

ড্রাইভার বলল: কফির জন্য দাঁড়াতে হবে কি?

আমি মামার আদেশের জন্য পিছন ফিরে তাকালুম। মামা বললেন: এ দেশের কফিটা মন্দ নয়, কী বল গোপাল?

বোধ হয় আমার হাসির শব্দেই মামীর তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল। বললেন: কোন্‌টা খারাপ?

মামা বললেন : তাও বটে।

ড্রাইভারকে আমি জানিয়ে দিলুম যে কফির নেশা আমাদেরও আছে।

আমরা যখন শ্রীরঙ্গপত্তনে পৌঁছলুম, তখন সূর্যাস্ত হতে আর বেশি বিলম্ব নেই। সরল পাকা রাস্তায় আমরা আসি নি, তাতে বোধহয় সময় বেশি লাগত, না লাগলেও পেট্রল যে বেশি পুড়ত তাতে সন্দেহ নেই। ড্রাইভার আমাদের অপেক্ষাকৃত অসমতল পথেই বেগে নিয়ে এল। তাতে পথের সংক্ষেপ হল, পেট্রলও বাঁচল। কিন্তু চাকার আয়ু যে নিশ্চিত ভাবে কমল, সে কথা ড্রাইভার ভাবল না। গাড়িটা কি তার নিজের নয়? চাকার ভার যদি মালিককে বইতে হয়, তাহলে তার বুদ্ধিকে প্রশংসাই করব। মামা বলছিলেন যে এই রকম বিষয়বুদ্ধিই বর্তমান ভারত সরকারের নীতি। টাকা যখন গৌরী সেন দেবে, তখন যা পাও লুটেপুটে খাও। কয়েক ফোঁটা পেট্রল, তাই সই! হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

শ্রীরঙ্গপত্তনের একটা ইতিহাস আছে। ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজ চোলারাজার ভয়ে শ্রীরঙ্গম থেকে পালিয়ে এসেছিলেন মহিসুরে। হয়শালরাজ বিষ্ণুবর্ধন তাঁর শিষ্য হবার পরে গুরুকে যে অষ্টগ্রাম দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই ছিল শ্রীরঙ্গপত্তন। এখানে আছে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, শ্রীরঙ্গমের মতো বিষ্ণুর অনন্তশয়ন মূর্তি। এই দেবতার নামেই জায়গার নাম শ্রীরঙ্গপত্তন বা শ্রীরঙ্গপাটনা। এক সময়ে বিজয়নগরের অধীনে ছিল, তাদের শেষ শাসন-কর্তা তিরুমালা রাজা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ওয়াদিয়ার ক্ষমতা দখল করেন। সেই সময় থেকেই শ্রীরঙ্গপাটনা ছিল মহিসুরের রাজাদের রাজধানী। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতানের মৃত্যুর পরেই এর গৌরবের দিন শেষ হয়ে যায়।

মহিসুরের ইতিহাস যেন দুটো মানুষের বীরত্বের কাহিনী।

হায়দর আলি আর টিপু সুলতান। তার আগে ও পরে আর যেন কিছু ছিল না। থাকতে পারে না। পানিপথে মারাঠাদের তৃতীয় যুদ্ধ হয়ে গেছে। ক্ষয়িষ্ণু শক্তি মারাঠা। হায়দর তখন একজন সামান্য সৈনিক। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও অসমসাহসী বীর। বীরত্বে ও কৌশলে তিনি হিন্দুরাজ্য মহিস্থরের অধিকার গ্রহণ করলেন। এ ঘটনা দুশো বছরেরও পুরনো। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলির নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হল। তিনি নিজাম ও মারাঠাদের রাজ্য থেকে কিছু কিছু কেড়ে নিয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুললেন। মাদ্রাজে বসে ইংরেজরা এই সব দেখছিল, কিন্তু ভাল চোখে দেখছিল না। এক সময়ে অকারণে বিবাদ বাধিয়ে যারপর-নাই অপদস্থ হল। যুদ্ধে ইংরেজ সেনাকে বিধ্বস্ত করে হায়দর আলি যখন মাদ্রাজ গ্রাস করতে যাচ্ছেন, তখন তারা সন্ধি করতে বাধ্য হল। রাজী হল যে নিজাম বা মারাঠা যদি মহিস্থর আক্রমণ করে, ইংরেজ হায়দরকে সাহায্য করবে। ইংরেজের এত বড় পরাজয় এর আগে কখনও হয় নি।

কিন্তু ইংরেজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মাত্র এক বছর পরে তাদের সন্ধির শর্ত পালন করে নি। মারাঠারা মহিস্থর আক্রমণ করেছিল। ইংরেজ মজা দেখেছে, উপভোগ করেছে তাদের পরাজয়। হায়দর এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জীবনে কোন দিন ভোলেন নি। এই জাতের প্রতি তাঁর মর্মান্তিক ঘৃণার কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে গেছে।

হায়দর আলি জানতেন যে ইংরেজ পরাক্রান্ত শত্রু। তার সঙ্গে বিবাদ রাখতে গেলে প্রতিবেশী শক্তিদের সঙ্গে মৈত্রী চাই। রেখেছিলেনও। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও নাগপুরের ভোঁসলার সঙ্গে স্থির করেছিলেন যে বিদেশে ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধের সুযোগ দেশে তাঁরা গ্রহণ করবেন। তাঁরা তিন শক্তি একযোগে মাদ্রাজ ও বাঙলা থেকে ইংরেজের উচ্ছেদ করবেন। কিন্তু হেস্টিংস আরও বেশী কুশলী

ছিলেন। নিজাম ও ভোঁসলাকে ঘুষ দিয়ে কিনে নিলেন—নিজামকে জমি দিয়ে আর ভোঁসলাকে অর্থ দিয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন, যুদ্ধ করলেন একা হায়দর আলি।

মালাবার উপকূলে মাহেতে ছিল ফরাসী অধিকার। ইয়োরোপে যখন ইংরেজ আর ফরাসীতে যুদ্ধ, তখন ভারতে ইংরেজ মাহে দাবী করল। হায়দর বললেন, ও আমার রাজ্য, আমার আশ্রিত ওরা। ইংরেজ মানল না। জোর করে মাহে দখল করল। কাজেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। নিজাম প্রস্তাব করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন বৃদ্ধ হায়দর। তাঁর বয়স তখন আশি। ইংরেজ অধিকৃত কর্ণাট ধ্বংস হল, মাদ্রাজ যায় যায়। সেনাপতি বেইলি আসছিল উত্তর থেকে। হায়দর তার সেনাদল বিধ্বস্ত করলেন। তাঁর পুত্র যুবক টিপু ব্রেথওয়েটের সেনাদলও ধ্বংস করলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। হায়দর মারা গেলেন দুবছর পর। বাঙলা দেশ থেকে কুট এসে কিছু সুবিধার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু টিপু দুর্ধর্ষ। ইংরেজকে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতেই হল। চার বছরের যুদ্ধ এক দিন শেষ হয়ে গেল।

সুলতান হয়ে টিপু কী করেছিলেন? ইংরেজকে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন, তারা যা জয় করেছিল তা ফেরত দিল। কিন্তু টিপুকেও তো সব ফেরত দিতে হল। পাঁচ বছর পর ইংরেজকে আবার তিনি শায়েস্তা করতে গিয়েছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস নাকি তাঁকে পাগল ও বর্বর বলে আড়ালে গাল দিয়েছিলেন। টিপু তাই ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলেন। মিত্রকে রক্ষা করবার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসও এগিয়ে এলেন। যুদ্ধে টিপুর হার হল। শ্রীরঙ্গপত্তনে অবরুদ্ধ হয়ে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। তাতে অর্ধেক রাজত্ব গেল, ক্ষতিপূরণ দিতে হল তিন কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা, আর জামিন নিজের দুই পুত্র। তাদের কলকাতায় এনে রাখা হল।

তারপর? ঠিক দশ বৎসর পরে শ্রীরঙ্গপত্তন ধ্বংস হয়ে গেল।

লর্ড ওয়েলেসলি বলেছিলেন, অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করতে হবে। টিপু বললেন, ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারব না। ফরাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করছিলেন, রাজ্যটা তখনই গেল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে ' সম্মুখ সমরে টিপু প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ইংরেজ নিজামের সঙ্গে মহিসুর ভাগ করলেন। পুরনো হিন্দু রাজার উত্তরাধিকারীর ভাগে পড়ল রাজ্যের মধ্য অংশ।

কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ হায়দর আলি আর টিপু সুলতানকে আজও ভুলতে পারে নি। কেন পারে নি ইতিহাসে তার হদিস নেই।

প্রশ্নটা মামাই করেছিলেন : সুলতান হয়ে টিপু কী করেছিলেন ?

ভেবে দেখবার মতো প্রশ্ন। সহসা উত্তর বুঝি যোগায় না। ইংরেজ বণিকের ভারত অধিকারের প্রথম যুগে এমন কত রাজা তাদের রাজ্য হারিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু তাদের সবাইকে তো আমরা স্মরণ করি না। তাদের আমরা ভুলেই গিয়েছি। কিন্তু টিপুকে ভুলতে পারি নি। কেউ পারে নি। টিপু আর তাঁর শ্রীরঙ্গপত্তন আমাদের মনে সোনা হয়ে আছে। কেন আছে ?

স্বাতি বলল : জামা মসজিদ আর—

তাড়াতাড়ি মামী বললেন : না না, মসজিদ নয়, আর কিছু যদি থাকে তো তাই দেখ।

মসজিদকে যে মামী ভয় পান তা তাঁর ব্যস্ততা দেখেই বোঝা গেল। এ ভয় সংস্কারগত। ধর্মস্থান যে পবিত্র, এ কথা সবাই মানবেন। কিন্তু সব মানুষ যে পবিত্র, এ কথা স্বীকার সবাই করেন না। শুধু খ্রীষ্টান বা মুসলমান কেন, হিন্দুদের মধ্যেও অনেক জাত আছে, যাদের অপবিত্র ভাবা হয়। মনের এ সংকীর্ণতা কুসংস্কার। কিন্তু দীর্ঘ দিনের বিশ্বাসে এমন শক্ত দানা বেঁধেছে যে সহজে পরিত্রাণ নেই। মামাকে দোষ দিলে অন্যায় হবে।

আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল দরিয়া দৌলত বাগের সামনে। সুন্দর একটি ছায়াচ্ছন্ন বাগানবাড়ি। পিছন দিয়ে কাবেরী বইছে

কলকল করে, সামনে ফুলের বাগান। শোনা যায় যে টিপু সামনে দাঁড়িয়ে এই বাগান করিয়েছেন। কাঠের দোতলা বাড়ি, কিন্তু কাঠ কোথাও দেখা যায় না। নিচে থেকে উপর পর্যন্ত অজস্র রঙে চিত্রিত। সোনার জলের এমন দিলদরিয়া ব্যবহার শুধু দরিয়া দৌলতেই সম্ভব। দরিয়া দৌলত মানে দৌলতের নদী। টিপু বোধ হয় কাবেরীর এই নাম রেখেছিলেন, লোকে এখন এই বাড়িকেই বলে দরিয়া দৌলত। প্রখর গ্রীষ্মে টিপু উটি না গিয়ে এইখানে বাস করতেন। সুলতান হয়েই টিপু এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

এখানে গাইডের অভাব নেই। যারা রক্ষী তারাই গাইড। সামনের বড় বড় চিত্রগুলি কোন্ যুদ্ধের, হায়দর না টিপু সেই সেনাদল পরিচালনা করছেন, এ সব কথা গাইডরাই বলে দেবে। যা বলে না দিলেও বোঝা যায় তা হল প্রবেশ-দ্বারের দুপাশের ছবি। ডান দিকে সেনাদলের পুরোভাগে হায়দর আলি ও টিপু এবং বাঁ দিকে ইংরেজের সঙ্গে তাঁদের প্রথম যুদ্ধ, যে যুদ্ধে তাঁদের জয় হয়েছিল। দেওয়ালের অন্যান্য চিত্রগুলি তাঁদের জীবনযাত্রার। এ চিত্রগুলি পার্সিয়ান মিনিয়েচার পেন্টিঙের মতো, কিন্তু বড় আকারের বলে দেখার ও বোঝার খুব সুবিধে। ছোট একটি জাদুঘরে এখন টিপুর অনেক জিনিসপত্র রক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সে সব দেখবার মতো সময় আমাদের হাতে ছিল না। বড় বড় গাছের আড়ালে সূর্য আর দেখা যাচ্ছিল না, অথচ এখানকার কিছুই আমাদের দেখা হয় নি। তাড়াতাড়ি তাই আমরা গাড়িতে ফিরে এলুম।

এখান থেকে অনতিদূরে শ্রীরঙ্গপত্তনের বিধ্বস্ত দুর্গ। এই রাজধানী শহরটি ছিল একটি স্বাভাবিক দুর্গের মতো। যেমন শ্রীরঙ্গমে তেমনি এখানেও কাবেরী নদী সহসা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে আবার যুক্ত হয়েছে। শহর যেন একটি নদী-বেষ্টিত দ্বীপ। দুধারে দুটি সেতু দিয়ে দেশের সঙ্গে যুক্ত। টিপুর তৈরি এই সেতুর উপর দিয়ে আজও আমরা যাতায়াত করি।

এই দ্বীপেই ছিল তাঁর দুর্গ, তাঁর সাধের গ্রীষ্মাবাস দরিয়া দৌলত বাগ, জামা মসজিদ আর দুটি হিন্দু মন্দির—শ্রীরঙ্গনাথের ও গঙ্গাধরেশ্বরের। দুর্গের কাছে পৌঁছে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। পুরনো কুচকাওয়াজের মাঠ ছাড়া সম্পূর্ণ আর কিছু চোখে পড়ল না। সগৌরবে যা দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম তা শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির।

এইখানেই তাঁর একটি জেলখানা ছিল। মাটির নিচে অনেকগুলি অন্ধকার কক্ষ। ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়। টিপু তাঁর ইংরেজ বন্দীদের রাখতেন এইখানে। তিনি তাঁর দুর্গ দুর্ভেদ্য ভাবতেন। দুটি সেতুর উপর তাঁর দুর্গদ্বার এমন সুরক্ষিত ছিল যে ইংরেজ এই দ্বার অতিক্রম করতে পারেনি, কাবেরী উত্তীর্ণ হতেও পারেনি। তবু শ্রীরঙ্গপত্তনের পতন হয়েছে। গৃহশত্রু নাকি এক তৃতীয় পথে ইংরেজকে ভিতরে এনেছিল। বাঙলা নাটকে এই পথের নাম লালবাগের পথ। লালবাগে এখন টিপুর সমাধি গুম্বজ। অন্ধকারে টিপুর জেলখানা দেখা সম্ভব হবে না জানি। মামা কিছুতেই সেখানে নামবেন না। তাই মামীকে খুশী করবার জন্য ড্রাইভারকে আমি বললুম: মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: মন্দির!

হ্যাঁ মামীমা, এখানে যে রঙ্গনাথের বিখ্যাত মন্দির আছে।

তা সকালে বল নি কেন?

মনে মনে আমি প্রমাদ গুনলুম। মামী খেয়েদেয়ে পূজো করতে পারবেন না। সেই ক্ষোভ তাঁর অনেক দিন থাকবে। সকালে বললে তিনি পূজো দিয়ে জলস্পর্শ করতেন। স্বাতি পুলকিত হয়ে উঠল, আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল: জানলে তো বলত। বাগানবাড়ির গাইডদের কাছে খবর পেয়ে এখন বাহাদুরী দেখাচ্ছে।

স্বাতির মন্তব্য শুনে মামা হেসে উঠলেন। আমিও যেন বেঁচে গেলুম। মিথ্যে কথাটা আমি বলতে পারতুম না।

এটি বেশ প্রাচীন মন্দির। কিন্তু কত প্রাচীন তা নিয়ে মতের

বিরোধ আছে। ধর্মে যাঁদের অন্ধ বিশ্বাস তাঁরা বলেন যে এ মন্দির মহর্ষি গৌতমের আমলের। পুরাণের অনেক কথাই তো আমরা বিশ্বাস করি, এ কথা বিশ্বাস করতে বাধা কিসের! যাঁরা এ কথা মানেন না তাঁরা শিলালিপির কথা মানতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের কথা তো শিলালিপিতেই লেখা আছে। তার মানে, এই মন্দিরের বয়স হয়েছে আটশো বছর। রামানুজ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা জানি না।

এ মন্দিরে আমরা একটা নতুন জিনিস দেখতে পেলুম। ব্রাহ্মণের বদলে ব্রাহ্মণ বালকেরা আমাদের ছেঁকে ধরল। একজনের হাত ছাড়ালেই আর একজন। মন্দিরের পুরাবৃত্ত বলছে গড় গড় করে। ছোট ছোট ছেলেরাও ইংরেজীতে বলছে। শুনতে না চাইলে বলবে, বড় গরিব, পড়বার খরচ জোটে না, একটু বলতে দাও। পয়সা দাও কেউ বলছে না, বলছে শ্রম নিয়ে মজুরি দাও। পাঁচ ছ বছর থেকে দশ বারো বছর বয়সের এক ঙ্গল বালক।

রঙ্গনাথ স্বামীর বিরাট অনন্ত-শয়ন মূর্তি। ঠিক শ্রীরঙ্গমের মতো। সায়াহ্নের স্তিমিত আলোকে আমরা দেবতার দর্শন পেলুম।

এ বেলায় যাত্রী নেই। যাত্রী এখানে কোথায়! শ্রীরঙ্গপত্তন যে এখন একটি গণ্ড গ্রাম। মাইসোর এখান থেকে দশ মাইল দূরে। মাইসোরের লোক এখানে আসে উৎসবের দিনে, আসে বিশেষ তীর্থ পার্বণে, মানসিক ব্রত উদ্‌যাপনে। শ্রীরঙ্গপত্তনে আমরা রঙ্গনাথ দর্শনে আসি নি। টিপু সুলতানের রাজধানী দেখতে এসে দেবতার খবর পেয়েছি। দরিয়া-দৌলত দেখে ভাঙ্গা দুর্গ দেখবার সময় রঙ্গনাথও দর্শন করে যাচ্ছি।

মামা কী দিলেন জানি না, বালকেরা উল্লসিত হয়ে উঠল। আমার দিকে ফিরে বললেন: লক্ষণটা ভাল।

কিসের লক্ষণ?

দেখলে না, ভিক্ষে এরা চাইলে না।

স্বাতি বলল : তুমি তো ভিক্ষেই দিলে। কারও কাছে কিছু শুনলে তবে মজুরি হত।

এ কথার উত্তর মামা ভেবে পেলেন না, বললেন : ঐ হল।

কিন্তু নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন গাড়িতে উঠবার সময়। আরও এক দল ছেলেমেয়ে এসে তাঁকে ছেঁকে ধরল। তারা সবাই তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু চাই। মামার পরাজয়ের দৃশ্যটি বড় করুণ। তাঁর দৃষ্টিতে আমি আহত হবার আভাস দেখতে পেলুম। ড্রাইভারকে আমি বললুম : চল।

এবারে আমরা চলে এলুম দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে লালবাগের সামনে এই বাগানের মধ্যেই টিপুর সমাধি, তারই নাম গুম্বজ। প্রাসাদ বা মসজিদের মাথায় গোলাকৃতি শিখরকেই আমরা গম্বুজ বলি। এখানে একটি শ্বেত মর্মরে নির্মিত সমাধির নাম গুম্বজ, অবশ্য এর মাথার উপরেও গম্বুজ আছে। টিপু তাঁর পিতা মাতার জন্য এই সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। ইংরেজ টিপুকেও এখানে সমাধিস্থ করে। পাশাপাশি তিনটি কবর, ধূপে ধুনোয় তার গম্ভীর আবহাওয়ায়। ভক্তরা ফুল মালা দিয়ে আজও শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাচ্ছে। সমাধির সংলগ্ন প্রার্থনা-মন্দিরেও দু একজনকে দেখতে পাওয়া গেল।

মামী গাড়িতেই বসে রইলেন বলে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।

শ্রীরঙ্গপত্তনে আর একটি রমণীয় স্থান আছে, তার নাম কাবেরী সঙ্গম। ছোট একটি নদী যেখানে কাবেরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেটি নাকি চমৎকার একটি পিকনিকের জায়গা। এখন অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাবে না।

ফেরার পথে তাপ্তি বলল : টিপু সুলতান শুনেছি যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছেন।

বললুম : ইতিহাসে আমিও তাই পড়েছি। দুর্গের ওয়াটার গেটে তলোয়ার হাতে তিনি যুদ্ধ করছিলেন।

তাপ্তি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : টিপুকে আপনারা খুব ভালবাসেন, তাই না ?

বাসি, কিন্তু কেন বাসি তা জানি না।

ক্ষুদিরাম বসুকে কেন ভালবাসেন ? সে তো শুনেছি জীবনে একটি কাজ করেছিল, একটি গুলি ছুঁড়েছিল একজন ইংরেজকে লক্ষ্য করে।

আমি বললুম : সে তো দেশের জন্যে আত্মদান !

তার পরেই মনে হল, টিপুরও কি আত্মদান নয় ! লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করে টিপু কি আর সব রাজার মতো সুলতান হয়ে সুখে থাকতে পারতেন না ! সে সুখের লোভ কেন তাঁর হল না ! কেন এগিয়ে গেলেন বাধা দিতে ! যদি বাধা দিতে পারতেন তো ভারতের মানচিত্র সেদিন লাল হয়ে যেত না। ক্ষুদিরামরা তো সেই লাল রঙ মুছতে গিয়েছিল। টিপু সেই লাল রঙ ছড়াতে দিতে চান নি। ক্ষুদিরামরা অনেক ছিল, কিন্তু টিপু একা। সমস্ত সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে টিপু একা লড়তে গিয়েছিলেন। সেদিন ভারতবর্ষে তাঁর একটা সঙ্গী থাকলে শ্রীরঙ্গপত্তনের ধ্বংসস্তূপ আজ আমাদের দেখতে হত না।

টিপুকে আমরা আজও চিনতে পারি নি, যেমন চিনি নে আরও অনেক শহীদকে যারা কোন প্রমাণ না রেখে চোখের আড়ালে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য। যাঁদের চিনি; তারা কি কিছু দিয়েছেন !

১৬

শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ফেরার পথে চামুণ্ডি পাহাড়কে দেখলুম আলোর মালায় সজ্জিত। শুধু প্রাসাদ আর মন্দির নয়, পাহাড়ের কালো দেহটাও মালা জড়ানো। বিজলী আলোর মালা। ওটা রাজপথ। দিনের বেলায় যে পথ আত্মগোপন করে থাকে, সে পথের বিজ্ঞাপন দেখি অন্ধকার রাত্রে। অপূর্ব রূপ!

আলোকিত পথ ধরে আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। ফিরে এলুম পার্থিব জগতে, আমাদের চেতনার মধ্যে। নিজেদের অতীতটা যেন সহসা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, তাপ্তির কথা। এতক্ষণ যে মেয়েটার সঙ্গে পাশাপাশি বসে এলুম, সে যে আমাদের কেউ নয়, সে কথা মনে ছিল না। সেই বিশ্রী লোকটার কথাও ভুলে গিয়েছিলুম। ভুলে গিয়ে শান্তিতে ছিলুম। গাড়ি থেকে নামবার সময় মনে হল, লোকটা হয়তো থামের আড়ালে লুকিয়ে আছে। এইবারে মুখ বাড়াবে। তাপ্তির শান্তি ভঙ্গ করতে পারলেই তার পরম আনন্দ।

আমি তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলুম। তাড়া দিয়ে বললুম: চল চল, ওপারে চল।

মামা বললেন: তোমরা এগোও। আমি এর পয়সা মিটিয়ে আসছি।

ড্রাইভার বলল: কাল আবার আসব তো? সোমনাথপুর শিবসমুদ্রম বৃন্দাবন?

অসহিষ্ণু ভাবে মামা বললেন: রক্ষে কর।

আমি বললুম: কালকের কথা কাল ভাবব।

সেই বিশ্রী লোকটা তার মুখ বাড়াল না দেখে খুশী হলুম। কিন্তু তাপ্তি আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি যে দেখতে পেয়েছে তাতে সন্দেহ

রইল না। সে কিছু জানতে চাইল না বলেই আমার এ বিশ্বাস গভীর হল।

পরদিন সকালে মামা বেরোতে রাজী হলেন না। বললেন: ‘মনসা’ও কিছু দেখতে দাও।

মন দিয়ে আরও ভাল দেখা যায়। দৃষ্টি দিয়ে যা দেখতে পাই নে, তা তো মন দিয়েই দেখি। কিন্তু মন দিয়ে দেখবার জন্য তো এত দূরে আসবার দরকার ছিল না। স্বাতি সেই কথাই বলল: বিকেলে আমরা বৃন্দাবন গার্ডেনে যাব।

মামা আপত্তি করলেন না। সকালবেলাটা তাই আমরা ছুটি পেয়ে গেলুম।

তাপ্তি এ ঘরে ছিল না। স্বাতি বলল: তাপ্তি তোমাকে খুঁজছে।

কেন?

সে তুমি জান।

আমি!

স্বাতির উত্তর শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। তাপ্তি আমাকে কেন খুঁজছে, সে কথা আমি কী করে জানব! অথচ স্বাতি অন্য রকম ভাবছে। কেন ভাবছে, তাও আমার জানা নেই।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম: দেখে আসি।

সত্যিই দেখতে গেলুম। পাশের ঘরে তাপ্তি ছিল না। ওধারের দরজা খোলা। মনে হল, সে উল্টো দিকের বারান্দায় বেরিয়েছে। উঁকি দিয়ে তাকে দেখতেও পেলুম। নিঃশব্দে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কোন সঙ্কোচ এল না, দ্বিধাও হল না। তাপ্তি গুনগুন করে গান গাইছিল:

বন সুমদোলেন্না জীবনভু বিকাশি শুভস্তে;
মন ভানানুগোলিসু গুরুভে হে দেব।

আমাকে দেখে তাপ্তি চমকে উঠল না। বললুম: ভারি মিষ্টি গলা তো আপনার

মিষ্টি আমার গলা নয়, মিষ্টি গানের ভাবটি।

আমি তো মানে বুঝি নি, আমি সুর শুনেছি।

তাপ্তি আমাকে কথাগুলি আবার শোনাল। বলল: আমার জীবন হোক বনফুলের মতো কুসুমিত। হে দেব, আমার মন তুমি এমনি করেই গড়ে তোল।

আমি বললুম: আর একবার গাইবেন?

কথা না বলে তাপ্তি আবার গাইল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই গান শুনলুম। তারপর ফিরে এলুম ঘরের ভিতরে। জিজ্ঞাসা করলুম: আমাকে খুঁজছিলেন?

তাপ্তিও ঘরে এসে বলল: আপনাকে! আপনি তো পাশের ঘরে ছিলেন!

বুঝতে পারলুম যে স্বাতি আমাকে ছলনা করেছে। ভালই করেছে। তার কী উদ্দেশ্য আছে জানি নে, আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। বললুম: আপনাকে না দেখে আমি নিজেই চলে এলুম।

তাপ্তি হাসল।

বললুম: হাসলেন

এমনি।

সত্যি কথা আপনি লুকোলেন।

সব সত্যি কথা যে সুন্দর হয় না।

তা নাইবা হল।

তাপ্তি বলল: স্বাতি আপনাকে ঠকিয়েছে।

কে বলল?

তাপ্তি আরও একটু হেসে বলল: আমি।

আপনাকে কে বলল?

আমার মন বলব না, বলব আমার বুদ্ধি। দুষ্টু বুদ্ধি।

বুঝতে পারলুম যে মেয়েদের নজর বেশি, বোধ হয় বুদ্ধিও। তাই লজ্জিতভাবে বললুম: আজ আপনাকে একটু বিরক্ত করব।

আমি তো বিরক্ত হই না।

কিছুতেই না?

সে তো আপনিও লক্ষ্য করেছেন।

আমি! আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি!

তাপ্তি অকপটে স্বীকার করল: আপনি কেন! সেই লোকটা, যাকে দেখলে আপনি নিজে বিরক্ত হচ্ছেন, আর আমাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন!

বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। মেয়েটা এত লক্ষ্য করেছে! আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে মনে মনে সে নিশ্চয় হেসেছে। আমি যে নিতান্ত নির্বোধ, এই মুহূর্তে আমার আর তাতে সন্দেহ রইল না। তাপ্তি হেসে বলল: ও আমার স্বামীর বড় ভাই। ভারতের সেনাদলে আছে।

ভেবেছিলুম, তাপ্তি এবারে কিছু মন্তব্য করবে। বলবে, অসভ্য বর্বর। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম: তারপর?

তারপর নয়, তার আগে। আমার স্বামী লেখাপড়া শিখেছিলেন। পড়াশুনো করতেই ভালবাসতেন। ঐ বইগুলো সব তাঁরই।

একটু থেমে বলল: আমাদের সমাজব্যবস্থা বোধ হয় আপনি জানেন না।

ঠিক ধরেছেন।

জানি না কোন সময় মেয়েদের ওপর পুরুষের অবাধ অধিকার ছিল কিনা। অন্তত এক পরিবারের পুরুষদের। ঐ লোকটা আমাকে সেই কথা বোঝাতে চাইত। সেদিন যদি তা শুনতাম—

তাহলে কি—

কথাটা তাপ্তি সম্পূর্ণ করছে না। অস্থির ভাবে আমি আবার বললুম: তা হলে কি আপনার স্বামী—

বাকিটুকু আমি শেষ করতে পারলুম না। মুখে আটকে গেল।

ভাই ভাইকে হত্যা করবে, এ কথা সন্দেহ করাও পাপ। কিন্তু মন পাপের ভয় পায় না। ভয় পেয়ে সত্যকে অস্বীকার করে না। তাপ্তি নীরব থেকেই আমার সন্দেহকে সমর্থন করল প্রবল ভাবে।

আমার মনে তখন নানা প্রশ্ন উঠেছে কিলবিল করে। কোন্ প্রশ্ন করব, কী ভাবে করব! তাপ্তি যাই ভাবুক, তার সব কথা আমাকে জেনে নিতে হবে। না নিলে আমার শান্তি হবে না, এই ভ্রমণের আনন্দ যাবে নিঃশেষ হয়ে। বললুম: দোহাই আপনার, এমন চুপ করে আপনি থাকবেন না।

স্বাতি কখন এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল আমি খেয়াল করি নি। আস্তে আস্তে বলল: বাবা তোমাদের ডাকছেন।

তাপ্তি বাঙলা বোঝে না, তাই আমার মুখের দিকে তাকাল প্রশ্ন নিয়ে। বললুম: ও ঘরে ডাক পড়েছে।

আমার?

স্বাতি বলল: দুজনেরই।

এই ডাক আজ আমার ভাল লাগল না। মনে হল যে কোন অমূল্য সম্পদ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু তাপ্তির মুখে কোন ভাবান্তর দেখতে পেলুম না।

মামা বললেন: কুর্গ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই।

কথাটা ইংরেজীতেই বলেছিলেন। আর তাপ্তি তখনই বলল: বেশ তো, চলুন না দুদিনের জন্যে!

স্বাতি তাপ্তির গা ঘেঁষে বসল, বলল: কাছেই বুঝি?

বাসে আমাদের চার ঘণ্টা লাগে। ট্যাক্সিতে গেলে এক দিনেই ঘুরে আসা যায়।

সত্যি!

তাপ্তি বলল: মাইসোর থেকে ম্যাঙ্গালোরের বাস রোজ ছাড়ে। আমাদের মারকারা প্রায় মাঝ পথে।

উল্লসিত ভাবে স্বাতি বলল : যাবে বাবা ?

মামা না বলতে পারলেন না, হ্যাঁ বলবারও ইচ্ছা ছিল না। তাই বললেন : ও দেশের গল্প আগে শুনি।

কুর্গের গল্প আমরা শুনলুম। পশ্চিম ঘাট পাহাড়ের কোলে কোডাভাদের দেশ কুর্গ। আয়তন পনের শো বর্গ মাইল, অধিবাসী সোয়া তিন লাখের মতো। এক দিকে মহিসুর, অন্য দিকে মালাবার। এই দুই অঞ্চলেরই প্রভাব আছে কুর্গের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে। নিজেদের একটা ভাষা আছে, কিন্তু দীর্ঘ দিনের ব্যবহারেও তা প্রশ্রয় পায় নি। লেখাপড়া কানাড়া ভাষাতেই চলে। আজকাল ইংরেজীর প্রচলন অবারিত হয়েছে।

মানুষের সম্বন্ধে তাপ্তি কিছু বলল না। কিন্তু আমার মনে পড়ল আমাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিআপ্পার কথা। ভারতবর্ষের তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধান সেনাপতি। থিমায়াও প্রধান সেনাপতি হবেন। কুর্গ এঁদের দেশ। শুনেছি, এ দেশের আরও অনেকে সেনাদলের পদস্থ পদে বাহাল আছেন। বীরের বংশ বলে এঁদের একটা খ্যাতি আছে। এই খ্যাতিকে এঁরা মনে প্রাণে সম্মান করেন। এঁরা দেখতেও যেমন, আচরণেও তেমনি সৈনিকের মতো। কিন্তু তাপ্তিকে বড় কোমল বড় নম্র দেখাচ্ছে। তাকে দেখে সৈনিক পরিবারের মানুষ বলে মনে হয় না।

তাপ্তি বলল : বীরের জাত বলে গর্ব করবার আমাদের কিছু নেই। দেশ আমাদের চিরদিনই পরাধীন ছিল। টিপুর মৃত্যুর পর মাত্র চৌত্রিশ বছরের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। তারপর এসেছিল ইংরেজের দখলে। দ্বিতীয় বীররাজকে তাড়িয়ে তারা একজন ইংরেজ কমিশনারের হাতে শাসনের ভার দিয়েছিল।

স্বাতি আমার দিকে তাকিয়ে বলল : পুরাণের কথা বুঝি বলবে না ?

প্রয়োজন হলে বলব বৈ কি !

মামা আশ্চর্য হলেন, বললেন : এখানেও তোমার পুরাণ আছে ?

বললুম : স্কন্দ পুরাণে কাবেরী মাহাত্ম্য আছে। কাবেরীর উৎপত্তি হয়েছে এই দেশে।

তাপ্তি বলল : সে অতি সুন্দর স্থান। উঁচু পাহাড়ে ঘেরা বনময় স্থান। আমরা তাকে তলাকাবেরী বলি। দুধারের ঘন বনরাজির মাঝখান দিয়ে কাবেরী বয়ে আসছে। শুধু ধর্মের তীর্থ নয়, সৌন্দর্যের তীর্থ। দলে দলে হিন্দু সেখানে অবগাহন করতে যায়, মেলা হয় তুলাসংক্রান্তিতে। মারকারা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল পথ, মোটর বাস নিয়মিত চলে। তার আগে চব্বিশ মাইলে ভাগমণ্ডল নামে আর একটি সুন্দর জায়গা আছে। কন্নিকে নামে একটি পাহাড়ী নদী এসে মিলেছে কাবেরীর সঙ্গে। সেই সঙ্গমের ওপরেই ভাগমণ্ডলেশ্বর শিব সুব্রহ্মণ্য ও বিষ্ণুর মন্দির। ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের নিচে এই স্থান, আর তার শিখরের কাছাকাছি তলাকাবেরী। পাহাড়ের উপরে ও নিচে রাত্রিবাসের উপযোগী জায়গাও আছে।

স্বাতি বলল : মারকারায় কী দেখবার আছে ?

তেমন কিছুই নেই বলব না। একটা পাহাড়ের ওপর আছে পুরনো রাজাদের দুর্গ আর রাজবাড়ি। ভিতরে ঢুকেই দুটি প্রমাণ আকারের হাতী দেখতে পাবেন। ব্রিটিশ অধিকারের পর রাজারা কাশীবাসী হয়েছিলেন, এখনও নাকি সেখানেই থাকেন। রাজবাড়িতে এখন সরকারী দপ্তর। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে দু ফার্লং দূরে এই দুর্গ। হেঁটেই উপরে ওঠা যায়। রাজা'স সীট নামে একটি জায়গা কাছেই। সেখান থেকে পাহাড়ের দৃশ্য খুব মনোরম। অনতিদূরে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরস্থাপত্যে একসঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম শৈলী দেখতে পাবেন।

তাপ্তি থামতেই স্বাতি বলল : তারপর ?

তারপর শহরের আর এক প্রান্তে পাহাড়ের ওপর শেষ দুই রাজার সমাধি।

আর কিছু দেখবার নেই বুঝতে পেরে আমি বললুম : এ দেশের বীরত্বের কথা আপনি গোপন করে গেছেন।

মামা বললেন : কী রকম ?

যতটুকু আমার জানা ছিল তা বললুম। ষষ্ঠ শতকে কদম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। আজকের অধিবাসী তাঁরই বংশধর। একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে নবম শতকে এখানে চের বংশীয় রাজা ছিলেন। ষোড়শ শতকে মোগল ঐতিহাসিক ফেরিস্তার সময় এ রাজ্য স্বাধীন ছিল। তারপর রাজত্ব করেন হালেরি পলিগারগন। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বীর রাজেন্দ্র তাঁদের ইতিহাস রচনা করান। তার নাম রাজেন্দ্রনামা।

আস্তে আস্তে তাপ্তি বলল : এর ভিতর বীরত্বের কিছু পাওয়া গেল না।

বললুম : অজেয় হায়দর আলি দক্ষিণের সমস্ত রাজ্য জয় করেও কুর্গ থেকে ফিরে গেছেন। ক্ষতি করেছেন অনেক, কিন্তু রাজ্য জয় করতে পারেন নি। তাঁকে দ্বিতীয়বার আসতে হয়েছিল। সেবারে হায়দর এই রাজবংশের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যান আর টিপু এই রাজ্যের সাড়ে আট হাজার প্রজাকে ধরে নিয়ে যান শ্রীরঙ্গপত্তনে। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাজবংশের বীর রাজেন্দ্র। তিনি পালিয়ে গিয়ে আবার স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্যে নিষ্ঠুরতার কথা বলবেন না ? প্রজা উৎপীড়নের কথা ?

তবু তো তারা রাজার পক্ষ ছাড়ে নি। ইংরেজের সঙ্গে আমরং লড়াই করেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য।

স্বাতি বলল : ইতিহাসের চেয়ে দেশটা নিশ্চয়ই বেশি ভাল।

তাপ্তি হাসল। তারপরে বলল : ঠিক ওয়েল্‌সের মতো।

মানে ?

ইংরেজ সেনাপতিরা তাই মনে করতেন। লম্বা ছুটি না পেলে

এখানেই আসতেন অবসর যাপনে। কমলা লেবু আর কফির বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে শিকার করে বেড়াতেন।

স্বাতি কিছু বিমর্ষ ভাবে বলল : আমাদের জন্যে কী আছে ?

অবলীলাক্রমে তাপ্তি বলল : আমরা আছি। আর—

আমি বললুম : আর কী ?

তাপ্তি বলল : তাহলে মার্কারা থেকে ম্যাঙ্গালোরে যেতে হবে। ভয় নেই। দূরত্ব বেশি নয়, থাকবার জায়গারও কোন অভাব নেই।

কী রকম ? বলে মামা তার মুখের দিকে তাকালেন।

তাপ্তি বলল : মাইসোর থেকে কুর্গের প্রধান শহর মার্কারা পঁচাত্তর মাইল, আর ম্যাঙ্গালোর আরও চুরাশি মাইল দূরে। যদি ট্যাক্সিতে যান, তাহলে এই পথেই ভাগমণ্ডল আর তলাকাবেরী দেখে যেতে পারবেন।

স্বাতি মামার মুখের দিকে তাকাল, আর মামা বললেন : তারপর ?

তাপ্তি বলল : মার্কারায় দেশী হোটেল আছে কয়েকটা— হোটেল কাবেরী মহল, ঈস্ট এণ্ড, মাউন্ট লর্ড আর হোটেল টুরিস্ট। ইনস্পেক্সন বাংলো আর ট্রাভলার্স বাংলো একসঙ্গে, রাজা'স সীটের কাছে টুরিস্ট হোম। মার্কারায় এক রাত কাটিয়ে ম্যাঙ্গালোর চলে যাবেন। দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রধান শহর বা বন্দর বলে বলছি না, গুরপুর ও নেত্রবতী নদীর তীরে শহরটি সত্যিই সুন্দর। মঙ্গলা-দেবীর নামেই শহরের নাম। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে বদ্রি পাহাড়ের পাদদেশে মঞ্জুনাথ শিবের মন্দিরের পরিবেশটি ভারি সুন্দর। মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের গায়ে আছে পাণ্ডব গুহা।

আর কিছু ?

হ্যাঁ, সুলতান'স ব্যাটারি নামে টিপু সুলতানের একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দুর্গ থেকেই টিপুর নৌবহর নজরে রাখা

হত। শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ গুরপুর নদীতে ঢুকছে কিনা; তাও দেখা যেত।

আমি বললুম: দক্ষিণ কানাড়া সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে।

তাপ্তি বলল: অনেক দিন আগে আমরা একবার ঘুরে এসেছিলাম। চারিদিকে কত জিনিস যে দেখবার আছে তাই ভেবে আশ্চর্য হই।

বলুন না কিছু।

গাড়ি থাকলে এক বেলাতেই অনেক কিছু দেখা যায়, এক দিনে তো সবকিছুই দেখা সম্ভব। ম্যাঙ্গালোর থেকে বেরিয়ে প্রথমে চলে যাবেন মুদবিদ্রি—একটি জৈন তীর্থ। মন্দিরে এক হাজার স্তম্ভের একটি মণ্ডপ আছে, আর তাতে সুন্দর কারুকার্য।

আমি বললুম: দূর কত?

দূর! তা মাইল কুড়ি বাইশ হবে। ভেনুর সেখান থেকে দশ বারো মাইল, আর কর্কলা অন্য দিকে অতটাই হবে।

দেখব কী?

গোমতেশ্বরের আর দুটো মূর্তি। কর্কলার মূর্তিটি বিয়াল্লিশ ফুট উঁচু। এটিও একটি পাহাড়ের উপরে। মূর্তিটি নির্মাণ করিয়েছেন বীরপাণ্ড্য ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ভেনুরের মূর্তিটি ত্রিশ ফুটের কম। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে বীর তীম্মসাজা এটি নির্মাণ করান।

এই সঙ্গে তাপ্তি বলল: কিন্তু কর্কলা থেকেই যেন ফিরে আসবেন না।

কেন?

মাইল কয়েক উত্তরে সমুদ্রের ধারে উডিপি চলে যাবেন। ম্যাঙ্গালোর থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে এলে উডিপির দূরত্ব বোধহয় ছত্রিশ মাইল। একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থ। পুরন্দর দাস তাঁর ভজনে এখানকার কৃষ্ণমন্দিরকে আকর্ষণীয় করে গেছেন।

মামা আমার মুখের দিকে তাকাতে বললুম : রামানুজের পরে জন্মেছিলেন মধ্বাচার্য। চতুর্দশ শতকে তিনি এখান থেকেই তাঁর দ্বৈতমত প্রচার করেছিলেন।

তাপ্তি বলল : শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরি মঠও খুব দূরে নয়। উডিপি থেকেও যাওয়া যায়। আর ধর্মস্থল আর একটি তীর্থস্থান ম্যাঙ্গালোর থেকে বিয়াল্লিশ মাইল পূর্বে। নেত্রবতী নদী এর চারিদিক ঘিরে আছে। সকল যাত্রীকে এখানে তিনদিন বিনামূল্যে থাকতে ও খেতে দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে !

তাই তো জানি। কিন্তু এসব দেখতে হলে ম্যাঙ্গালোরে আপনাদের দু' এক দিন থাকতে হবে। ওয়েস্টার্ন স্টাইলের হোটেল আছে মোতি মহল। আর দেশী হোটেল অনেক। রেস্তোরাঁর অভাবও নেই। দু'টো টুরিস্ট লজ আর টুরিস্ট হোমও আছে। রেলের রিটায়ারিং রুমেও থাকতে পারবেন।

কতকটা হতাশভাবে স্বাতি বলল : আমরা তাহলে কোথায় যাই ?

আমি সংক্ষেপে বললুম : বৃন্দাবনে।

সে তো বিকেল বেলায়।

তাপ্তি বলল : সোমনাথপুর ঘুরে আসুন, শিবসমুদ্রম তো অনেক দূর।

আপনি দেখেছেন বুঝি ?

তাপ্তি হাসল। বলল : এখান থেকে মাইল কুড়ি পূবে একটি ছোটখাট নিরিবিলি গ্রাম। লোকে শুধু মন্দির দেখতেই যায়।

এও হয়শাল স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। তৃতীয় নরসিংহের কোন আত্মীয়ের নাম ছিল সোম, তিনি প্রতিপত্তিশালী কর্মচারীও ছিলেন। ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত যখনাচারি।

আমি বললুম : যযনাচারি না যখনাচারি ?

তাপ্তি বলল : আমি একখানা ইংরেজী বইএ এই নাম দেখেছিলুম জনক আচারি। এই রকম নামই হওয়া স্বাভাবিক। আর বেলুর হালেবিড আর এই সোমনাথপুরের মন্দির নির্মাণের সময়ের ব্যবধান এত যে একজনের কাজ বলে মনে হয় না।

আমি বললুম : একজনের পরিকল্পনা হতে পারে।

স্বাতি বলল : বেলুরের সঙ্গে কিছু পার্থক্য নেই ?

আছে বৈকি। তারার মতো ভিতের ওপর তিনটি পৃথক মন্দির একসঙ্গে যুক্ত, প্রত্যেকের একটি করে শিখর। নিচে থেকে উপর অবধি তার কারুকার্য করা। প্রায় একই রকম সূক্ষ্ম ও সুন্দর। যদি ছবি দেখতে চান, আমি দেখাতে পারব।

পর্দার আড়ালে মনে হল কেউ পায়চারি করছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সেই লোকটার কথা মনে এল। তাড়াতাড়ি বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম, সে আমাদের ড্রাইভার। নমস্কার করে কখন বেরোব জানতে চাইল।

ফিরে এসে মামাকে সেই কথা বললুম। সে-ও চেরা পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়েছিল। তাই দেখে মামা বললেন : কোথায় নিয়ে যাবার ইচ্ছে ?

শিবসমুদ্রম্।

সে তো অনেক দূর !

ড্রাইভার আমাদের ভোলাবার জন্য বলল দূর আর কোথায় ! পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ এক বেলাতেই ফিরে আসা যায়। সোমনাথপুর থেকে মাত্র সতেরো মাইল। রাজ্যের সীমানায় গিয়ে কাবেরী আবার দুভাগ হয়েছে। শিবসমুদ্রম একটা দ্বীপ। পাহাড় আর বন, তারপর জলপ্রপাত। চমৎকার দৃশ্য। এক জোড়া প্রপাত—গগনচুক্কি

আর বরচুক্কি। নদীটাই দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। শিব আর বিষ্ণুর দুটো মন্দিরও আছে।

সবাই পেছনে লেগেছে দেখছি!—বলে মামা করুণ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি ড্রাইভারকে বিকেলে আসতে বললুম। চা খেয়ে বৃন্দাবন গার্ডেন দেখতে যাব।

স্বাতি বোধহয় ক্ষুব্ধ হল ; কিন্তু কিছু বলল না।

১৭

মামী ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পরে দেখলুম, সে রাগে নয়, ভয়ে। সকাল বেলায় গল্প করবার সময় তাপ্তির কোমরে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র দেখতে পেয়েছিলেন। ছোরা কিংবা পিস্তল। জিনিসটা লুকনো ছিল, কিন্তু অস্তিত্বটা ঢাকা পড়ে নি। মামীর নানা দুর্ভাবনা। জানাশুনো নেই, যাকে তাকে সঙ্গে নেওয়া কেন! কী দরকার ছিল কোথাকার একটা বিদেশী মেয়ের বোঝা ঘাড়ে বইবার!

মামীর কথার সামনে মামা দাঁড়াতে পারেন না। আমতা আমতা করে বলেন ঃ তাতে হয়েছে কী! কোন্ মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে!

সে কথা কি এখন বুঝবে, বুঝবে ঠেকে।

সারা জীবনই তো ঠেকে শিখছি।

তবে আর কী!

ভেবেছিলুম, এখানেই এ প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু তা হল না। মামী রায় দিলেন যে আজ রাতে স্বাতি ও-ঘরে শুতে পাবে না। ও-ঘরে মানে তাপ্তির ঘরে। রায় দিয়েই মামীর কর্তব্য শেষ। কিন্তু বেরালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধবে! এমন অসৌজন্যের কাজ কে করতে পারে!

আমি একবার মেট্রনের সঙ্গে দেখা করব ভাবলুম। যদি একটা পুরো ঘর পাওয়া যায়, তাহলে মামার সঙ্গে আমি সেখানে যেতে পারি, আর স্বাতি আসবে মামীর কাছে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ল যে নতুন আইনে যাত্রীরা তিন দিন থাকতে পারে, তিন দিন আমাদেরও আজ পূর্ণ হবে। আমাদেরও তো আজ যাবার দিন।

মামা বললেন : গোপাল তো সবই শুনলে, ব্যবস্থা একটা কর।

বললুম : তার দরকার হবে না।

কেন ?

আজ রাতেই তো আমরা চলে যাচ্ছি।

স্বাতি বলল : সত্যিই তো !

মামা আশ্বস্ত হলেন এই কথা শুনে।

বিকেলে বৃন্দাবন গার্ডেনে যাবার সময় তাপ্তিকে স্বাতি ডেকে নিল। অভ্যাস মতো সে আমার পাশেই বসল। কিন্তু বেদনায় আজ আমার মন ভরে আছে। আমাদের মনের সংকীর্ণতার জন্য বেদনা। মানুষকে আমরা মানুষ ভাবতে পারি নে, বিদেশীকে পারি নে আপন ভাবতে। তাপ্তির মতো সুন্দর মেয়েকেও আমরা সন্দেহ করছি। স্বাতিকে কেউ সন্দেহ করলে কি আমাদের ভাল লাগবে !

মনে হল, এই সংকীর্ণতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। ছোট গণ্ডির মধ্যে তো আর আমরা বাঁধা নই। গণ্ডির বাহিরে যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন গোটা বিশ্বটাই আমাদের নতুন গণ্ডির ভিতর আসুক না। বসুধা হোক কুটুম্ব। সে কি কম লাভ !

মামী একে লাভ ভাবছেন না। কোন দিন বোধ হয় তা ভাববেনও না। তিনি যে পৃথিবীতে মানুষ হয়েছেন, সেখানে তাঁর বিলিয়ে দেবার আদর্শ ছিল না। সেখানে তাঁর আদর্শ ছিল ছোট একটি সংসারকে আঁকড়ে থাকবার। সেই সংসারকে বুকে চেপে তাঁর নারী-জন্ম সার্থক মনে হয়েছে। ঘরের বাহিরে এসে বিশ্বের চেহারা দেখবার তাঁর কোনদিন সাধ হয় নি।

আজও তিনি বিশ্ব দেখতে বাহির হন নি। বেরিয়েছেন তীর্থ দর্শনে, পুণ্যের লোভে। ইহকালে তো সবই পেয়েছেন, পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দরকার। একই জন্মে যদি জীবনটা শেষ হয়ে

যেত, তাহলে বোধ হয় তীর্থ-পরিক্রমারও প্রয়োজন হত না। জপ-তপের বদলে হেঁসেলেই বেশি নজর দিতে পারতেন। মামা এক সময়ে খেতে ভালবাসতেন, আজও বোধ হয় বাসেন।

শহর থেকে বৃন্দাবন গার্ডেন দশ বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কাবেরীকে সেখানে বাঁধা হয়েছে। এত বড় ড্যাম নাকি দক্ষিণ ভারতে আর নেই। নাম কৃষ্ণরাজ সাগর। তারই এক ধারে বৃন্দাবন গার্ডেন। ফটকের উপর ভাড়া দিতে হয়। হেঁটে এলে ভাড়া মাথাপিছু, আর গাড়িতে এলে মানুষশুদ্ধ গাড়ির। গাড়ি একেবারে বাগানের মাঝখান দিয়ে তার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকটা পথ হাঁটতে হয় না।

গাড়ি থেকে আমরা যখন নামলুম, বেলাশেষের রোদ তখনও ঝলমল করছে। সেই রঙীন আলোয় আমরা বৃন্দাবনের রূপ দেখলুম। পশ্চিমে বাঁধের গা বেয়ে নদীর ধারা বয়ে আসছে। খানিকটা স্থান জলের নিচে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বাঁধানো। ওপারেও বাগান, নানা রঙের ফুলে পাতায় রঙীন হয়ে আছে। অজস্র ফোয়ারা থেকে অবিরত জল ঝরছে। নদীর মাঝখানেও একটি বড় ফোযারা। সেখান থেকেও জল উঠছে আকাশের দিকে। আকাশ ছোঁবার চেষ্টা। এই ফোয়ারা বাঁচিয়ে কলের নৌকো সোঁ সোঁ করে ছুটছে। পারানি কড়ি নিয়ে এপারের মানুষকে ওপারে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তাদের ফিরিয়ে আনছে।

পূর্বে বাগানের ভিতর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। চওড়া রাস্তার দুধারে নানা রঙের নানা রকমের মরশুমি ফুল, আর ফোয়ারার কত বিচিত্র আয়োজন। জল কোথাও তরতর করে নেমে আসছে, কোথাও চারিদিক থেকে ধারা উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। সকলের পিছনে বিরাট অট্টালিকা। হোটেল কৃষ্ণরাজ সাগর। বিকেলের চা আমরা এইখানেই খেতে পারতুম। অনেকেই খাচ্ছে। জায়গাটি রমণীয়। ছায়া খুঁজে আমরা একটি বেঞ্চির নিচে বসলুম।

সন্ধ্যার অপেক্ষা। অন্ধকার হলে বাতি জ্বলবে। নানা রঙের বাতি। এ বাগান তখন আর এ রকম থাকবে না, স্বপ্নময় পরীর রাজ্যে পরিণত হয়ে যাবে। আমরা সেই পরীর রাজ্য দেখে বাড়ি ফিরব।

তাপ্তি আমাদের সঙ্গে বসে নি। নদীর ধারে এগিয়ে গিয়ে পায়চারি করছে। স্বাতি বলল: তোমাকে ডাকছে গোপালদা।

আমাকে! কই ডাকে নি তো! আমাকে ডাকবে কেন!

স্বাতি হেসে উঠল। আমার উদ্বেগে সে কি অপরাধী মনের পরিচয় পেল! তাড়াতাড়ি বললুম: ও হ্যাঁ, বোধহয় তার যাবার ব্যবস্থার জন্যে ডাকছিল!

স্বাতি আবার হাসল। কিন্তু মামা বললেন: ও কি যাবে বলছিল?

ও নয়, মেট্রন বলছিল যে ওরও তিন দিন পুরো হয়ে গেছে।

আমি আর অপেক্ষা না করে তাপ্তির দিকে এগিয়ে গেলুম।

আমার পায়ের শব্দ সে শুনল কি না সে-ই জানে। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে থামল। সেখান থেকে মামা মামীকে আর দেখা যাচ্ছে না। বলল: আসুন, এইখানে একটু বসি।

বুঝতে দেরি হল না যে আমার উপস্থিতি সে অনেক আগেই টের পেয়েছে। ইচ্ছে করেই এতক্ষণ কথা বলে নি। আমিও কোন উত্তর না দিয়ে তার পাশে এসে বসলুম।

আমার মনে হল যে তাপ্তি আজ কথা কইতে চায়। সেইজন্যেই বোধহয় দূরে ডেকে এনেছে। দুনিয়ার এই নিয়ম। কথা বলতে যে জানে, সে সারাক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। বুকের ভিতর যখন কথা জমে ওঠে ভারি হয়ে, সে কথা ব্যথার মতো চাপ দেয়। কাউকে বলতে পারলে হাল্কা হয় বুক। কিন্তু সেই বলার মানুষ যে সংসারে কম। যার একজনও নেই, সে হতভাগ্য। তাপ্তি কি আমাকে কিছু বলবে? আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

এক সময় আস্তে আস্তে তাপ্তি বলল ঃ আপনাদের সঙ্গে আরও দিন কয়েক থাকবার ইচ্ছা ছিল।

বেশ তো।

তা হবে না।

কেন ?

আপনার জীবন আমি বিপন্ন করছি।

আমার জীবন !

বিপুল বিস্ময়ে আমি চমকে উঠলুম।

তাপ্তি বলল ঃ আমার কাছে ঘেঁষবার সাহস তার নেই। তাই আক্রোশে আপনাকেই হয়তো আক্রমণ করবে।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। তাই কোন কথা কইতে পারলুম না।

তাপ্তি বলল ঃ মনে হচ্ছে, এই রকম কোন মতলব নিয়ে সেও এইখানে এসেছে। কাছেই আছে আত্মগোপন করে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি ভয় পেলুম। বললুম ঃ আমরা যে এখানে আসব, সে কী করে জানল ?

তাপ্তি হেসে বলল ঃ ড্রাইভারকে তো আমরা বলেই রেখেছিলুম।

আমার ভয় বাড়ল। এ কিসের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি ! আমি তো কোন অপরাধ করি নি যে আমায় শাস্তি পেতে হবে !

তাপ্তি বলল ঃ ভয় পেলেন নাকি ?

মিথ্যে কথা আমার মুখে এল না, সত্যি কথাও বলতে লজ্জা হল।

তাপ্তি হেসে বলল ঃ আপনার কোন ভয় নেই। এ সব চিন্তাও করবেন না। আমি খুব সজাগ আছি।

তারপরেই বলল ঃ ভাল কথা, আজ আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। নোটিশ পেয়েছি।

এ কথা শুনে আমি লজ্জা পেলুম। মেট্রন বোধহয় আমার কথাতেই নোটিশ দিয়েছে।

তাপ্তি বলল ঃ না পেলেও আমাকে যেতে হত। রাতের গাড়িতে আমার রিজার্ভেসন আছে।

কোথায় যাবেন?

ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাড্রাসে।

তারপর?

জীবিকার চেষ্টা। ভরসা আছে যে বড় শহরে কিছু করে খেতে পারব। কিছু না জুটলে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পড়াতে না পারি, পড়তে তো পারব!

তাপ্তির পয়সার যে অভাব নেই, সে কথা আমি আগেই জেনেছি। কাজেই তার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমার মন বড় ভারাক্রান্ত হল। কেন জানি না, উত্তরপাড়ার ছোট ঘরখানির কথা আমার মনে পড়ল। নিতান্তই ছোট ঘর, আলো বাতাসের চেয়ে ধোঁয়া আসে বেশি, বেশি দম আটকায়। কিন্তু সে ঘর আমার খুব ছোট মনে হত না। যে বিরাট আকাশের নিচে অসংখ্য ঘর আছে, আমি তো সেই আকাশেরই নিচে আছি। যে বিপুল পৃথিবীর উপর অগণিত ঘর, আমিও তো সেই মাটিরই উপর আছি। আমার উপরে ও নিচে যখন অসীম বিস্তার, আমি কেন চারখানা দেওয়ালকে সত্য ভেবে সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেব! এই বৃন্দাবন গার্ডেন তো উত্তর-পাড়ারই মতো, কাবেরীও গঙ্গার মতো নদী। তাপ্তি আর স্বাতিতে কতটুকু তফাৎ: আর সেই ফরাসী যুবকটি! এখন আমার সামনে এলে তাকেও উত্তরপাড়ার লোক ভাবতে আমার কোন কষ্ট হবে না। নিজেকে ছড়িয়ে দিলে জগৎকে যে জড়িয়ে ধরতে পারব!

তারপর!

তারপর সব এলোমেলো হয়ে গেল। বিদ্যুতের মতো চমকে উঠেই তাপ্তি মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমি তাকে হারিয়ে ফেললুম।

উত্তেজনায় আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু তাকে খুঁজতে

যেতে হল না। খানিকটা দূরে একটা গাছের আড়ালে তাকে দেখতে পেয়েছি। সে ঐ বিশ্রী লোকটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

খানিকটা এগিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। তাপ্তি যেন আগুনের শিখার মতো জ্বলছে, আর লোকটা পিছিয়ে গেছে ভয়ে। নিজেদের ভাষায় তাপ্তি তাকে কী বলল সে-ই জানে, আমি একটা ভীরু কাপুরুষকে দেখলুম মাথা হেঁট করে চলে যেতে। তাপ্তি ফিরে এল। সেই পুরনো তাপ্তি। আগুনের শিখার মতো নয়, প্রদীপের মতো মিষ্টি ও মধুর। আমার বিস্ময়ের যেন শেষ রইল না।

আবার আমরা আমাদের পুরনো জায়গায় ফিরে এসে বসলুম। কিন্তু কী বলব ভেবে পেলুম না।

তাপ্তি বলল : খুব অসভ্যতা করেছি, তাই না?

না না, অসভ্যতা কিসের!

আপনি বেশি ভদ্র। আজ সারা দিন আপনি ওকে লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু আমি করেছি। ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল। আজ ও আপনাকে খুঁজছিল। ওকে একটু সাবধান করে এলাম।

আমার কথা যেন সব ফুরিয়ে গেছে

তাপ্তি বলল : এখানে এসে আমি হোটেলে উঠেছিলাম। খবর নিয়ে সেও এসে সেই হোটেলে উঠল। ও জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয় ভেবে আমি স্টেশনে চলে এলাম।

একটু থেমে বলল : ওকে আমি অনেক আগেই শেষ করে দিতে পারতাম। সে ইচ্ছাও এক দিন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। আমার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক পরের ঘটনা। আমার কাছে এসেছিল সান্ত্বনা দিতে। সেই মুহূর্তে আমি তাকে খুনী বলে সন্দেহ করেছিলাম। হাতে অস্ত্র থাকলে তখনি হয়তো শেষ করে দিতাম। কিন্তু অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে আমার মত পালটে গেল।

পালটে গেল!

হ্যাঁ। ভাবলাম, তাতে অনেক কেলেঙ্কারী হবে। লোকে

আমার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে এই হত্যাকে যুক্ত করে অনেক মুখরোচক কাহিনী রচনার সুযোগ পাবে। শাস্তিকে আমি ভয় পাই নি, আমি ভয় পেয়েছিলাম আমার স্বামীর বদনামের। তিনি দেবতার মতো উদার ছিলেন। তাঁর অপবাদ হলে সে পাপ আমাকে ফাঁসির পরেও পীড়া দিত।

তাপ্তি অনেকক্ষণ থেমে রইল। তারপর বলল: আজও তাই আমি তাকে সহ্য করি।

আমার মনে হল, আমি তার কোমরের অস্ত্রের রহস্য এতক্ষণে ভেদ করেছি। সে এই অস্ত্র রেখেছে আত্মরক্ষার জন্য। ভাল করে এই কথাটুকু জানবার জন্য বললুম: আপনি নিরস্ত্র থাকেন?

তাপ্তি হাসল। কোমরে তার বাম হাতটা রেখে বলল: না। পৃথিবীতে আজকাল দিনে রাতে জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। তাদের নানা রকমের ক্ষুধা।

আমি উত্তর দিতে পারতুম, কিন্তু দিলুম না।

তাপ্তি অন্যমনস্ক ভাবে বলল: সম্মান সাবধানে রাখবার জিনিস। একবার হারালে তা চিরকালের মতো গেল। বিশেষ করে মেয়েদের সম্মান।

আমাদের পাশ দিয়ে একখানা বড় বাস চলে গেল। এর আগেও একখানা এসেছিল। যাত্রীরা বৃন্দাবন দেখতে আসছে। দিনের আলো নিবে আসছে, এবারে রাতের আলো জ্বলবে। দেখতে দেখতে সব কিছু স্বপ্নময় হয়ে উঠবে। সবাই সেই স্বপ্নের রাজ্যে হাবু-ডুবু খাবার জন্য একান্ত ভাবে অপেক্ষা করছে। আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, তা বুঝতে পারছিলুম। তাপ্তি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল: আপনার ঠিকানাটা দেবেন?

চামড়ার থলি থেকে তার নোটবুক বার করে সে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে আমার উত্তরপাড়ার ঠিকানা দিলুম।

লিখে নিয়ে সে বলল : যা বলতে পারলাম না, তা আপনাকে লিখে জানাব।

আমার রোমাঞ্চ হল। সেই সঙ্গে দুঃখও হল অপরিমিত। মনে হল, তাপ্তি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। এ তার বিদায়ের পূর্বাভাষ। এই কদিনে আমরা এমন অন্তরঙ্গ হয়ে গেলুম! অন্তরঙ্গ হতে কি সময়ের প্রয়োজন নেই!

তাপ্তি বলল : আর একটা কথা।

আমি নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি আপনাকে ভালবাসে। তাকে আপনি কোন দিন ভুল বুঝবেন না।

আমি চমকে উঠলুম : কে বলল এ কথা?

স্বাতি নিজেই বলেছে।

তাপ্তির সুন্দর মুখে ভারি মিষ্টি হাসি।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বাতি এল আমাদের কাছে। বলল : দেখ কাকে ধরে নিয়ে এলাম!

সেই ফরাসী যুবক! বাসে চেপে সেও এসেছে বৃন্দাবন দেখতে। স্বাতিকে নাকি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বললুম : এবারে কোথায় যাবে?

যুবক তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে বলল : মহাবলিপুরম।

সে তো মাদ্রাজ হয়ে যেতে হয়!

ঠিক তাই।

তাপ্তি বলল : ভালই হল। আমরা এক সঙ্গে যাব। আপনি কি আজ রাতের গাড়িতেই যাবেন?

টিকিট কিনে এসেছি।

আমারও কেনা আছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : ও আজই যাবে।

তাপ্তি উঠে দাঁড়াল। বলল: আপনারা একটু বসুন। আমি অনুমতি নিয়ে আসি।

বলে স্বাতির হাত ধরে মামা মামীর দিকে এগিয়ে গেল।

বড় সঙ্কুচিত ভাবে ফরাসী যুবকটি বলল: আমি তো আপার ক্লাসে চড়ি নে। আমার রুপি বেশি নেই।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ। আমার দেশ মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়েছে।

বাস!

আর চুরি করে আমি আরও আড়াইশো টাকা এনেছি। এতেই আমাকে গোটা ভারতবর্ষটা দেখতে হবে।

আফসোস করে বললুম: যাতায়াতেই তো তোমার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে।

না না, আমাকে তারা রিটার্ন টিকিট কিনে দিয়েছে। প্লেনের টিকিট। এ টাকা শুধু ভারতবর্ষে খরচের জন্যে।

কঠিন কথা।

যুবকটি মেনে নিয়ে বলল: সেইজন্য আমি হোটেলে যাই নে। স্টেশনেই পড়ে থাকি। ডিনার খাই নে, পাঁউরুটি খেয়ে রাত কাটাই। এ দেশের মসলা দেওয়া খাবার খেতে আমার খুব ভয় করে।

হেসে বললুম: এ দেশ তোমার কেমন লাগছে?

খুব ভাল।

কী কী দেখলে বলবে না?

বম্বে থেকে শুরু করেছি। প্রথম অজন্তা আর ইলোরা।

কেমন দেখলে?

অপূর্ব।

তারপরে?

মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রাম।

এখন আর কী দেখবার আছে ?

মহাত্মাজীকে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন, তাঁদের আমি দেখে এলাম। তাঁদের মুখেই মহাত্মাজীর কথা শুনলাম।

তারপর ?

তারপর হায়দ্রাবাদ। ভাল লাগল না।

কেন ?

ওদের একটা মিউজিয়ম দেখলাম। মিউজিয়ম কেন বলে জানি না। কোন পয়সাওয়ালা লোকের খেয়ালী সংগ্রহ। সুরুচির পরিচয় নয়। আমাদের ফুটপাথে যা বিক্রি হয়, তাও যত্ন করে রাখা হয়েছে।

যখন দেখব, তোমার মতামত আমি মিলিয়ে নেব। তারপর ?

বেলুর হালেবিড শ্রবণবেলগোলা অদ্ভুত ভাল লেগেছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম যে স্থানে স্থানে বাতি জ্বলে উঠেছে। লাল নীল সবুজ হলদে নানা রঙের বাতি। ফোয়ারাগুলো আর সাদা দেখাচ্ছে না, নানা রঙে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। যুবকটির সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনাবে, আর এই রঙীন আলো হবে উজ্জ্বলতর। সামনে নদীর উপর পরপারের বাগানেও সব রঙীন হয়ে উঠেছে। আশে-পাশে চারিধারে সর্বত্র রঙের খেলা।

পথের উপর পদধ্বনি শুনলুম। স্বাতি ও তাপ্তি আসছে, পিছনে মামা মামী। কাছে এসে মামা বললেন: তাপ্তির কাণ্ড শুনেছ গোপাল ?

না তো।

তার খরচ দিতে চাইছে। মেয়ের বন্ধু তো নিজেরই মেয়ের মতন, মেয়ের কাছে বাপে খরচ নেয়! তাপ্তি এ কথা বুঝছে না।

বলে অকারণেই হেসে উঠলেন।

মামার এই পরিচয় আমি জানি। এই মেয়েটা চলে গেলে

অনেকক্ষণ তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাইপ ধরাবেন। কথাটা আমি তাপ্তিকে বুঝিয়ে দিলুম।

বৃন্দাবনের দৃশ্য মামা মামীর ভাল লেগেছে, স্বাতিরও। ফরাসী যুবককে আমি বললুম: তোমার কেমন লাগছে?

সংক্ষেপে সে বলল: ছেলেমানুষী।

আমারও তাতে সন্দেহ নেই। তবু তো ভাল লাগে।

এবার সে বিদায় নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাকে ট্রেন ধরতে হবে। তাপ্তি বলল: আমিও এঁর সঙ্গে যাই। একটু গোছগাছ করে নিতে হবে।

মামা বললেন: সেকি, আমরাও তো এখুনি ফিরব!

তাপ্তি অনুরোধে আর্দ্র হয়ে বলল: আপনারা আর একটু বসুন, আমি আগে যাই।

বলে ফরাসী যুবকটির সঙ্গে বাসের দিকে এগিয়ে গেল।

মামা বললেন: তুমি কি ওকে কিছু বলেছিলে?

কী সম্বন্ধে?

ওর চলে যাবার ব্যাপারে?

ও নিজেই চলে যাচ্ছে।

মামা কী ভাবলেন তিনিই জানেন। আমি শুধু একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম।

মামী বললেন: স্বাতি কোথায় গেল?

সত্যিই তো, স্বাতিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে, অন্ধকারে দেখা সম্ভবও নয়।

সে কি তাপ্তিকে পৌঁছতে গেল!

বললুম: দেখে আসি।

মামা বললেন: আমরা এই বেঞ্চিতে বসছি, আমাদের আবার হারিয়ে ফেলো না।

আমি স্বাতির খোঁজে গেলুম। কিন্তু তাকে বাসের কাছে দেখতে

পেলুম না। তাপ্তি সেই ফরাসী যুবকের পাশে উঠে বসেছে। দূর থেকে দেখে আমি বিদায় নিলুম।

ফেরার পথে সন্দেহ হল, স্বাতিকে পাব নদীর ধারে। আমাকে তার নিরিবিলিতে হয়তো দরকার আছে। তাই এই ছল। রাস্তা ছেড়ে আমি নদীর ধারে এলুম।

অন্ধকার এখন গভীর হয়েছে। দূরের মানুষ এখন আর চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু তবু আমি স্বাতিকে চিনতে পারলুম। রেলিঙ ধরে নদীর দিকে চেয়ে আছে। ভঙ্গিটি বড় চেনা চেনা! নিঃশব্দে আমি তার পাশে এসে দাঁড়ালুম। বোধহয় বুঝতে পেরেও স্বাতি কোন কথা কইল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: কী দেখছ?

কিছু না।

তবে?

ভাবছি।

আমার কথা?

না।

তোমার কথা?

তাও না।

তবে নিশ্চয়ই তাপ্তির কথা ভাবছ।

স্বাতি বলল: অসঙ্কোচে সে একটা বিদেশী লোকের সঙ্গে চলে গেল!

তাতে কী হয়েছে?

ভয় করল না!

ভয় কিসের!

মেয়েদের ভয়ের কথা কি তুমি জান না?

ও তো শিল্পী ছেলে, ওর অনেক উঁচু নজর। নারীদেহে ওর লোভ থাকলে বিদেশে এত কষ্ট সইতে আসত না।

তা ঠিক।

গোঁ গোঁ শব্দ করে বড় বাসখানা বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। তাপ্তি চলে গেল। স্টেশনে ফিরে হয়তো দেখা হবে। না হতেও পারে। বললুম : ফিরবে না ?

জল আর রঙে চারিদিকে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হল, স্বাতি নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। অনেকক্ষণ পরে অন্যমনস্ক ভাবে বলল : তাপ্তিকে তুমি ও কথা কেন বললে ?

কোন্ কথা ?

এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

আমি তো তাকে অনেক কথাই বলেছি।

আমার সম্বন্ধে !

তোমার সম্বন্ধে কি কিছু বলেছি ? কই, মনে পড়ছে না তো !

বলেছ বৈকি, আমাকে ভালবাস বলেছ !

আমি, আমি বলেছি এই কথা !

তাহলে সে কেন বলবে, তোমাকে যেন কোন দিন ভুল না বুঝি !

বিস্ময়ে আমার মুখে আর কোন কথা যোগাল না। আমাকেও তো সে এই কথাই বলে গেছে। সে কি তবে স্বাতির কথা নয় !

তবু আমি হেসে বললুম : তাপ্তি ঐ রকম। অনেক কথাই সে বানিয়ে বলে।

কিন্তু স্বাতির বোধ হয় এ কথা বিশ্বাস হল না। সে বোধ হয় ভাবল, আমিই বানিয়ে বলছি। সে তাই ভাবুক। আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। লাভ হবে [illegible] কারও ?

বৃন্দাবনে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল হৃদয়কে আচ্ছন্ন করছে।

১৮

বৃন্দাবন গার্ডেনে একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা একটা হোটেলে উঠেছেন। হোটেলটি ভালই বললেন, খরচও বেশি নয়।

শহরে দেশী ও বিলেতী হোটেলের ছড়াছড়ি। সরকারী গেস্ট হাউস, ইয়ুথ হস্টেল, ধর্মশালা—সবই আছে। ধলবন্ত্রি রোডের উপরেই আছে তিনটি ভাল দেশী হোটেল। স্টেশনও বেশি দূরে নয়।

স্টেশনে আমাদের তিন দিন থাকবার অধিকার। আজই সেই মেয়াদ পূর্ণ হবে।

তাহলে আসুন না আমাদের হোটেলে!

মামা বললেন: মাইসোরে আর নয়। আজই আমরা ফিরব।

সে কি, তিন দিনেই সব দেখা হয়ে গেল! এত খরচপত্র করে এত দূর এসে—

দেখবার আরও অনেক জায়গা আছে। সেখানেও দু এক দিন কাটিয়ে যাব।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন। মামার দৃষ্টিতেও আদেশ দেখলুম, সেই সব জায়গার নাম করবার। বললুম: হাম্পি বিজয়নগর কিষ্কিন্ধ্যা, বাদামি পট্টডকল আইহোলের গুহা, বিজাপুর বিদর গোলকুণ্ডা, ঔরঙ্গাবাদ—

স্বাতি বলল: থাক থাক, আর বলতে হবে না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন: এত সব দেখবার জায়গা!

তাঁর স্ত্রী তাঁকে রক্ষা করলেন, বললেন: এমন ছুটোছুটি করে না বেড়িয়ে একটা জায়গাই আমরা ভাল করে দেখব।

ভদ্রলোক সমর্থন করে বললেন : ঠিক ঠিক। দেখব তো ভাল করেই দেখব।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন। রাজবাড়িতে আলোর মালা দেখেছেন ?

না।

তবে তো কিছুই দেখেন নি দেখছি।

একটি ছোট মেয়ে বলল : আজও বাতি জ্বলবে।

কে বলল ?

চেনাপ্পা।

চেনাপ্পা হোটেলের বেয়ারা। তার কাছে সব খাঁটি খবর। ফেরার পথে দেখে যেতে ভুলবেন না। রাত দশটার পরে তো গাড়ি, এখনও ঢের সময় আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন : আলো দিয়ে সাজানো রাজবাড়ির ছবিও কিনতে পাওয়া যায়। বাজার থেকে কিনে নেবেন।

স্বাতি তার ক্যামেরা দেখিয়ে বলল : আমরাই তুলে নেব।

এখানকার ছবি নিয়েছেন ?

নিয়েছি।

কী সুন্দর বলুন ! খরচ করে এত দূর আসা সার্থক হয়ে গেল।

স্বাতি হাসল।

রাজবাড়িতে আলোর মালা দেখে স্বাতি বলল : কেমন লাগছে গোপালদা ?

উত্তরটাও সে নিজে দিল, বলল : এমন সহজে যদি খুশী হতে পারতাম তো ভাবনা ছিল না।

আস্তে আস্তে বললুম : মনটা বেয়াড়া কিনা।

বেয়াড়া নয়, বল বনেদী। বাইরের চটক দেখে ভেতরের মন ভরে না।

মন্তব্যটা ভাল লাগল। নীতিটাও ভাল। কিন্তু সবার কি সব সময় তা মনে থাকে।

স্টেশনে ফিরে তাপ্তিকে আমরা দেখতে পেলুম না। বেয়ারা বলল: এক সাহেবের সঙ্গে খেতে গেছে। জিনিসপত্র আছে ঘরে।

মামা বললেন: আমাদের গাড়ির ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, একবার দেখে নেবে না?

মামী বললেন: পেটের ভাবনা বুঝি ফুরিয়ে গেছে!

বললুম: মুখ হাত ধুয়ে আপনারা নিচে নামুন। আমি গাড়ির খবর নিয়ে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আসছি।

এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর যাবার গাড়িতে ভিড় হয় না। একখানা পুরো কামরাই পাওয়া গেল। স্বাতি আমার সঙ্গে ছিল। তাদের সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে সে আমাকে বাধ্য করেছিল। তাপ্তিদের সঙ্গেও দেখা হল। সে তার টিকিট বদলে নিয়েছে। সেই ফরাসী যুবকের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবে। আমাকে একটু আড়ালে ডেকে বলল: আপনি ফ্রান্সে কখনও গেছেন

হেসে বললুম: ভাবছি, আপনার পরে যাব।

আমার যাবার কথা আপনার কেন মনে এল?

জায়গাটা ভাল বলে শুনেছি।

তাপ্তি বলল: মেয়ে বলে নাকি সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় না।

বললুম: ওটা সভ্যতার লক্ষণ।

যাবার আগে তাপ্তি বলল: আপনার সমর্থন পেয়ে ভাল লাগছে।

গাড়ি ছাড়বার অনেক আগেই আমরা গাড়িতে এসে উঠলুম। মামা আজ দুপুরে ঘুমিয়েছেন। এত তাড়াতাড়ি শুতে রাজী হলেন

না। পাইপ ধরিয়ে আমাকে বললেন: তোমার কিষ্কিন্ধ্যার গল্প ...!

স্বাতির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, মামার এই আদেশ সে বেশ উপভোগ করেছে। গল্প শুনতে তার ভাল লাগে কিনা সে কথা বলবে না, গল্প বললে সে নানান মন্তব্য করবে। স্কুলের পড়া ইতিহাস আর রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়ে আমার সবজান্তা নাম হচ্ছে। এই সবজান্তা কথাটার ভিতর শ্রদ্ধার চেয়ে বিদ্রূপ আছে বেশি। তবু আমার শুনতে ভাল লাগে। দেশের শিক্ষা কত হাল্কা হয়ে গেছে যে সামান্য জ্ঞানের কথাও একটা মন্তব্যের বিষয় হয়েছে। খানিকটা বেদনাও বোধ করি। আমাকে নীরব দেখে স্বাতি কী বুঝল সে-ই জানে, অনুরোধ জানাল: বেশ জমিয়ে বল।

বললুম: কিষ্কিন্ধ্যার কথা আমি তিন জায়গায় পড়েছি—পুরাণে ইতিহাসে আর খবরের কাগজে।

মামা আশ্চর্য হলেন দেখে বললুম: কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি আর সুগ্রীবের কথা পড়েছি রামায়ণে। তারপর সেই মাটির উপর প্রতিষ্ঠা হল বিজয়নগর রাজ্যের। সে ইতিহাসের কথা। আজ বিজয়নগর নেই। কিন্তু সেইখানেই তুঙ্গভদ্রা নদী বাঁধা পড়েছে। বিরাট পরিকল্পনা। খবরের কাগজে তার ছবি আর সংবাদ বেরিয়েছে।

আজ রাবণ বললে আমরা রাক্ষস বুঝি, আর বালি বললে বানর। রাবণ আর বালির দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাও মনে পড়ে। বালি সমুদ্রতীরে জপ তপ করছেন, পিছন থেকে রাবণ আসছেন আক্রমণ করতে। বালি বুঝতে পেরেও চুপ করে আছেন। কাছাকাছি আসতেই তাঁর লেজ লম্বা করে রাবণকে পেঁচিয়ে ধরলেন। তারপর তাঁকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর জল খাওয়ালেন। এই তো কাহিনী, এর পিছনে কি কোন সনাতন সত্য নেই!

বালি আজ বানর বলে চিহ্নিত। কিন্তু তিনি যে অপরাজেয় বীর ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই দানব ভাই মায়াবী দুন্দুভি তাঁর হাতে শাস্তি পেয়েছে। পাতালে প্রবেশ করেও পরিত্রাণ পায় নি। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে আসেন। সুগ্রীব দ্বন্দ্বযুদ্ধে এগিয়েছিলেন রামের সাহসে। কিন্তু রাম সম্মুখ-সমরে না এসে আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বালিকে বধ করেন। রামের জীবনে এত বড় কলঙ্ক বুঝি আর নেই।

রামায়ণে বালিবধের প্রসঙ্গ মনে আছে, কিন্তু বালির বিস্তৃত বিবরণের কথা মনে নেই। তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা, তাঁর প্রজা শাসনের কথা, কোনখানে পড়েছি কিনা তাও স্মরণ নেই। কিষ্কিন্ধ্যার পরিসর কত দূর ছিল, আজ তা অজ্ঞাত। লঙ্কার সীমানাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। লঙ্কা যে সমুদ্রের এপারে ছিল না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। সীমানা এপারে হলে অবাধে রাম সমুদ্র তীরে পৌঁছতে পারতেন না, প্রয়োজন হত না সেতুবন্ধের। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে বেরিয়ে রামেশ্বর পর্যন্ত রাম কোন বাধা পান নি, আমরাও পাই নি কোন নতুন রাজ্যের নাম। তবে কি কিষ্কিন্ধ্যার সীমানা ছিল সমুদ্রের তীর পর্যন্ত! বিচিত্র নয়। বালির মতো পরাক্রান্ত রাজার বিস্তীর্ণ রাজ্যই হয়তো ছিল।

রাম এই বালির সাহায্য পান নি। সীতার বিরহে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই সুগ্রীবের সাহায্য প্রত্যাশায় বালিকে হত্যা করেছিলেন। বালি বেঁচে থাকলে লঙ্কার যুদ্ধ বোধ হয় হত না। তিনি একাই সবাইকে সায়েস্তা করতে পারতেন। সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হতেন রাবণ। রামায়ণ অন্য রকম হত।

মামা বললেন: এ সব কিছুই আর মনে নেই। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডও ভুলে গেছি। সে কি আজকের পড়া!

দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গে আমি কিষ্কিন্ধ্যার বৃত্তান্ত পড়েছি। ব্যাঙ্গালোর থেকে সেকেন্দ্রাবাদের পথে গুন্টাকল বড় জংসন স্টেশন।

সেখান থেকে রেল লাইন গেছে পশ্চিমে হুব্‌লির পথে। এই লাইনে হস্পেট একটা স্টেশন। তার সাত মাইল দূরে হাম্পিগ্রাম। লোকে সেখানে বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপ দেখে, আর দেখে প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরে সত্য যুগের নানা নিদর্শন এখনও ছড়িয়ে আছে। ঋষ্যমূক পর্বত, অঞ্জনা পাহাড়, পম্পা নদী ও সরোবর, মতঙ্গ ঋষির তপস্যাস্থল, আরও সব পবিত্র স্থান। লোকে আজকাল তুঙ্গভদ্রার বিরাট বাঁধও দেখে।

মামী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি, এবারে বললেন: এ সব বুঝি আমাদের দেখাবে না ?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: বোধহয় একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। একেবারে আকাট গ্রাম। একটা রেস্ট হাউস আছে শুনেছি, সেখানে জায়গা না পেলেই বিপদ। তারপর গরুর গাড়ি আর নৌকোয় নদী পার।

মামা ভয় পেয়ে বললেন: বল কি গোপাল !

এ সব অবশ্য আমার পড়া কথা, পুরনো আমলের বইএ। নতুন কিছু সুবিধে সুযোগ হয়েছে কিনা, গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

স্বাতি বলল: অভিজ্ঞতাটা মন্দ হবে না।

মামী বললেন: আগে থেকে খবর নেওয়া যায় না ?

মামা বললেন: মহাবীরের ভক্ত তো নই, না হয় নাই বা গেলে।

এ তাঁর দুর্ভাবনার কথা। হস্পেটের মতো ছোট স্টেশনে রাত কাটানো সম্ভব নয়, গরুর গাড়িতে ওঠাও চলবে না। তারপর পেটের সমস্যা। খাদ্য এমনই প্রয়োজনীয় জিনিস যে তার অভাবের আশঙ্কাই পীড়াদায়ক। না গেলে যখন কোন দুর্ভাবনা নেই, তখন যাবার অত তাগিদ কিসের !

অনেক পরে আমি শুনেছিলুম যে হস্পেট বেলারি জেলার একটি শহর, সবকিছুই সেখানে পাওয়া যায়। স্টেশনেও

রিটায়ারিং রুম আছে, বাইরে আছে খাবার দোকান। ট্রেনের সময় টাঙ্গা আসে স্টেশনে, অন্য সময়ে বাজারে হেঁটে যেতে হয় যানবাহনের জন্য। বাস চলে হাম্পির দিকে, তুঙ্গভদ্রা ড্যামের উপর দিয়েও বাস যায়। সেখানে পাহাড়ের উপরে দুটি চমৎকার রেস্ট হাউস আছে। হাম্পির উপকণ্ঠে কমলাপুরেও আছে রেস্ট হাউস। সেখান থেকে রয়ে সয়ে বিজয়নগর দেখা যায়। তাড়া থাকলে ট্যাক্সি নিতে হয় হস্পেটের বাস স্ট্যাণ্ডে। এক বেলাতেই সবকিছু দেখে নেওয়া সম্ভব। বিজয়নগর এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ষোড়শ শতকে। পম্পাপতি, হাজারা রাম ও বিঠ্ঠল মন্দির অপরূপ কারুকার্য মণ্ডিত। এ ছাড়াও নরসিংহ ও গণেশের বিরাট মূর্তি আছে এক পাথরে তৈরি। দশেরা ডিব্বা, লোটাস মহল, হাতীশালায় যাদুঘর ও আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা তুঙ্গভদ্রার পরপারে।

স্বাতি বলল: আমাদের ভ্রমণটা বড় পান্‌সে মনে হচ্ছে গোপালদা। সব জায়গায় গাড়ি রিজার্ভ পাচ্ছি, থাকবার জায়গা পাচ্ছি, নিশ্চিন্তে খেতে পাচ্ছি চার বেলা। বেড়ানোর মজা তেমন জমছে না।

হেসে বললুম: তোমার ভ্রমণ কাহিনীও তেমন জমবে না। লোকে বলবে বানানো গল্প।

তার ভ্রমণ কাহিনী লেখার বাসনা মামা আমাদের শুনিয়েছিলেন। আমি তাই তামাসা করবার সুযোগ পেলুম।

স্বাতি বলল: ঠাট্টা নয়। বেড়াতে বেরিয়ে কত লোকের কত দুর্ভোগ হয়। জায়গার অভাবে কাউকে রাত জাগতে হয় গাড়িতে, ঘুমোতে হয় ধর্মশালার বারান্দায়, কোনদিন খাবার হয়তো জুটলই না। তারপর মোটর বেগড়ানো, পথ ভুলে ঘুরে মরা, চুরি-ডাকাতি হাঙ্গামা হুজ্জৎ, কত কী!

মামী বললেন: বলিহারি শখ!

মামা বললেন: কথাটা স্বাতি মন্দ বলে নি। সব কিছুই রুটিন মাফিক হলে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি মনে হয় না। একটু ব্যতিক্রম দরকার।

বললুম: এখনও আমাদের অনেক পথ বাকি আছে।

মামী বললেন: দোহাই তোমাদের, বিপদ আর সাধ করে ডেকো না।

তাপ্তির কথা আমার মনে পড়ল। বিপদ সে সাধ করেই বরণ করছে। তার পিতার গৃহে সে নিরাপদ ছিল। সেখানে কেউ তাকে বিপন্ন করতে পারত না। নিজের ইচ্ছায় ঘর থেকে বেরিয়ে সে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছে। আমার মনে হয়, দেশ ছেড়ে চলে যেতেও সে দ্বিধা করবে না। হয়তো সে ঐ ফরাসী যুবকের সঙ্গে তারই দেশে গিয়ে পৌঁছবে। তার ভিতর আমি আগুনের শিখা দেখেছি। সে আগুন পোড়াবার আগুন নয়, সে আগুন আলোর সঙ্কেত। মাদ্রাজে গিয়ে সে যদি পাসপোর্ট সংগ্রহ করে, সে কথা শুনে আমি আশ্চর্য হব না। একই দিনে একই প্লেনে যদি তারা দুজনেই ফ্রান্সে চলে যায়, তাহলেও আমি চমকে উঠব না। তার স্বাধীন মুক্ত জীবনের তৃষ্ণা আমি দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি তার নারী-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। এরই জন্য তাপ্তিকে আমার ভাল লেগেছে।

গাড়ি ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। ইচ্ছে হল, একবার তাদের দেখে আসি। তারপরেই সেই বিশ্রী লোকটার কথা মনে পড়ল। জানি না এখন সে কী করছে! আমার অন্বেষণ, না তাপ্তির অনুসরণ! কিছু যে একটা করছে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাতি বলল: কী ভাবছ?

বললুম: নানা কথা।

বুঝি বলা যায় না?

এলোমেলো কথা বলতে নেই। লোকে পাগল ভাবে।

না বললেও ভাবে।

লোকের ভাবনার ওপর হাত থাকলে ভাবতে দিতুম না।

স্বাতি হেসে বলল : বড় সুবিধে হত তাতে, তাই না?

মামাও হাসলেন।

গাড়ি বুঝি দুলে উঠল।

১৮

ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেই তাপ্তিরা মাদ্রাজের ট্রেন ধরল। আমাদের ট্রেন রাতে। রাত্রিবাস করতে হবে না বলে স্থির হয়েছিল যে ওয়েটিং রুমেই মুখহাত ধুয়ে আমরা বেড়াতে বেরোব। মামা বাথ-রুমে ঢুকেছিলেন, মামী গিয়েছিলেন মেয়েদের ওয়েটিং রুমে। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে এসে নোটিশ দিলেন : নরককুণ্ড। মানুষ ওখানে ঢুকতে পারে না।

তর্ক অবান্তর। আমি উপর তলায় ছুটলুম রিটায়ারিং রুমের চেষ্টায়। ডাকাডাকি করে খবর পেলুম, স্থানাভাব। তাহলে কি কোন হোটেলে যেতে হবে ?

ওধারের ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, বয়সে প্রৌঢ়, বিলেতী পোষাক। ইংরেজীতে বললেন : কী হয়েছে ?

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, কিছু নয়। কিন্তু তার আগেই তিনি বললেন : জায়গা নেই ! আসুন আমার সঙ্গে।

বলে আমাকে এক রকম টেনেই নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। একটি বেডের ছোট ঘর। বললেন : এই নিন। আপনার জিনিস-পত্র কোথায় ? ওয়েটিং রুমে ? চলুন নিয়ে আসি।

কী আশ্চর্য ! চেনা নেই, পরিচয় নেই, কোন জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত নেই। এই ভদ্রলোক আমায় জোর করে ধরে এনে নিজের ঘরে স্থান দিচ্ছেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন : ও, ভয় হচ্ছে বুঝি ! আজকের দিনে তা কিছু আশ্চর্যের নয়।

বলে পকেট থেকে তাঁর কাগজপত্র বার করে বললেন : কান্তিনাথ, দিল্লীর বড় দপ্তরে ছোট চাকুরে।

তাঁর আইডেনটিটি কার্ড দেখে আরও বিস্মিত হলুম। রীতিমতো পদস্থ কর্মচারী, সাধারণ লোকের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। আমি তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখে আরও বিস্মিত হলুম। বললুম: ভয় নয়, আমার অন্য ভাবনা।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: আমার নিজের জন্যে কিছুরই প্রয়োজন নেই। সঙ্গে মামা মামী আছেন, তাঁদের মেয়ে আছেন।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত ভেবে বললেন: রাতে থাকবেন?

না।

তবে কুছ পরোয়া নেই। আমি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।

সে কী!

আসুন আমার সঙ্গে।

বলে হাত ধরে আমায় হিড় হিড় করে টেনে নামালেন। আমি তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে অভিভূত হলুম। মামা মামীকে রাজী করতে তাঁর একমুহূর্তও সময় লাগল না। কুলি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে সবাইকে উপরে তুলে আনলেন।

ভদ্রলোকের হাঁকডাকে বেয়ারা এল। তাকে বললেন: বাইরের বারান্দায় একখানা চেয়ার দাও।

মামী আমাকে বললেন: বাইরে বসবার কী দরকার! গোপাল একটু বুঝিয়ে বল না।

হিন্দীটা তিনি বুঝতে শিখেছেন, কিন্তু বলতে পারেন না। বাঙলায় বললে কান্তিনাথ বুঝবেন না। কাজেই আমার সাহায্যের দরকার। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললুম। ভদ্রলোক বললেন: আমার জন্যে আবার ভাবনা কেন! আপনারা আরাম করে বসুন, মুখ হাত ধোন। তারপর বেড়াতে যাবেন তো?

ঠিক বলেছেন।

হঠাৎ কান্তিনাথ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : ইস, আপনারা যদি কাল আসতেন তো কী ভালই হত !

কেন ?

কাল সারা দিন আমার কাছে একখানা গাড়ি ছিল। বেশ বড় গাড়ি। ব্যাঙ্গালোরের সব কিছু আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারতুম।

একটু ভেবে বললেন : আচ্ছা দাঁড়ান, একবার চেষ্টা করে দেখি। বলে ভদ্রলোক দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। মামা বললেন : গাড়ির জন্যে কেন ভাবছেন ! একটা ট্যাক্সি নিলেই তো হবে।

শুধু শুধু ট্যাক্সিকে কেন পয়সা দেবেন !

বলে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না, তরতর করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। মামীও এই সুযোগে কাপড় গামছা নিয়ে স্নানের জন্য গেলেন।

একখানা শোবার ঘরের ভিতর পাশাপাশি দুটো ছোট ঘর, তার একটায় স্নানের ব্যবস্থা। শোবার ঘরেই বসবার আসবাব— টেবিল চেয়ার আরামচৌকি। চারিধারে তাকিয়ে মামা বললেন : কী বুদ্ধি দেখ !

বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মামা বললেন : দেখতে পাচ্ছ না কাণ্ডখানা ? ঘরের ভেতর ঘর করেছে, কিন্তু দেওয়াল আধখানা। পুরো দেওয়াল তুললে যে দুর্গন্ধ আসবে না।

স্বাতি হেসে উঠল।

কান্তিনাথ যে এরই মধ্যে ফিরে এসেছেন আমরা জানতে পারি নি। বাহির থেকে বলে উঠলেন : আমার কাণ্ড দেখে হাসছেন তো !

স্বাতি লজ্জা পেল। আমি তাঁকে হাসির কারণটা বুঝিয়ে দিলুম।

কান্তিনাথ বললেন : আমাকে দেখে অনেকে হাসেন কিনা, তাতেই সন্দেহ হয়েছিল। যাক, গাড়ির ব্যবস্থা করে এলুম।

একটা ফ্যাক্টরি থেকে গাড়ি আসছে। তাদের কাছে আমার কাজ আছে, সেই কথা জানিয়ে দিলুম।

মামা আশ্চর্য হয়েছিলেন। ভদ্রলোক বললেন: সরকারের চাকরি করে এই ব্যবস্থাটুকু যদি করতে না পারি তো তিরিশ বছর কি ঘাস কেটেছি!

সত্যি কথা। লোকে জমিজমা কিনছে, ঘর বাড়ি তুলছে, চাকরি ছেড়ে অনেকে কলকারখানাও খুলছে। চোখে না দেখে থাকলেও লোকের মুখে শুনেছি, আর কাগজেও দেখছি কিছু কিছু। ইনি তো শুধু পরের গাড়ি চেয়ে নিচ্ছেন কয়েক ঘণ্টার জন্যে!

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন: কলকাতায় ব্যবসা আছে?

আমি মাথা নাড়লুম।

তবে?

ব্যবসাদারের চাকরি করি।

আমার কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: ফার্মের কেরানী।

কান্তিনাথ যে অনেকখানি মুষড়ে পড়লেন, আমার চোখে তা এড়াল না। ছি ছি করে উঠলেন না বটে, বললেন: আহা, আপনার মতো প্রমিসিং ইয়ং ম্যান পেলে সরকার বর্তে যেত।

স্বাতি চেয়ে দেখল, মামী ঘরে নেই। বলল: ডুবে যেত বলুন।

কান্তিনাথ রহস্যটা বোঝেন নি। স্বাতি বুঝিয়ে বলল: গোপালদা যাতে হাত দেয়, তাই তো ডুবে যায় দেখছি।

বুঝেছি বুঝেছি।

বলে কান্তিনাথ হেসে উঠলেন।

আমি নিচের ওয়েটিং রুম থেকে তৈরি হয়ে এলুম। স্বাতি উপরেই তৈরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে কান্তিনাথ মামার সঙ্গে জমিয়ে

বসেছেন। নিজের নোটবুকে কিছু টুকে রেখে বললেন: আমার গরিবখানায় আপনার পায়ের ধুলো না পড়লে আমি ভারি দুঃখিত হব। এই যে গোপালবাবু এসে গেছেন দেখছি! চলুন, এবারে চায়ের চেষ্টা করি।

স্বাতির জন্য আমাদের বেশি দেরি করতে হল না। দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক চাবিটা আমার হাতে দিলেন। বললেন: এটা আপনিই রাখুন। যা দেশকাল, ফিরে এসে যদি দেখেন সব ফাঁক হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই ভাববেন, হতভাগা কান্তিনাথের কারবার। তা না হলে—

চলতে চলতেও ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন: রেলের চাবিতে বিশ্বাস নেই। সঙ্গে তালা আছে আপনার?

বলে মামীর দিকে তাকালেন।

মামী বললেন: আছে।

তবে তাই দিন।

দরজায় মামীর তালা পড়ল, চাবিও উঠল মামীর আঁচলে। নিশ্চিন্ত মনে কান্তিনাথ বললেন: আর আমার ভাবনা নেই।

রিফ্রেশমেণ্ট রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কান্তিনাথ বললেন: আমি আর কেন, আপনারা খেয়ে নিন। ব্রেকফাস্ট আমি সকাল বেলাতেই সেরে নিয়েছি।

মামা বললেন: এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়! আসুন আসুন, আপনাকেও কিছু খেতে হবে।

এক পেয়ালা চায়ের বেশি কিন্তু আর কিছু না।

আমাদের একটা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে কান্তিনাথ বেয়ারাকে ডেকে আনলেন মামার কাছে। মামা বললেন: কী খাবেন?

আমার জন্য কেন ভাবছেন! আপনারা কী খাবেন বলুন।

মামা পাঁউরুটি মাখন আর ডিমের ফরমাশ করে কান্তিনাথের দিকে চাইলেন। কান্তিনাথ বেয়ারাকে বললেন: কুছ নহী। ওঁদের চা থেকে আমি এক পেয়ালা ঢেলে নেব।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। তাকে আবার ডেকে বললেন: দাঁড়াও দাঁড়াও, বেশি চায়ে আবার লোকসান করতে পারে। তার চেয়ে তুমি এক প্লেট পরিজ দাও।

পরিজ এল, রুটি মাখন ডিম। তারপর চা। গল্প করতে করতে কান্তিনাথ দ্বিতীয়বার ব্রেকফাস্ট করলেন।

ব্যাঙ্গালোর স্টেশনটি আমাদের ভারি ভাল লাগল। এক ধারে বড় লাইন, আর এক ধারে ছোট লাইন। মাঝখানে স্টেশন। শহর থেকে আসতে হলে ওভারব্রিজের উপর দিয়ে স্টেশনে নামতে হয়। ভিতরে মোটরও আসে। বড় লাইনের প্ল্যাটফর্মের ধারে অনেক গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে—মোটর ট্যাক্সি আর অটো রিক্স। এই গাড়িগুলো আজকাল খুব চলছে। মোটর বাইকের মতো গাড়ি, পিছনে দুটো চাকা। দুজন মানুষ স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। কান্তিনাথের সঙ্গে আমরা এইখানে এলুম। তাঁর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি গাড়িও চেনেন না, ড্রাইভারও না। কিন্তু খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করে ফেললেন। হিন্দীতে কিছু কথাও বলে নিলেন। তারপর আমাদের সবাইকে ঠেলে তুলে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজেরই বসবার জায়গা রইল না। আমি সামনে বসেছিলুম, বললুম: এবারে

কুছ পরোয়া নহী, একটু সরে বসুন তো!

বলে আমাকে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কান্তিনাথ হেসে বললেন: ডাকাতি রাহাজানির ভয় পাবেন না। শহরটাই দেখিয়ে দেব। দেখবার আর কী আছে?

লালবাগ আর কুব্বন পার্ক, তার ভিতর সরকারী অফিস। গোটাকতক বড় রাস্তা আর বাজার।

আপনার দেরি হয়ে যাবে না?

দেরি! আমি এমন কেউ-কেটা লোক নই যে দু ঘণ্টা আপনাদের সঙ্গে ঘুরলে আমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথ ধরে আমরা লালবাগে এলুম। বিরাট বাগান, তার ভিতরে মোটরের রাস্তা। গাড়ি থেকে নামবার প্রয়োজন নেই, তবু আমরা এক জায়গায় নামলুম। কান্তিনাথ বললেন: এইখেনটাই সব চেয়ে ভাল মনে হচ্ছে। এই কাচের ঘর, আর এই ফোয়ারা।

স্বাতির খুব বেশি ভাল লাগল না। বলল: এত বড় বাগানে কোথাও ফুল দেখছি নে কেন!

সত্যি কথা। বড় বড় গাছে চারি দিকটা ছেয়ে আছে। মাঠের ঘাস বেড়ে উঠেছে অযত্নে। ফুলের বেড এখনও তৈরি হয় নি। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্ত শুরু হয়েছে অনেক দিন। এখন তো ফুলের চাষে শৌখিনরা মেতে উঠেছে। এখানে গরম নেই, সকালে একটু ঠাণ্ডাই ছিল। এই আবহাওয়ায় শীতের ফুল ফোটানোও বোধ হয় সম্ভব হত।

স্বাতির কাঁধে ক্যামেরা ছিল। কান্তিনাথ বললেন: আমাদের একটা ছবি তুলুন।

বলে আমার হাত ধরে ফোয়ারার কাছে টেনে আনলেন। মামা মামীকেও ডাকলেন।

স্বাতি বলল: গোপালদাকে ছেড়ে দিন। ওর ছবি বড্ড বিশ্রী ওঠে।

বিশ্রী লোকের ভাল ছবি কী করে উঠবে বল!

আমি সরে দাঁড়াচ্ছিলুম, কিন্তু কান্তিনাথ আমায় টেনে রাখলেন। স্বাতি আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

কুব্বন পার্কের ভিতর এ রাজ্যের সমস্ত সরকারী অফিস। বিরাট জায়গা জুড়ে এই অফিসগুলো। অনেকদিন পরে খবরের কাগজে গল্প পড়েছিলুম বিধান সৌধের। কত অর্থের অপব্যয় হয়েছে আর প্রধান মন্ত্রী কেন পদত্যাগ করলেন, সেই খবর। এ সব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নি। কান্তিনাথ বললেন: এবারে কোথায় যাবেন?

তা জানি নে।

আমিও যে কিছুই জানি নে। আচ্ছা, এক কাজ করি। বাজারের ভেতর আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাই। বাজারটা দেখে আপনারা ফিরুন। বিকেল বেলায় আর কারও গাড়ি ধরব।

মামা বললেন: আবার গাড়ি কেন! একটা ভাল জায়গায় আমাদের নামিয়ে দিন। আমরা সব দেখে শুনেই ফিরব।

আমরা বাজারে নেমেছিলুম। খানিকটা হেঁটেই মামী ক্লান্ত হয়ে বললেন: আর হাঁটতে পারি নে বাবা। এবারে ফেরো!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: আমাদের ব্যাঙ্গালোর দেখা হয়ে গেল!

ইচ্ছে করেই আমি উত্তর দিলুম না। মামা বললেন: এ তোমার কান্তিনাথের কর্ম নয়। গোপাল না দেখালে দেখাটাই যেন জমছে না।

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি কৌতুক দেখলুম। আর আমাকে নীরব দেখে মামা আবার বললেন: একখানা ট্যাক্সি ধর না, আমরা উঠে বসি। তারপর তুমি আমাদের ভার নাও।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছিলুম যে হাঁটতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। লোকে ভাবে এমন সরল সুন্দর রাস্তায় কেন কষ্ট হবে। হয়তো বলবে, এতটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু মামা মামীকে দেখবার পর আমি এ কথা বলি না। তাঁদের পায়ে হাঁটার অভ্যাস নেই, কষ্টের ভিতর ভান নেই এতটুকু। তবে এই অক্ষমতার জন্য

মায়া হয় তাঁদের উপর। নিজেদের কত অশক্ত কত পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছেন!

খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি একখানা ট্যাক্সি ধরে ফেললুম। গাড়িতে উঠে মামীই প্রথম কথা কইলেন। বললেন: এবারে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে।

কেন বল তো?

যাই বল, অমন গায়ে-পড়া ভাব আমার ভাল লাগে না।

ভাল না লাগলে চিন্তার কী আছে!

তোমার তো কিছুতেই চিন্তা নেই। ওর অমন মাথাব্যথা কিসের বল তো!

ব্যস্তভাবে আমি বললুম: দিল্লীর বড় অফিসার। আমি তাঁর কাগজপত্র দেখে নিয়েছি।

দিল্লীর বড় অফিসারের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আমাদের সঙ্গে নাচতে বেরোবে! ও সব কাগজপত্র তো অন্যেরও হতে পারে, জালও হতে পারে। যা করেছ করেছ, সন্ধ্যেবেলায় আর ওর গাড়িতে চোড়ো না।

মামা কিছু মর্মাহত হলেন, বললেন: মানুষকে তুমি বড় বেশি সন্দেহ কর।

ত্রিচিনপল্লীর ঘটনা আমার মনে পড়ল। মামীর এই সন্দেহের জন্য ড্যানিয়েলের উপর কী অবিচার আমরা করেছি। সে ভদ্রলোক বোধ হয় কোন দিন আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন না। অন্তত তাঁর দীর্ঘ দিনের বিশ্বাসে যে গভীর আঘাত লেগেছে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

মামী বললেন: অকারণে সন্দেহ করি না।

পিছন থেকে স্বাতি জানতে চাইল: এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ড্রাইভারের সঙ্গে আমি সে কথা ঠিক করে নিয়েছিলুম। সে

আমাদের ক্যান্টনমেন্টের দিকে নিয়ে যাবে। সেখানে কমার্সিয়াল স্ট্রীট আর রাসেল মার্কেট। মামীকে একবার ভাল একখানা শাড়ির দোকানে পৌঁছে দিলেই এ জায়গাটা তাঁর ভাল লেগে যাবে। বলে দিয়েছিলুম, আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে আর বড় বড় বাড়িগুলো চিনিয়ে দেবে। কিন্তু স্বাতির কাছে সত্য কথাটা আমি ভাঙলুম না, বললুম: দেখি, কোথায় গিয়ে পৌঁছই।

সহসা স্বাতি বলল: আচ্ছা গোপালদা, ব্যাঙ্গালোর নামটা কেন হল?

আমার ভাগ্য ভাল যে একটা গাইড বইএ এ নামের কথা দেখেছিলুম। তাতে গল্পটা বলে নি, কিন্তু একটা গল্প যে আছে তা জানিয়েছে। বললুম: ব্যাঙ্গালোর কথাটার মানে হল সেদ্ধ বীনের শহর। বীন ইংরেজী কথা, মানে শিম বরবটি জাতীয় সব্জি। সে সব রাজা-রাজড়ার পুরনো গল্প, তোমার বিশ্বাস হবে না।

গল্পটা শুনতে চাইলেই মুস্কিল। স্বাতি আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছে। বলতে না পারলেই হার। কিন্তু স্বাতি যতটুকু শুনেছিল তাতেই প্রচুর আশ্চর্য হল। ব্যাঙ্গালোরের মতো একটা নামের যে কোন মানে থাকতে পারে এ তার বিশ্বাস হল না। বলল: বানিয়ে বলছ না তো!

বললুম: তৈরি করে কিছু বলতে অনেক বেশি ক্ষমতার দরকার। সাহিত্যিকদের দেখ, প্রায় সব কথাই তাঁরা বানিয়ে বলেন, অথচ সবাই সব সত্যি ভাবে।

আমি তা ভাবি নে। এত যে বই পড়ছি, সবই তো গল্প বলেই মনে হয়।

সেই জন্যেই তো আমার সত্যি কথাটাও গল্প বলেই মনে হয়েছে। এ শহরে পুরনো কিছুই নেই, তাইতেই তো বিপদে পড়েছি। শুধু একটি দুর্গ আছে। চারশো বছরেরও বেশি তার বয়স। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্পে গৌদা নামে এক সর্দার এখানে কাদার একটা দুর্গ

তৈরি করে শহরের চার সীমায় চারটি চৌকিঘর করে এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিল। দুশো বছর পর হায়দর আলি সেই দুর্গ পাথরে তৈরি করেন, আর টিপু সুলতান তার আরও উন্নতি করেন। মুসলমান স্থাপত্যের এই একটি মাত্র নিদর্শন আছে এই শহরে।

ততক্ষণে আমরা কমার্সিয়াল স্ট্রীটে পৌঁছে গেছি। দুধারে চমৎকার দোকান। মামী বললেন: একটু দাঁড়ালে হয় না?

আর কোন কথা নয়। আমি একখানা শাড়ির দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলুম।

গাড়ি থেকে নামবার সময় মামা বললেন: তোমার মনে কি এই ছিল গোপাল?

আড়ালে আমি স্বাতিকে বললুম: কলকাতার কাজ কমিয়ে রাখছি। ফিরেই তো বিয়ের বাজার করতে হবে!

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে স্বাতি আমার দিকে তাকালো। কোন উত্তর দিল না।

এখানে কয়েক রকমের শাড়ির খুব প্রচলন দেখলুম। মাইসোরের খাঁটি সিল্ক, কলে বোনা ও তাঁতে তৈরি দুরকমই আছে। রঙ একটু গাঢ়, পাড়ে ও আঁচলে জরি আছে, কিন্তু নানা রঙের সুতোয় ঝকঝকে নয়। সরুপাড় ও পাড়হীন শাড়ির নাকি বেশি চল। এ ছাড়া কলের জর্জেট ও ক্রেপ শাড়ি আছে নানা জাতের। রঙের যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি পাড় ও আঁচলের বাহার। স্বাতি বলল: এসব পুরনো হয়ে গেছে।

নূতনত্ব দেখা গেল নকল সিল্কের শাড়িতে। কিন্তু মামীর পছন্দ হল মাইসোর সিল্ক। কলে বোনার দাম একশো টাকার বেশি, কিন্তু তাঁতের জিনিস পঞ্চাশ ষাট টাকাতেই পাওয়া যাচ্ছে। রঙ কিছু গাঢ় বলে স্বাতির আপত্তি ছিল, মামী মানলেন না, বললেন: তবে কি আমার বয়সে এ সব পরবি?

এই সঙ্গে ব্লাউস পিসও। দশ থেকে কুড়ি টাকা দাম। বার গিরের টুকরো তারা কেটে রেখেছে। হোক বেশি বহর, তবু আমাদের দেশের দর্জি ও কাপড়ে ব্লাউস কাটতে বোধহয় পারবে না। এক গজ কাপড় থান কেটে নেয়া যায়, সে সবই এক রঙের। জরির কাজ করা ঝকঝকে কাপড় চৌদ্দ গিরের টুকরো পাওয়া গেল দুএকটা। মামী তাই নিলেন। এখন এ সব সেকেলে হিসেব হয়েছে। গিরের বদলে হয়েছে সেন্টিমিটার। ব্লাউসের মাপও অনেক ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু দাম হয়েছে আকাশ ছোঁয়া। এ সবও লোকে খুশী মনে কিনছে। গাড়িতে উঠে মামা বললেন: এখানে আর কী পাওয়া যায় গোপাল?

বললুম: চন্দনের আর হাতির দাঁতের জিনিস, আতর—

আমি শেষ করবার আগেই মামা বললেন: ওসব তো মাইসোরে ভাল ছিল।

তারপরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমাদের বেলার খেয়াল কিছু আছে?

মামা যে বিরক্ত হচ্ছিলেন তা তাঁর কথায় বুঝতে পারছি। তাই তাঁকে খুশী করবার জন্য বললুম: স্টেশনে আমাদের একটা জরুরী কাজ বাকি আছে।

কী কাজ?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: রাতের গাড়িতে জায়গা আছে কিনা দেখে বেরনো হয় নি। জায়গা না পেলে ভারি কষ্ট হবে।

চিন্তিত ভাবে মামা বলে উঠলেন: না না, সে রকম দেখলে কাল দিনের গাড়িতে ব্যবস্থা কোরো।

মামী বললেন: রাতের ব্যবস্থা কী হবে?

আর একটা ঘর কি পাওয়া যাবে না!

বলে মামা আমার দিকে তাকালেন।

দুশ্চিন্তা নিয়ে আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। রিজার্ভেশন অফিসে গিয়ে জানলুম যে সত্যিই রাতের গাড়িতে জায়গা নেই। পরের দিন সকালের গাড়িতে ব্যবস্থা হল। কিন্তু রাতে আমরা থাকব কোথায়?

খবর নিয়ে জানলুম যে শহরে অসংখ্য দেশী ও বিলেতী হোটেল। ভাল রেস্তোরাঁও আছে অনেক। ইয়ুথ হস্টেল আর ধর্মশালাও আছে। আরও খবর পেলুম যে এখান থেকে বাসে আশপাশের সমস্ত দর্শনীয় জায়গা দেখার ভাল ব্যবস্থা আছে। বাসে শুধু ব্যাঙ্গালোর শহর নয়, মাইসোর পর্যন্ত সব কিছু দেখে আসা সম্ভব। মহাত্মা গান্ধী রোডে টুরিস্ট অফিসে গেলেই সব খবর পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত স্টেশনেই রিটায়ারিং রুমের আশ্বাস পাওয়া গেল। কান্তিনাথের ঘরখানা তো খালি হচ্ছে, রাতের দিকে আরও একখানা ঘর খালি হবে। সমস্ত ব্যবস্থা আমরা পাকা করে ফেললুম।

২০

খেয়ে দেয়ে মামা মামী বিশ্রাম করবেন। আমি ভেবেছিলুম যে ত্রিচিনপল্লীর মতো স্বাতির সঙ্গে আমি স্টেশন দেখব, কিংবা গল্প করব কোথাও কাছাকাছি বসে। সেবারে সে নিজেই আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল, এবারে সে-ই আপত্তি করল। বলল: আমিও এই ঘরে থাকব।

ঘরে থাকব বললেই থাকা যায় না। একখানা ছোট খাট, আর একখানা আরাম চৌকি। সারা দুপুর কাঠের চৌকিতে বসে থাকার কোন মানে হয় না। বিব্রত ভাবে মামা ঘরের চারি দিকে চাইলেন। আমি বললুম: লেডিজ ওয়েটিং রুমে ভাল চেয়ার আছে।

মামী স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন। স্বাতি বলল: সেইখানেই ভাল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বাতি বলল: তুমি লেডিজ ওয়েটি রুমের নাম কেন করলে?

আমার সঙ্গে থাকতে তোমার আপত্তি আছে দেখে।

কে বললে আপত্তি আছে?

ত্রিচিনপল্লীর কথা তো ভুলে যাই নি।

কী করেছিলাম সেখানে?

আমাকে টেনেছিলে।

হাত ধরে?

হাত ধরে টানার কি আর জোর আছে! তোমার টান ছিল আরও শক্ত—

স্বাতি বোধহয় ভয় পেয়েছিল, আমি কোন আলগা কথা বলে ফেলব। তাই তাড়াতাড়ি বলল: বুঝেছি।

তবেই দেখ, এবারে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখছ। কেন রাখছ, তাও জানি।

ছাই জানো।

বলব ?

বলতে হবে না।

আমি যে জানি, সে কথা তুমিও জানো দেখছি। খুশী হলুম।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে স্বাতি বলল: লেডিজ ওয়েটিং রুমটা কোন্‌দিকে ?

চল, পৌঁছে দিচ্ছি।

তুমি কোথায় থাকবে ?

এখানে তোমার মালঞ্চ তো নেই যে মালাকর হব, দরজার পাশে প্রহরী হয়েই থাকব।

তামাসা ভাল লাগে না।

তবে কী করব বল !

চল এই স্টেশনটা ভাল করে দেখি।

হেসে বললুম: তাই দেখি চল।

হাসলে যে ?

সত্যি কথা বললে যদি রাগ না কর, তবেই বলি।

সত্যি কথা তোমায় বলতে হবে না।

ভয় নেই, কোন অসম্মানের কথা বলব না।

স্বাতি আর আপত্তি করল না। বললুম: একটা মনের আয়নায় আর একটা মনের ছায়া একবার পড়েছিল। মন টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও সে ছায়া কোন দিন মুছে যাবে না।

কেন ?

এই নিয়ম। এই লোহা লক্কড় ধোঁয়া ধুলো আর ইঞ্জিনের শব্দের ভেতর আমার কথাটা হয়তো বেয়াড়া শোনাবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায়

লালবাগে কিংবা বৃন্দাবন গার্ডেনে তা মনে হবে না। ফাঁকি থাকলে তো ফাঁক থাকবে!

তোমার কথা আজ হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে।

সহজ ভাবে বললে তুমি লজ্জা পাবে।

পাব না।

সেই লজ্জাতেই তো তুমি আমার সঙ্গে আসছিলে না!

আমি লজ্জাবতী লতা নই যে তোমার কথাতেই বুজে যাব।

তবে কি আমি ছুঁলে তুমি পাপড়ি মেলবে?

সে উত্তাপ কি তোমার আছে!

আগুনের উত্তাপে হল্কা লাগে, দেহ ঝলসে যায়। পাপড়ি মেলার উত্তাপের জন্যে তার সারা রাত্রির সাধনা।

তুমি কবিতা লেখ না কেন গোপালদা?

তোমার বিয়ের পরে লিখব।

অত দিন অপেক্ষা করে থাকবে?

অঘ্রাণের আর দেরি নেই। জামাকাপড়ও তো কেনা হয়ে গেল!

স্বাতি হাসল। আমি গভীর ভাবে তাকিয়েও সেই হাসির অর্থ খুঁজে পেলুম না। বিষণ্ণ তো নয়! তবে কি কৌতুক প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কোনখানে! বলল: কোথাও বসবে না?

বসবার জায়গা আপাতত একটাই দেখছি—ওয়েটিং রুম। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারারা নিশ্চয়ই বিশ্রাম করছে। সেখানে ঢুকলে তারা বিরক্ত হবে?

কাজেই আমরা ওয়েটিং রুমে এসে কোণের দিকের দুখানা চেয়ার দখল করে পাশাপাশি বসলুম। স্বাতি বলল: এইবারে তোমার হেঁয়ালির মানে বল।

প্রসঙ্গটা সে ভোলেনি দেখে আমি খুশী হয়ে বললুম: কার্তিকের মতো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে

এল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজকন্যা তাকে দেখছিল। বলে উঠল, রাজপুত্তুরের পা যে খোঁড়া, পক্ষীরাজের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না! রাজবৈদ্য দেখে বললেন, সর্বনাশ, পায়ে কুষ্ঠ হয়েছে, নিচে থেকে পচছে।

আর্ত স্বরে স্বাতি বলল: কী বলছ এ সব?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললুম: উল্টো ধার থেকে একটা জোয়ান আসছিল চাষাড়ে গোছের, শক্ত সমর্থ সবল চেহারার পুরুষ। দুপদাপ করে নেমে পড়ল তেপান্তরের মাঠে। কী করে পার হবে! তার পক্ষীরাজ কোথায়! নাই বা থাকল। সুস্থ দেহ আছে, সাহসী মনও আছে। তেপান্তরের মাঠ কি সে পেরোতে পারবে না! দেখতে পেয়ে রাজা বলল, সাবাস। রাণী বলল, ওর একটা পক্ষীরাজ নেই! আর রাজকন্যা কী বলল বল তো?

লোকটা বেদম বোকা।

ঠিক বলেছ। রাজকন্যা অমন করে চেয়ে আছে, অথচ লোকটা তাকে দেখতেই পেল না!

রাজকন্যার যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই।

তবে বোকা বললে কেন?

একটা পক্ষীরাজ ঘোড়ার পাশ দিয়ে গেল, খোঁড়ার কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিতে পারল না!

রাজপুত্রের সেপাই শান্ত্রী যে বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছিল, হাত বাড়ালেই পেট ফুটো করে দিত।

স্বাতি বলল: হুঁ।

সেই সঙ্গেই যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম। স্বাতি কি দুঃখ পেল! হেসে বলুলম: লোকটা বড়ই বেরসিক। রাজকন্যার দিকে একবারটি তার চাওয়া উচিত ছিল। কী বল?

চায় নি আবার! খানিকটা এগিয়েই সুড় সুড় করে আবার ফিরে আসবে।

তারপর—

আজ তোমার কি আর কিছু বলার নেই?

না।

আমার কী মনে হচ্ছে জানো? তুমি নিশ্চয়ই আজ কোন নেশা করেছ।

আজ নয়, দিন কয়েক আগে। মনে হচ্ছে, এ নেশার ঘোর সহজে কাটবে না।

প্রহারে সব নেশাই ছুটে যায়। তোমার তাই দরকার হয়েছে। বাবাকে বলব

কেন নেশা হল সেটাও বুঝিয়ে বোলো।

তুমি বোলো।

তাহলে মামা উল্টো বুঝবেন। ভাববেন, তাঁর মেয়েই নেশা করেছে।

স্বাতি উঠে দাঁড়াবার ভান করে বলল: আমি চললাম।

যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়! তার চেয়ে এস, আমরা অন্য কথা বলি।

স্বাতি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বলল: আর কোন দিন তোমার সঙ্গে বেরোব না।

তারপর আমাকে হাসতে দেখে বলল: কান্তিনাথকে তোমার কী রকম মনে হয়?

পাকা লোক। বিনে পয়সায় ও সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে। ও যদি আমাদের সঙ্গী হয়, তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।

আর কিছু তোমার মনে হয় নি?

আর কী মনে হবে!

তবে থাক। আমার ধারণার কথা তোমার ওপরে চাপাব না। তোমার নিজের কিছু মনে হলে বোলো।

তথাস্তু।

বাহিরে মনে হল, কান্তিনাথের গলা শুনতে পেলুম। কাউকে ধমকাচ্ছেন। আমার সঙ্গে স্বাতিও উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে দেখি সত্যি কান্তিনাথ। চটে মোড়া বড় বড় দুটো বোঝা কুলির মাথায় চাপিয়ে উপরে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে বলছেন। কুলি দুটো বুঝতে পারে নি বলেই দাঁড়িয়ে বকুনি খাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন: এই যে গোপালবাবু, দুখানা কার্পেট কিনেছি। আপনাদের ঘরে কোথাও রাখিয়ে দিন না। আমি এখুনি আসছি।

বেশ তো।

বলে আমরা দুজনে কুলিদের সঙ্গে উপরে এলুম। মামা তখন ঘুমিয়ে উঠে পাইপ ধরাচ্ছেন, মামী শুয়ে আছেন। ঘরের ভিতর স্থানাভাব, তবু কোন রকমে কার্পেট দুটো রাখা হল। স্বাতি মামাকে বোঝাতে লাগল যে জিনিস আমাদের নয়, এ কান্তিনাথের। আর আমি তাঁর দেখা না পেয়ে নিজের পকেট থেকেই কুলির পয়সা বার করে দিলুম।

কান্তিনাথ এলেন অনেকক্ষণ পরে। বললেন: ঘরের বাইরে বেরোলে সব দিকে সমান নজর দরকার।

মামা বললেন: তা দরকার বৈকি।

আপনাদের রিজার্ভেশনটাও দেখে এলুম। আজ রাতের বদলে কাল সকালে করেছেন দেখলুম। বলে এলুম যে চাকার ওপরের গাড়ি যেন না দেয়। একে ছোট লাইনের গাড়ি, তাতে চাকার ওপরে হলে রাতে একেবারেই ঘুমোতে পারবেন না।

মামা অভিভূতের মতো আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম: এ একটা নতুন শিক্ষা দিলেন।

হাসতে হাসতে কান্তিনাথ বললেন: চা খেয়েছেন?

কোথায় আর খেলুম!

কান্তিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: এইখানেই পাঠিয়ে দিই। চায়ের সঙ্গে আর কী দেবে? কাটলেট?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বেরিয়ে গেলেন। মামা আর একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কান্তিনাথ একটু দেরিতেই ফিরলেন। সঙ্গে দুজন বেয়ারা। তারা চা এনেছে। মামা ব্যস্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ভদ্রলোক বললেন: গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চা খেয়ে আমরা বেড়াতে বেরোব।

মামী উঠে পড়েছিলেন, বললেন: ওমা, এত সব কে খাবে!

বলে কান্তিনাথকেই প্রথমে এগিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক যেন শিউরে উঠলেন। বললেন: না না, আমাকে না। আমার দুপুরের খাওয়া আজ বেশি হয়ে গেছে।

তারপর খাওয়াটা কেন বেশি হল, সেই গল্প আমাদের শোনালেন। যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানকার বড় সাহেব তাঁকে লাঞ্চে ডেকেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর এক পুরনো বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। বড় হোটেল, প্রচুর খাদ্য। অথচ বন্ধুটি যে ডিস্‌পেপ্‌-সিয়ার রোগী, তা তাঁর জানা ছিল না। কাজেই—

চা তৈরি করে স্বাতি কান্তিনাথকেই প্রথমে দিল। ভদ্রলোক নির্লিপ্তভাবে বললেন: আবার চা! চা বড় লোকসান করে।

স্বাতি কাটলেটের প্লেটও একখানা এগিয়ে দিল।

খেতে খেতে কান্তিনাথ কার্পেটের গল্প আমাদের শোনালেন। ব্যাঙ্গালোরে ভাল কার্পেট তৈরি হয়। সস্তাও বেশ। তাঁর মেয়ের ফরমায়েশ ছিল। মেয়ে-জামাই বড় শৌখিন। তাই ভাল জিনিসই কিনতে হয়েছে।

মামীর যে আরও কিছু জানবার ইচ্ছে হয়েছে, তা তাঁর মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় কিনলেন?

দোকানে নয়, একেবারে ফ্যাক্টরি থেকে। আমার বন্ধুটিই জুটিয়ে দিলেন। বাজারের চেয়ে অনেক সস্তা পড়ল।

কী রকম?

এই ধরুন, দুশো টাকার কমে আমি যা নিলুম, বাজারে তার দাম আড়াই শো টাকার বেশিই হবে।

সাইজ?

নয় বাই বারো।

তার পরেই যোগ করলেন: কিছুদিন পরে দেখবেন, দু হাজারেও এ সাইজের কার্পেট পাবেন না।

গল্পে গল্পে কান্তিনাথ কাটলেটের প্লেটখানা শেষ করে ফেললেন। তিনখানা কাটলেট। সঙ্গে দু পেয়ালা চা।

কিন্তু মামী রসভঙ্গ করলেন। কিছুতেই বেরোতে রাজী হলেন না। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে মামাও জোর করতে সাহস পেলেন না। হতাশ ভাবে কান্তিনাথ বললেন: গাড়িটা তবে ছেড়েই দিই।

মামা আমাকে বললেন: ড্রাইভারকে কিছু বকশিশ দিয়ে দিও।

না না, সে আমার কাজ, আপনাদের নয়।

বলে কান্তিনাথ বেরিয়ে গেলেন।

স্বাতি আমাকে ইশারা করল। বুঝতে পারলুম যে তাঁকে লক্ষ্য করবার দরকার আছে। নিঃশব্দে আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম।

কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠ ভাবে ড্রাইভারের কাছে গেলেন, তার পিঠে হাত রেখে কিছু বললেন, তারপর দরজা খুলে ভিতরে বসিয়ে দিলেন।

গাড়ি চলে যাবার পর ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে পায়চারি করতে লাগলেন। ভাবলুম এবারে ফিরে যাই, কিন্তু পা আমার সরল না। চোখের দৃষ্টি তাঁরই দেহে আটকে রইল। কান্তিনাথ একবার তাঁর নোটবুক বার করলেন পকেট

থেকে। কী যেন দেখলেন, মনে হল হাসলেনও একটুখানি। কিন্তু স্টেশনে ফিরলেন না।

এক সময় অন্ধকার হল। স্টেশনের বাতি উজ্জ্বলতর হল। ভদ্রলোক ফিরলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে উপরে এলুম।

মামা ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না। কান্তিনাথ বললেন: রাতে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। আর একখানা ঘর পাবেন।

মামী বললেন: এ রকম ঘর নয় তো?

বাঙলায় প্রশ্ন করেছিলেন আমার দিকে চেয়ে। আমি তাঁর উত্তর দিলুম বাঙলায়: এ রকম হলে কোন হোটেলে গিয়ে উঠব।

মামী বোধহয় কিছু আশ্বস্ত হলেন।

এই কান্তিনাথের সঙ্গে আমরা আর অল্প সময় আছি। রাত নটায় উনি ম্যাড্রাস মেলে উঠবেন। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে চড়ে দিল্লী দুদিনের পথ। আমরা আজ এইখানে থাকব, কাল সকালের ট্রেনে আমাদের হায়দ্রাবাদ যাত্রা। সময় মতো নিচে নেমে আমাদের খেয়ে নিতে হবে। কান্তিনাথই সময় মতো আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তাঁর কথা শুনে মামা বললেন: ও ল্যাটা চুকিয়ে ফেলাই ভাল।

মামী বললেন: তোমরা গেলো।

এ রাগের কথা। কারণটা স্বাতি বোধহয় অনুমান করেছে। তাই মুখ টিপে হাসল।

কান্তিনাথ বললেন: আর দেরি করবেন না। স্টেশনের ব্যাপার তো।

টেবিলে বসে মামা বললেন: আপনি কী খাবেন বলুন?

না না, আমাকে আর খেতে বলবেন না। আমি তাহলে মরে যাব।

সে কি কথা! কিছু একটু খান।

ভদ্রলোক আর আপত্তি করলেন না, বললেন: নিতান্তই যখন বলছেন, তখন একটু স্যুপ, আর এক পেয়ালা কফি।

কান্তিনাথের স্যুপ এল, তারপর চিকেন রোস্ট আর ফ্রাইড ফিশ। পুডিংএর পর দু পেয়ালা কফি খেয়ে ডিনার শেষ করলেন।

মামী আজ দূরে বসে ছিলেন। তাঁর ক্ষিধে নেই। মামা বলেছিলেন: টেবিলে মুর্গি উঠেছে, ক্ষিধে আর কী করে হয় বল।

তিনি খেতে বসলে আমরা নিশ্চয়ই মুর্গি খেতুম না।

কান্তিনাথের ইচ্ছায় তাঁর মালপত্র আমিই উপর থেকে নামালুম। রিজার্ভেশনের চার্ট দেখে তুলে দিলুম তাঁর গাড়িতে। কিন্তু ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পেলুম না। শেষ পর্যন্ত কুলির পয়সা আমিই মিটিয়ে দিলুম। তার পরেই দেখতে পেলুম তাকে। গাড়িতে ক্লিট দেবার জন্যে একজন লোক ধরতে গিয়েছিলেন। তাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরছেন।

খুব আস্তে আস্তে স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: ভদ্রলোক শুনেছিলুম সরকারের পদস্থ কর্মচারী!

ঠিকই শুনেছ। চাবির রিঙে একটি মোহরের মতো চাকতি আছে। বোধহয় রেলওয়ে বোর্ডের অফিসার। ঘরের ভাড়াও লাগছে না, গাড়িভাড়াও...

স্বাতি হেসে উঠতে পারল না। তার সেই চেষ্টায় আমি বেদনার সঙ্কেত পেলুম।

২১

ব্যাঙ্গালোর একটা অদ্ভুত জংশন স্টেশন। শুধু বড় লাইন নয়, ছোট লাইন আছে দু রকমের। মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ। যে সব ছোট গাড়ি পাহাড়ে ওঠে, তাও আছে ব্যাঙ্গালোরে। এখান থেকে ম্যাড্রাস পর্যন্ত বড় লাইন। খানিকটা দূরে বঙ্গারাপেট জংশন। ব্যাঙ্গালোর থেকে বঙ্গারাপেট পর্যন্ত একটা খেলনার মতো গাড়ি খানিকটা ঘুরে কোলারের সোনার খনির উপর দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। এ ছাড়াও আরও তিনটে দিক আছে—মাইসোরের দিক, পুণার দিক আর সেকেন্দ্রাবাদের দিক। এই লাইনগুলো শিরার মতো দক্ষিণ থেকে উত্তরে উঠেছে। আমরা উত্তরে যাব সেকেন্দ্রাবাদের দিকে।

সকালের চা শেষ করে মামা পাইপ ধরালেন। বললেন: গোপাল খুব ফাঁকি দিচ্ছ।

ফাঁকি দিচ্ছি!

দিচ্ছ না! ঐ কান্তিনাথকে এগিয়ে দিয়ে নিজে কিছুই করলে না।

উত্তরে আমি হাসলুম।

মামা বললেন: হাসি নয় গোপাল, এত কষ্ট করে এত দূর দেশে এসেছি। তোমার লালবাগের হাওয়া খেয়ে আর সিল্কের শাড়ি কিনে দেশে ফিরতে চাই নে। কিছু দেখতে শুনতেও চাই।

স্বাতি বলল: মহিশূরের ইতিহাসই গোপালদা এখনও শোনায় নি।

মহিশূরের আর ইতিহাস কী, মহিশূরের হল গল্প। হায়দর আলি

আর টিপু সুলতানের গল্প। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক মানচিত্রে মহিসুরের নাম দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

এই দেশটার তো একটা নাম ছিল!

ছিল বৈকি। কিন্তু দেশটার আকার আকৃতি ঠিক একই রকম ছিল না। কখনও নাম আছে, কখনও নেই।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল: দেশের একটা নাম নেই, এও কি হতে পারে!

কেন পারে না! ১৯৪৭-এর আগে পাকিস্তান নাম কোথায় ছিল?

মামা ইশারায় আমাকে বলবার নির্দেশ দিলেন। বললুম: খ্রীষ্টের জন্মের আগে বিদর্ভ নামে একটা দেশ ছিল। বিন্ধ্য ও সাতপুরার দক্ষিণে, তাপ্তি ও গোদাবরীর উপত্যকায়। পশ্চিমে মহারাষ্ট্র। অন্ধ্র ও কলিঙ্গ ছিল দক্ষিণ পূর্বে, তুঙ্গভদ্রার উত্তরে। একেবারে দক্ষিণে দেখি কেরল পাণ্ড্য ও চোল। কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যে আজকের মহিসুরের কোন নাম দেখতে পাই নে। মৌর্য যুগে চোল রাজ্য এই ভূখণ্ডকে গ্রাস করেছিল। গুপ্ত রাজাদের সময়েও তাদের আধিপত্য ছিল অপ্রতিহত। ভারতের মানচিত্রে তখন নতুন কয়েকটি নাম ছিল— বাকাটক রাষ্ট্রিক কদম্ব বেঙ্গী। এ সবই ছিল তুঙ্গভদ্রার উত্তরে। নিচে গঙ্গা রাজ্য। ইতিহাসের ছাত্র এই অন্ধকার যুগ নিয়ে গবেষণা করবে।

দাক্ষিণাত্যে দুটি রাজ্য পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। উত্তরে চালুক্য ও দক্ষিণে পল্লব। ক্ষমতার জন্য তাদের যুদ্ধের শেষ ছিল না। অবশেষে গোদাবরী ও কৃষ্ণার সীমানা পর্যন্ত অধিকার করে চালুক্যরা ক্ষান্ত হল। অষ্টম শতকে আরও অনেক রাজ্য দেখা দিল। রাষ্ট্রকূট যাদব কদম্ব ও কাকতীয়রা চালুক্য রাজ্যে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল রাষ্ট্রকুটের সঙ্গে চালুক্যদের। উত্তরে মালব থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত তারা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের ক্ষমতা স্থায়ী হয় নি।

পল্লবরা শক্তিহীন হল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে। চোলরা এরই অপেক্ষায় ছিল। দেখতে দেখতেই মহিসুর মালভূমি পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তার করে ফেলল।

আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর যখন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে এল, এ দেশ তখন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। যা একটু শক্তি ছিল তা দেবগিরির যাদব ও ওরঙ্গলের কাকতীয়দের। তবু তারা মুসলমান বিজয় ঠেকাতে পাবল না।

চোল রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। মহিসুর মালভূমিতে নতুন রাজ্য হল হয়শাল। আর কাবেরীর দক্ষিণ থেকে উত্তর পেন্নার পর্যন্ত পাণ্ড্য রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হল। কিন্তু এরাও পারল না মালিক কাফুরকে বাধা দিতে। সেই দিগ্বিজয়ী বীর দিল্লী থেকে মাদুরা পর্যন্ত সমস্ত দেশ তার মালিকের পদানত করে গেল।

মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, এবং শতাব্দী শেষ না হতেই এই পতন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। দক্ষিণে অভ্যুত্থান হল দুটি রাজ্যের—বাহমনি ও বিজয়নগর। উত্তরে বিন্ধ্য ও দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা হল বাহমনি রাজ্যের সীমা। আর বিজয়-নগর তার দক্ষিণের সমগ্র ভূখণ্ড। দুই দেশে অবিরত যুদ্ধ হত রায়চুর দোয়াবের অধিকার নিয়ে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনি রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—বিদর বিজাপুর গোলকুণ্ডা আহমদ-নগর ও বেরার। এরাই আবার নিজেদের শত্রুতা ভুলে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সমবেত হল তালিকোটের মাঠে। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হয়ে গেল। মহিসুরের মালভূমি এল বিজাপুরের কবলে।

এর পর নিজাম ও মারাঠা শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এদের দক্ষিণে কর্ণাট ও মহিসুর। ভারতের উপকূলে তখন ইংরেজ ও ফরাসীর পদার্পণ ঘটেছে।

স্বাতি হঠাৎ একটা হাই তুলল।

বললুম : ঘুম পাচ্ছে নাকি ?

হেসে বললেন : ইতিহাসের নাম শুনলে ওর দিনের বেলাতেই ঘুম পায়।

বললুম : এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। রাতে ঘুম না পেলে একখানা ইতিহাসের বই টেনে নিও।

আর ঘুম পেলে ?

খুকু ঘুমলো পাড়া জুড়লো, বর্গী এল দেশে।

বর্গী তো সারাক্ষণই সঙ্গে আছে।

মামা হেসে উঠলেন। কিন্তু মামী হাসলেন না। এই রকমের অন্তরঙ্গ আলাপকে যে তিনি ভয় পান, তার পরিচয় তিনি অনেকবার দিয়েছেন। আমি উত্তর দেব না ভেবেছিলুম, কিন্তু স্বাতি বলল : চুপ করলে যে ?

বললুম : আমার কথাটি ফুরলো।

কিন্তু নটে গাছটি যে মুড়োয় নি।

মামা বললেন : তোমরা কি আজকাল হেঁয়ালিতে কথা বল ?

বললুম : স্বাতি বলে, এতে বুদ্ধির দরকার। আমার বুদ্ধির পরীক্ষা করছে।

স্বাতি আপত্তি জানাল : পরীক্ষা আমি করছি, না তুমি ?

মামা বললেন : বুঝেছি। সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল।

ভেবেছিলুম আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। আর আমাকে ইতিহাস শোনাতে হবে না। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল তা পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলুম। মামা বললেন : ইতিহাসটা তুমি গোপাল নমো নমো করেই সারলে।

বললুম : বাদ তো কিছুই দিই নি।

তা হয়তো দাও নি। কিন্তু এত সংক্ষেপে সারলে যে রস পুরো

পেলুম না। এই ধর, রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কথা কিছুই বলো নি।

কিছুই যে জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে এই দেশটা সুগ্রীবের রাজ্য ছিল। বালির রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা যে বর্তমান হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামায়ণে বর্ণিত অনেক স্থান খুঁজে পাওয়া গেছে। পম্পা নদী হল আজকের তুঙ্গভদ্রা, তারই কাছে পম্পা সরোবর, অঞ্জনা পাহাড় ও মতঙ্গ পর্বত।

মামী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেনঃ এ সব আমরা দেখতে পাব?

একটা গোটা দিন সময় লাগবে।

মামা বললেনঃ কেমন?

হায়দ্রাবাদের পথে গুন্টাকলে নেমে হস্পেট যেতে হবে। সেখানে শুধু কিষ্কিন্ধ্যা নয়, বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপও আছে। রুইন্‌স্ অব হাম্পি।

স্বাতি বললঃ নামটা যেন শোনা শোনা লাগছে।

লাগবেই তো। ঐ ধ্বংসস্তূপ পড়ে না থাকলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কথা আমরা ভুলে যেতুম। হিন্দুর সেই স্বর্ণযুগের মহিমা ইতিহাসের পাতায় পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। হাম্পিতে বিস্মৃত বিজয়নগর আজ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

স্বাতি বললঃ সে তো শুনেছি ভাঙা ইঁট পাথর!

ভাঙা ইঁট পাথর বোলো না, বল ভাঙা বাড়িঘর আর মন্দির। আর এই সব আছে বলেই দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গা উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে আছে। কী অপূর্ব সৌন্দর্য-চেতনা! কী গভীর ধর্মানুরাগ! স্থাপত্যের এমন উৎকৃষ্ট নিদর্শন ভারতের আর কোনখানে নেই।

স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে আমি থেমে গেলুম। আমার উচ্ছ্বাস সে বুঝি উপভোগ করছিল।

চিন্তিত ভাবে মামা বললেন: ঠিকই বলেছ। উত্তর ভারতেও তো অনেক মন্দির আছে, কিন্তু ঠিক এমনটি বোধ হয় কোথাও দেখিনি। বৈদ্যনাথ বল, বারাণসী বল—

কথার মাঝখানেই স্বাতি বলল: কেন, কোনারক বা ভুবনেশ্বরের মন্দির।

মাথা নেড়ে মামা বললেন: তা বটে।

আমি বললুম: হয়শাল রাজবংশের তৈরি দুটো মন্দির তো আমরা দেখলুম বেলুড় আর হালেবিডে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির না দেখে বিচারের রায় দেওয়া উচিত হবে না।

সব দেখেই রায় দিও। ফার্গুসন সাহেবও তাঁর রায় দিয়েছেন। সেটাও মিলিয়ে নিও।

ইচ্ছে করলে আজও খানিকটা ঘুরে আসা যায়। অন্তত স্বাতির তাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মামা রাজী হলেন না। বললেন: তার চেয়ে তুমি কিষ্কিন্ধ্যার খবর জোগাড় কর। আমরা এই ঘরেই খানিক অপেক্ষা করি।

আমার দিকে তাকিয়ে স্বাতি বলল: ভয় পেলে নাকি?

ভয় পাওয়া উচিত কিনা ভাবছি।

স্বীকার করলে তোমার ক্ষতি হত না, আমি সঙ্গে যেতে পারি।

হেসে বললুম: তাহলে আমার একটুও ভয় করবে না।

মামা হেসে উঠলেন। কিন্তু মামী দেখলুম গম্ভীর হয়ে রইলেন।

দরজার বাহিরে এসে বললুম: মামীমা পছন্দ করেন না এমন কাজ কেন কর?

পরম কৌতুকে স্বাতি বলল: কেন পছন্দ করেন না বলতে পার?

বোধহয় তোমার ওপর ভরসা পান না।

আমার নয়, তোমার ওপর। তুমি যে মানুষটি সুবিধের নও, তা টের পেয়ে গেছেন।

তুমি বলেছ বুঝি?

তুমি নিজেই তো প্রকাশ করে ফেল। বললেই তো পারতে যে তুমি ভয় পাও না, একাই খোঁজ খবর নিতে পারবে।

তা বললে তুমি বেরোতে কী করে?

বেরোতে আমার বয়েই গেছে।

আমি নিশ্চয়ই জানি যে মনের হাসি আমি চেপে রেখেছিলুম। কিন্তু স্বাতি তবু বলল: হাসছ যে!

হেসেছি বুঝি?

হাসছই তো!

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, তাই বললুম: তোমার কাণ্ড দেখে। তুমি তো যেচে আমার সঙ্গে এলে। এখন নিজের প্রয়োজন অস্বীকার করে আমার প্রয়োজন বলছ। সে একই কথা।

কেন?

বললুম: কান্তিনাথের দরকারে তুমি যেতে?

না।

রামখেলাওনের দরকারে?

তাহলে তো আমাকে একাই যেতে হত।

আর আমার বেলায় সঙ্গে আসতে হল, এই তো!

স্বাতি ভ্রূকুটি করল। আর আমি হেসে বললুম: হেরে গেলে।

এবারে স্বাতিও হাসল। সলজ্জ স্মিত হাসি। এই হাসি দেখবার লোভ আমার বেড়েছে।

খবর সংগ্রহ করা যে কত শক্ত কাজ স্বাতি তা সহজেই স্বীকার করল। শুধু একটু মন্তব্য করল: এ কাজে তোমাকে পাকা বলেই জানতাম!

আত্মাভিমানে আঘাত লাগবার মতো কথা। তাই মুখ দিয়ে উত্তরটা বেরিয়ে গেল: ট্রেনে এ কাজ সোজা, স্টেশনে কঠিন।

কেন?

ঐ পথে যারা যাচ্ছে, তাদের কেউ না কেউ পুরনো যাত্রী, স্থানীয় লোকও অনেক সময় পাওয়া যায়। শুধু চিনে বার করার অভিজ্ঞতা চাই।

এখানে তো বেশি যাত্রী!

কিন্তু কে কোন্ দিকে যাচ্ছে জানা নেই। আমাদের সঙ্গে যারা যাবে, তারা ট্রেনের সময়েই আসবে।

স্বাতি এ কথা মেনে নিতেই বললুম: কিন্তু হার মানলে চলবে

না। চল ঐ এনকোয়ারি অফিসে। আমি পেছনে থাকব, তুমি কথা কইবে।

কেন?

এ সব কথার উত্তর দেওয়া হয়তো ওদের দায়িত্ব নয়। আমাকে এড়িয়ে যাবে।

স্বাতি বলল: বুঝেছি। মেয়েদের সম্মান যে বেশি তা তুমি স্বীকার করলে।

আমি কেন, সে তো দুনিয়ার সব লোকই সারাক্ষণ করে।

স্বাতির বিশ্বাস হল না, বলল: তোমার মুখে এ কথা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে।

তাও মিথ্যে নয়। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আবার অন্য কথাও ভাবি। একটা না একটা পুরুষকে তারা দেবতার মতো সম্মান করে। নিজের সম্মান তার পায়ে লুটিয়ে দিয়েও নিজেকে কৃতার্থ ভাবে।

ও তোমার ধারণা।

আমি তো নিজের ধারণার কথাই বলব।

বলে স্বাতিকে এগিয়ে দিলুম। এনকোয়ারির ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বাতি কথা বলবে।

যে ভদ্রলোক সামনে বসেছেন তিনি চোখ তুললেন না, দূরের ভদ্রলোক কলম তুলে চেয়ে রইলেন। যিনি চোখ নামিয়ে আছেন, তিনি কোন কাজ করছেন বলে দেখতে পেলুম না। বরং চোখ বুজে আছেন বলেই মনে হল। অন্য সবাই দেখেও দেখছেন না, শুনেও শুনছেন না। পিছন থেকে আমি বললুম: এই হল আধুনিক সরকারী নীতি। যাঁর কাজ তিনি চোখ বুজে থাকেন, অন্যরা মজা দেখেন।

স্বাতি আমার দিকে ফিরে তাকাতে বললুম: সেদিন কাগজে দেখ নি বুঝি। চোর চুরি করছে, আর পুলিশ দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। প্রশ্ন করে জানা গেল যে ঐ চুরি হচ্ছে তার আওতার বাইরে। যার

দেখবার কথা সে কোথায় ? উত্তর হল, জানি নে। এই নীতি মেনে চললে সরকারের কাছে সুনাম অনিবার্য।

স্বাতি বিরক্ত হয়ে বলল : তোমার বক্তৃতা রাখো।

কথাটা বোধহয় স্বাতি জোরেই বলেছিল। ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

স্বাতি বলল : কিষ্কিন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারেন ?

না।

বিজয়নগর সম্বন্ধে ?

বিজয়নগরম ?

আমি এগিয়ে এসে বললুম : হাম্পি রুইন্‌স্।

স্টেশনের নাম বলুন।

স্বাতি বলল : ধন্যবাদ। এস গোপালদা, আমরা নিজেরাই চেষ্টা করি।

প্ল্যাটফর্মে আমরা বই-এর দোকানে এলুম। গাইড-বই চাই। যা পাওয়া গেল তা স্বাতির আছে। তাতে নাকি হাম্পির উল্লেখ আছে, বর্ণনাও আছে। ছবিও যে দু-একখানা নেই তা নয়। কিন্তু তাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশের অভাব। স্বাতি বলল : এ সবের গাইড নাম কেন হল বুঝি নে।

কী করবে তাহলে ?

বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।

সব কথা শুনে মামা বললেন : তুমি পার না এমন কাজও তাহলে আছে দেখছি।

অহঙ্কার থাকা উচিত নয়, তবু এ কথা মেনে নিতে ইচ্ছে হল না। বললুম : আপনি কি কিষ্কিন্ধ্যা যাবার কথা বলছেন ?

মামার ঠোঁটে পাইপ ছিল, শুধু মাথা নাড়লেন।

বললুম : গুন্টাকল জংসনে গাড়ি বদল করে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার রাস্তা হস্পেট। একটা নয়, তিন চারটে রেস্ট হাউস সেখানে।

স্টেশনের মাইল খানেকের মধ্যে একটি, দুটি একেবারে তুঙ্গভদ্রার বাঁধের ওপর, আর তৃতীয়টি কমলপুরমে। শেষেরটিতে খানসামাও আছে।

স্বাতির দৃষ্টিতে আমি বিস্ময় দেখলুম।

বললুম: থাকবার যখন অতগুলো জায়গা আছে, তখন কি আর গাড়িঘোড়া নেই! দুর্গা বলে রওনা হয়ে গেলে ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

স্বাতি বলে উঠল: সব তৈরি কথা বাবা।

বললুম: যে বইগুলো নাড়াচাড়া করলে তারই শেষ দিকে লেখা ছিল।

স্বাতির এ কথা বিশ্বাস হল না। কিন্তু মামা বললেন: দরকার নেই ও সবের। মাঠে-ঘাটে অনেক ঘুরেছি, এবারে বাড়ি চল।

সমর্থন করে মামী বললেন: সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি।

স্বাতি বলল: বেড়ানোতেই তো আনন্দ।

মামা মামী না থাকলে বলতুম, মনের মতো একটি সঙ্গীও চাই। সঙ্গীহীন ভ্রমণ হয়তো প্রাণহীন জীবনের মতো, শাস্তির মতো। অভাবের উপলব্ধি না থাকলে পাবার আনন্দ আমরা বুঝি না।

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে মামা বললেন: গোপাল কিছু বল।

মামাকে আমি চিনে ফেলেছি। তাঁর দেখবার ও জানবার বাসনা কারও চেয়ে কম নয়। শরীরটা আয়েসী বলেই শ্রমের নামে ভয় পান, অথচ জানবার ইচ্ছা থাকে জমে। তাইতেই জিজ্ঞাসা করেন। যা দেখা হল না, শুনে তার যতটা জানা যায় তারই চেষ্টা। বললুম: কী বলব বলুন।

কী বলবে তা কি আমি বলে দেব!

স্বাতি বলল: বিজয়নগরের গল্প বল।

সে গল্প অবিশ্বাস্য মনে হবে। সত্যিই অবিশ্বাস্য। একজন মন্ত্রী এই রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গেরী মঠের

আচার্য ব্রাহ্মণ মাধব বিদ্যারণ্য। তাঁরই চেষ্টায় ও বুদ্ধিকৌশলে এই ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য মহিমান্বিত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। আর আড়াইশো বছর পর আর এক মন্ত্রীর উদ্ধত অহংকারের জন্য এই শক্তিশালী রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বিজয়নগর আজ ইতিহাসের মহাশ্মশান। এর জন্য দায়ী রাজা সদাশিব রায়ের মন্ত্রী রাম রাজা।

স্বাতি বলল: জমিয়ে ফেলেছ। এবারে আস্তে আস্তে গল্পটা বল।

বললুম: গল্পের মাঝখানটা ভাল লাগবে না। একেবারেই ইতিহাস। কার পর কোন্ রাজা, লড়াই করেছিলেন কার সঙ্গে, জিতলেন না সন্ধি করলেন, নতুন রাজ্য হাতে এল না পিছিয়ে এলেন—এর মধ্যে গল্পের রস নেই। তোমার কাছে নীরসই লাগবে। যা নীরস লাগবে না, তেমন জিনিসই বলব।

ঘরের কোণের দিকে একখানা আরাম চৌকিতে মামী চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন।

মামা তাঁর পাইপটাকে একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে নিলেন। তারপরে নতুন করে ধরালেন সেই পাইপ।

স্বাতি স্মরণ করিয়ে দিল: তুমি মাধব বিদ্যারণ্যের কথা বলছিলে।

মাধব বিদ্যারণ্য দরিদ্র পণ্ডিত ছিলেন। ঐশ্বর্য লাভের প্রত্যাশায় তপস্যা করতে এসেছিলেন হাম্পির ভুবনেশ্বরী মন্দিরে। দেবী স্বপ্নাদেশ করলেন, এ জন্মে নয়, আশা সফল হবে পরজন্মে। মাধব বিদ্যারণ্য আর মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। শৃঙ্গেরী মঠে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মন টিকল না। তাঁর কানে অন্য কোন কর্তব্যের ডাক পৌঁছেছে। মাধব ফিরে এসে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে আবার হত্যা দেন, আদেশ কর, কী করতে হবে বল। উত্তর দিল দেবীর চিন্ময়ী মূর্তি, ভারতে আজ হিন্দুর ধর্ম বড় বিব্রত, হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর। মাধব বললেন, আমি যে সন্ন্যাসী। দেবী বললেন, তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। এই আদেশ পেয়েই মাধব

বিদ্যারণ্য বিদ্যানগর প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্যানগরেরই নাম হল বিজয়নগর।

বিজয়নগরের একটা ইতিহাস আছে। এখানে তা ভাল লাগবে না। সঙ্গম নামে এক ক্ষত্রিয়ের দুই পুত্র হরিহর ও বুক্ক হয়শালরাজ তৃতীয় বীর বল্লালের সাহায্য পেয়েছিলেন। বছর দশেক পর হয়শাল বংশ লোপ পেলে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল বিদ্যানগরের সঙ্গম বংশ। অন্য দিকে বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠা। সে আর এক ইতিহাস। কৃষ্ণার উত্তরে বেরার পর্যন্ত বাহমনীর অধিকার, তার রাজধানী গুলবর্গায়। কৃষ্ণার দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিজয়নগরের। শুধু রায়চুর দোয়াবের অধিকার নিয়ে বুক্কর সময়েই যে বিবাদ সৃষ্টি হল, বাহমনীর দেড়শো বছরের রাজত্বকালে তার অবসান হল না। সঙ্গম বংশে একে একে অনেকে রাজা হলেন—হরিহর, প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায়, আরও অনেকে। অনেক ষড়যন্ত্র ও অনেক হত্যার পরে ক্ষণস্থায়ী শালুক বংশের প্রতিষ্ঠা হল। তারপর এল তুলুব বংশ। বীর নরসিংহ, কৃষ্ণদেব রায়, অচ্যুত রায়, সদাশিব রায়। এই সদাশিব রায়ের আমলেই বিজয়নগর ধ্বংস হয়ে গেল।

এই বিপর্যয়ের জন্য মন্ত্রী রাম রাজাকেই দায়ী করতে হয়। রাম রাজার ক্ষমতার চেয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল বেশি। তাতেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু শক্তির গর্বে শত্রুকে তিনি হীনবল ভাবতেন, তাচ্ছিল্য করতেন প্রতিবেশী সুলতানদের। এ রাজনীতি নয়। কূটনীতির নির্দেশ অন্য রকম। প্রতিবেশী শক্তি তিনটি থাকলে দুটি রাখতে হবে হাতের মুঠোয়, আর একটি শূন্যে। দুজন মিত্র, শত্রু একজন। তবেই কোন বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। শত্রুর শক্তির পরিমাপ করতে গেলে তার একার শক্তির পরিমাপ করতে নেই। তার মিত্ররাও যেমন শত্রু পক্ষে, তেমনি নিজের অন্যান্য শত্রুরাও সেই দলে। যারা শত্রুও নয়, মিত্রও নয়, তাদেরও শত্রুপক্ষে ধরে রাখা ভাল।

স্বাতি হেসে বলল: তুমি কি আমাদের রাজনীতি শেখাচ্ছ?

বললুম : রাম রাজাকে শেখাতে পারলে খুশী হতুম। বিজয়নগর বেঁচে থাকলে ভারতের ইতিহাস আজ অন্য রকম হত।

মামা বললেন : রাম রাজার কী হল ?

বললুম : একদা যে রাজ্যের দুঃসাহসী শক্তিমান রাজা কৃষ্ণদেব রায় শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, পরে সেই রাজ্যেরই মন্ত্রী দেশের অর্থব্যয় করে শত্রু সৃষ্টি করেছেন। শুধু রাজার নয়, মন্ত্রীরও বিলাস ব্যসনে রাজকোষ শূন্য হয়েছে।

একদিন প্রতিবেশী সমস্ত সুলতানেরা সংঘবদ্ধ হল—বিদর বিজাপুর গোলকুণ্ডা ও আহমদনগর। তালিকোটের মাঠে যুদ্ধ বাধল ১৫৬৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আশী বছরের বৃদ্ধ রাম রাজা যুদ্ধ পরিচালনা করলেন।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : রাজ্যের বুড়ো মন্ত্রী যুদ্ধ করতে গেলেন, সেনাপতির কী হল ?

রাম রাজার দুজন জোয়ান ভাই ভেঙ্কটাদ্রি আর তিম্মরাজও যুদ্ধ করেছিলেন। ভেঙ্কটাদ্রিই হয়তো সেনাপতি ছিলেন।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : রামায়ণ মহাভারতের পর সেনাপতির কদর আর দেখা যায় না। রাজা নিজেই সে যুগে সেনাপতি হয়ে লড়তেন।

আর সেনাপতিরাই সুযোগ পেয়ে রাজা হয়ে বসতেন।

মামা বললেন : যেমন ?

এই বিজয়নগরেরই ব্যাপার দেখুন। প্রথম রাজা বুক্ক ও হরিহর ওরঙ্গলের রাজার ছোটখাটো সেনাপতি ছিলেন। তুলুব বংশের প্রথম রাজা বীর নরসিংহ ছিলেন রাজা নরসিংহ শালুবের সেনাপতিপুত্র। তালিকোটের যুদ্ধে হেরে না গেলে হয়তো ভেঙ্কটাদ্রিই বিজয়নগরের রাজা হয়ে বসতেন। হেরে গিয়েও রাজ্যস্থাপন করেছেন চন্দ্রগিরিতে। জোর যার মুলুক তার। মধ্যযুগে সত্যিই বসুন্ধরা বীরভোগ্যা ছিল।

মামী এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন। এইবারে চোখ খুলে বললেন : আমাদের গাড়ির আর কত দেরি ?

প্রশ্ন শুনে মামা যেন চমকে উঠলেন, বললেন : তাই তো, আমাদের যে গাড়ি ধরতে হবে !

হেসে বললুম : তার সময় আছে।

না না গোপাল, ও কাজের কথা নয়। গল্প না হয় গাড়িতে উঠেই করা যাবে। তুমি কুলি ডাক।

অগত্যা উঠতে হল।

স্বাতি বলল : বিজয়নগরে কী দেখবার আছে গাড়িতে বসে শুনব।

২৩

মামা ভাবতে পারেন নি যে আমি গিয়ে আবার তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠব। নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁর বিরাগভাজন হবার দুঃসাহস আমি সঞ্চয় করেছি। শুধু আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নয়, জ্ঞানার্জনের চেষ্টাও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভাবতে কষ্ট হয় যে মামা-মামীর পরিচর্যার জন্য আমি বেরিয়েছি। দেখবার ও জানবার সাধ তো আমারও আছে। সারাক্ষণ কথা বললে কি দেখা আর জানা হয়! নিজের মুখ বন্ধ না করলে চোখের ঠুলি সরে না, কানে যায় না প্রকৃতির নীরব সঙ্গীত। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য মৌন হবার প্রয়োজন, চোখ বন্ধ করে হয় আত্মদর্শন। শ্রীঅরবিন্দ সপ্তাহে এক দিন মৌন থাকতেন, হিমালয়ের দুর্গম গুহায় মৌন সন্ন্যাসীর সংখ্যা অগণিত। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল অন্যের কাছে কিছু শোনবার। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা তার অনুকূল স্থান।

এই কামরা নির্বাচন একটা কঠিন ব্যাপার। যেখানে-সেখানে উঠলেই চলবে না। এমন লোক সেখানে মেলা চাই যে ইংরেজী জানে, আর জানে বলার মতো কথা। নিজে থেকেই বলতে ভালবাসে, এমন লোকের সন্ধান পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। বাহির থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি যাত্রীদের দেখছিলুম।

আমাকে রক্ষা করলেন এনকোয়ারি অফিসের এক বাবু। পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: জায়গা খুঁজছেন?

বললুম: সঙ্গী খুঁজছি।

সঙ্গী!

ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে এ দিকে সে দিকে চেয়ে বললেন: কাউকে দেখছি না তো!

হেসে বললুম: পুরনো সঙ্গী নয়, এই গাড়িতেই নতুন সঙ্গী খুঁজছি। অনেকটা পথ যেতে হবে তো!

তা বটে।

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে স্থির হলেন।

বললুম: এমন একজন সঙ্গীর দরকার যার কাছে পথের কথা আর মানুষের কথা শুনতে পাব।

একটু দাঁড়ান।

বলেই ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে আবার তাঁকে দেখতে পেলুম। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়ে আসছেন। সৌম্যদর্শন চেহারা, পরনে খদ্দর, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। কাছে এসেই রেলের বাবুটি বললেন: আপনার ভাগ্য খুব ভাল। মিস্টার কৃষ্ণরাও এই গাড়িতে যাচ্ছেন। জার্নালিস্ট ইনি।

বললুম: সৌভাগ্য যে আমার একার তাতে সন্দেহ নেই। আমি কলকাতার কেরানী, আমার নাম গোপাল।

কৃষ্ণরাও-এর আচরণে কোন অবহেলার লক্ষণ দেখলুম না। বললেন: মানুষের যে দুটো রূপ আছে, সে অতি পুরনো কথা। তার ঘরের ও বাহিরের রূপ, আলোর আর অন্ধকারের। আমি বলি তার পরিচয়ও দুটো—একটা সরকারী আর একটা ব্যক্তিগত। শৈশবের কথা মনে আছে?

উত্তর না দিয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

কৃষ্ণরাও বললেন: স্কুলের হেডমাস্টারমশাই যখন বারান্দা দিয়ে যেতেন, ভয়ে আমাদের বুক দুরদুর করত। সেই ভয়ে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটতুম না। বেশি পথ হাঁটতে হলেও ঘুরে যেতুম। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বাবার সঙ্গে যাচ্ছি। উপায় নেই, ও রাস্তায় যেতেই হবে। কিন্তু তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে চমকে গেলুম। হেডমাস্টারমশাই হাসছেন। ঠিক আমাদের মতো হাসি,

একটুও অন্য রকম নয়। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, চমকে উঠলি যে! ভয়ে ভয়ে বললুম, হেডমাস্টারমশাই যে হাসছেন!

রেলের বাবুটি বোধহয় এই গল্পের মানে বুঝতে পারেন নি। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কৃষ্ণরাও বললেন: গোপালবাবু কেরানী শুনে এই গল্পটি আমার মনে পড়ল। রেলে চাপতে যিনি সঙ্গী খোঁজেন, তাঁর আরও একটা পরিচয় নিশ্চয়ই আছে।

লজ্জিত ভাবে বললুম: আপনি রসিক লোক, তাই এ কথা ভাবছেন। আলাপ হলে এই ধারণা আপনার পালটে যাবে।

অন্য কিছু প্রমাণও তো হতে পারে!

বলে কৃষ্ণরাও হাসলেন।

রেলের ভদ্রলোক খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন: শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি হচ্ছে। আমি তাহলে আসি।

কৃষ্ণরাও বললেন: দেখে দেখে শেয়ানাদের আপনি চিনে বার করছেন, আপনিই বা শেয়ানা কম কিসে!

ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের জন্যে একটু জায়গা দেখব?

আমার জন্যে দরকার নেই। আমি জনতা গাড়িতে উঠব।

আমিও একই গাড়িতে।

তবে এই পাশেরটিই ভাল হবে। পিছনের দিকে বিপদের ভয় কম।

আমরা পাশের গাড়িতেই উঠে পড়লুম।

পরিচয় হল। আমি তাঁর কাগজের নাম শুনলুম, তিনি আমার অফিসের নাম জানলেন। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি, আর তিনি তাঁর বোনের বাড়িতে যাচ্ছেন তুঙ্গভদ্রা ড্যাম সাইটে। ভগ্নীপতি চাকরি করতে এসেছেন, আর বোন অনেক দিন থেকে ডাকছে। দুদিনের ছুটি নিয়েই তিনি যাচ্ছেন। একটা প্রবন্ধ লিখে আর্থিক ক্ষতিটা পূরণ করবেন।

মনে মনে আমার অনেক বাসনা গুঞ্জরণ করে উঠেছে। কিন্তু কী করে শুরু করব ভেবে পাচ্ছিলুম না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণরাও আমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন বাঙলার সম্বন্ধে, এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কী প্রভেদ দেখছি।

তুলনাটা এড়িয়ে গিয়ে উত্তরে কিছু বললেই হল। সে চেষ্টা হাস্যকর হবে ভেবে বললুম: দৌড়বার সময় পথের দৃশ্য যেমন চোখে পড়ে না, এই রকম ভ্রমণে তেমনি মানুষের পরিচয় থাকে অজ্ঞাত। তার চেয়ে কানাড়ী সাহিত্য সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

কৃষ্ণরাও যেন চমকে উঠলেন, বললেন: আমার সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই তো?

এ কথা কেন বলছেন?

কানাড়ী সাহিত্যে কৃষ্ণরাও একটি স্মরণীয় নাম। মাপ করবেন, আমি সে ব্যক্তি নই, আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধও নেই।

হেসে বললুম: আপনার ভাবনা নেই। এক মাস্তি ছাড়া আর কোনও নাম আমি জানি নে।

মাস্তিকে জানেন!

ইংরেজীতে তাঁর ছোট গল্পের অনুবাদ পড়েছি।

পড়েছেন! কেমন লেগেছে আপনার?

কোন দিন সমালোচনা করতে হবে ভেবে আমি কোন গল্প পড়ি না। এখন দেখছি বিপদ আমি নিজে ডাকি। পড়ি নি বললেই ভাল ছিল। এখন আর উপায় নেই, উত্তর একটা দিতেই হবে। তাই বললুম: অল্প কয়েকটি গল্প পড়েছি। যত দূর মনে পড়ছে, কোন চমক দেখি নি। নিতান্তই সাদাসিধে ঘরোয়া কথা। দুবেলা যা দেখছি শুনছি তাই। তবে পড়তে ভাল লেগেছিল।

কৃষ্ণরাও যে প্রসন্ন হলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। বললেন: আশ্চর্য, আপনি তাঁর খাঁটি রূপটিই চিনতে পেরেছেন দেখছি। তাঁর পুরো নাম হল মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার, শ্রীনিবাস

তাঁর ছদ্ম নাম। শুধু ছোট গল্পে নয়, কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। বাঙলার মতো আমাদের সাহিত্যে দিকপাল নেই, কিন্তু মাস্তি সত্যিই জনপ্রিয় লেখক। জীবনে অন্তর্দৃষ্টি ও লেখায় আন্তরিকতার জন্যেই তিনি জনপ্রিয়।

কানাড়ী ভাষার অগ্রগতির ইতিহাসে দুটো অধ্যায় চিহ্নিত হয়ে আছে। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশটায় ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য আর কিছু মারাঠী অধিকার। এই পরিবেশে কানাড়ী ভাষা প্রশ্রয় পায় নি। সংস্কৃত ভাষার প্রাণ যেমন মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের চেষ্টায় আজও কোন রকমে ধুক ধুক করছে, কানাড়ীও তেমনি জীবন্মৃত হয়েই বেঁচে ছিল। জনসাধারণের কাছে তার সমাদর গিয়েছিল লুপ্ত হয়ে।

গত শতকের শেষ ভাগ থেকে কানাড়ী সাহিত্যের নূতন অধ্যায়। মহিসুরের মহারাজা আড়াইশো বছর ধরে এই ভাষার প্রসারের চেষ্টা করছেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রাচীন পুরাণগুলি প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি মঠ ও কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সে আধুনিক সাহিত্যের জাগরণ নয়। এই কাজে প্রথম নামলেন কর্ণাটক বিদ্যাবর্ধক সংঘ। বাগ্‌ভূষণ তাঁদের প্রথম সাহিত্য পত্র। কানাড়ী সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তখন থেকেই এই সাহিত্যে একটা গতি এসেছে।

গলগনাথের মাধব করুণাবিলাস প্রথম মৌলিক উপন্যাস, না কেরূর ইন্দিরা, তা জানা নেই। প্রথমটি বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং দ্বিতীয়টির পটভূমি সামাজিক। এর আগে বাঙলা ও মারাঠী উপন্যাসের অনুবাদ হয়েছে, অনুবাদ হয়েছে ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের। বাঙলার বঙ্কিমচন্দ্র কানাড়ী সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

নামধাম বেশি করলে আলোচনা ভারাক্রান্ত হবে, আবার

কয়েকটি নাম না করলে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। এই রকম কয়েকজন হলেন এম. এস. পুট্টন্না, কে. ভি. পুট্টপ্প, শিবরাম করন্থ, আর. ভি জাগীরদার, বাসবরাজ কট্টিমণি, আর. এস. মুগলি, মিরজী আন্নারাও ও বিনায়ক কৃষ্ণ গোকক। কৃষ্ণরাও ও রাজরত্নমও জনপ্রিয় লেখক। কৃষ্ণরাও-এর লেখায় অবাস্তবতা ও অশ্লীলতা আছে, তবু তাঁর নাম করতে হয়।

ছোট গল্পে কেরুর, পঞ্জে মঙ্গেশ রাও ও শ্রীনিবাসের পরেই নাম করতে হয় রাজরত্নম ও আনন্দ কন্দের। প্রেমের গল্প লিখে নাম করেছেন অনিন্দ।

খুব সম্প্রতি নাটক লেখা শুরু হয়েছে। টি. পি. কৈলাসম কর্ণাটকের ইবসেন নামে পরিচিত হচ্ছিলেন। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেছেন। একালের ঔপন্যাসিকরা সকলেই কিছু কিছু নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে জাগীরদার, শিবরাম করন্থ, কস্তুরি ও সমসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জাগীরদার লেখেন নি এমন বিষয় নেই।

কৃষ্ণরাও থামতেই আমি বললুম: আপনি কবিতার কথা কিছুই বললেন না?

উত্তরে ভদ্রলোক হাসলেন।

হাসলেন যে?

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন: আমাদের তো খবরের কাগজের কারবার।

আমিও হেসে বললুম: আমি তো খবরটুকুই চাইছি।

কিন্তু কবিতার রস যে আমার নেই।

নাই বা থাকল।

ভদ্রলোক বললেন: কয়েকজনের নাম জানি। তাঁদের একজন হলেন ডি. আর. বেন্দ্রে, তাঁর ছদ্মনাম অম্বিকাতনয় দত্ত। লোকে তাঁকে কেরালার ভল্লতোলের সঙ্গেও তুলনা করে। শ্রীকণ্ঠায়া ইংরেজী

কবিতার অনুবাদ করেছেন, আবার মৌলিক কবিতাও লিখেছেন। মঙ্গেশ রাও শুধু কবি নন, শিশু-সাহিত্যিকও বটে। আর যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের কথা আপনি আর কারও কাছে জেনে নেবেন।

কবিতায় গভীর বিতৃষ্ণা এমন লোক বাঙলায় অনেক আছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তাঁরা কোন নতুন কবিকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। এমন ধারা বদলেছে, কিন্তু বিতৃষ্ণা যায় নি। কবিতার প্রতি কৃষ্ণরাও কেন বিমুখ সে কথা বললেন না।

বললুম: দেশনেতা আর. আর. দিবাকর শুনেছি এ দেশের মানুষ এবং কৃতী লেখক।

আমাদের দেশনেতারা সবাই অনেক কিছু লিখেছেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীরাজাগোপালাচারী, কে. এম. মুন্সী, আর. আর. দিবাকর—এঁরা সবাই সাহিত্যিক। কেউ বড়, কেউ ছোট। মুন্সীর মতো মুন্সীয়ানা না থাকলেও দিবাকরের নাম আছে। তাঁর কারাজীবনের স্মৃতিকথা আর উপনিষদ ও প্রাচীন কবিদের আলোচনা মূল্যবান লেখা। অন্যান্য গদ্যলেখকের কিছু জীবনী আছে, রম্যরচনাও সম্প্রতি লেখা হচ্ছে। লেখক যখন আছে, কলম তো থামে না। কাজেই নানা রকমের বই নিয়মিত বের হচ্ছে।

বললুম: আপনার আলোচনা শুনে মনে হচ্ছে যে প্রবল শক্তিমান লেখক এখনও জন্মান নি।

একেবারে খাঁটি কথা।

তেমন প্রতিশ্রুতিবান কাউকে দেখছেন না?

অসঙ্কোচে ভদ্রলোক বললেন: না।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমার মন প্রসন্ন হল না। আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। সাহিত্যকে ভালবাসলে আশা আমাদের রাখতেই হয়। আজ নেই বলে কি কোন দিন হবে না! আমাদের সম্মিলিত বাসনা থেকেই নতুন যুগের সূচনা হবে, জন্ম হবে নবীন রবির। কৃষ্ণরাও-এর মুখের দিকে তাকিয়ে

মনে হল যে ভদ্রলোক একান্ত ভাবে খবরের কাগজের লোক। যা ঘটে গেছে, তাই নিয়েই কারবার। যা ঘটবে বা ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ নেই, নেই প্রতীক্ষা।

আপনি একটু বিমর্ষ হলেন দেখছি!

বললুম : তা একটু হয়েছি বৈকি।

হওয়া উচিত ছিল না।

পৃথিবীর কোন দেশ আজ কোন আশা করতে পারছে না। সামনে একটা শূন্যতা দেখছে, একটা মস্ত ফাঁকা, তারপর কুয়াশা। ঐ কুয়াশার আড়ালে ভাল আছে না মন্দ, তা জানতে পারলেও খানিকটা ভরসা পাওয়া যায়। ঐ ফাঁকা জায়গাটা আমরা চোখ বুজে পেরিয়ে যেতে চাই। তবু বললুম : কোন আশা রাখব না!

কৃষ্ণরাওকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। অস্পষ্ট ভাবে বললেন : শুধু সাহিত্যে নয়, সমাজেরও এই অবস্থা। সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি। সমাজের গোড়া মাটিতে শক্ত হবার পরেই সবুজ পাতায় সাহিত্য হবে মঞ্জরিত।

সত্যি কথা।

কানাড়ী শব্দটি কোথা থেকে এল, সে কথাও আমি কৃষ্ণরাওএর কাছে জেনে নিলুম। কালো মাটির দেশ বলে এ দেশকে বলা হত কর্ নাড়ু। কর্‌নাড়ু থেকে কন্নাড়ু বা কন্নড। তার সংস্কৃত রূপ কর্ণাটক, বা কর্ণাট। পুরনো কর্ণাটক রাজ্যেরই নতুন নাম হয়েছে মৈসুরু বা মহিসুর, আর সরকারী ভাষা কন্নড়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আমরা এ দেশেব নাম দেখি কর্ণাট। কুন্তল নামেও এ দেশ পরিচিত ছিল, কিন্তু সে নাম এখন লোপ পেয়েছে।

কর্ণাট নামটি আমার ভাল লাগল। ভারতের নূতন রাজ্যগুলি ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে। মহিসুর রাজ্যও তো ভাষার ভিত্তিতেও গড়ে উঠেছে দেশ স্বাধীন হবার পরে। তাই এ রাজ্যের কর্ণাট নাম হলেই যেন শোভন হত।

আমার এই মন্তব্য শুনে কৃষ্ণরাও বললেন : পুরাকালে এই নামই তো ছিল। ইতিহাসেই আমরা পড়েছি যে অশোকের সময়ে এই কর্ণাটে সত্যপুত্র ও কেরলপুত্রেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। তারপর আসে সাতবাহন ও গঙ্গবংশের রাজারা। কদম্ব ও পশ্চিম গঙ্গ বংশের রাজাদের সময় এর নাম হয় কুন্তল। কুন্তল তখন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। তারপর চালুক্য রাষ্ট্রকূট চোল হয়সালদের সময়ে আবার এর নাম কর্ণাট হয়।

কৃষ্ণরাও থামতেই আমি বললুম : তারপর ?

কৃষ্ণরাও বললেন : ইতিহাসে কর্ণাটক ওয়ার তো পড়েছেন, অষ্টাদশ শতকে এই অঞ্চলে ইংরেজ ও ফরাসীর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার নাম কর্ণাটক যুদ্ধ। ষোড়শ শতকে বিধ্বস্ত বিজয়নগর থেকে পলাতক রাজারা এই নাম নিয়ে চন্দ্রগিরি ও ভেলোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর্কটের নবাবরা নিজেদের কর্ণাটকের নবাব বলতেন। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতকে বলে কর্ণাটিক মিউজিক। কাজেই এই পুরনো নামটা আবার ফিরে এলে আমরা আশ্চর্য হব না।

একদিন নিশ্চয়ই আসবে।

কিন্তু, এ কথা যখন বলেছিলুম তখন ভাবি নি যে অদূর ভবিষ্যতেই এ রাজ্যের নাম হবে কর্ণাটক।

২৪

সমাজের কথায় আরও অনেক কথা এসে পড়ে। সেগুলি প্রশ্ন করে জানবার নয়, মনোযোগ দিয়ে দেখে শিখবার জিনিস। এ কাজে আমি কোন দিন অবহেলা করি না। কোন দেশের মানুষ যদি তার নিজের দেশের মানুষের মতো আচরণ করে, তাহলে আমার ভুল হবার আশঙ্কা থাকে না।

কৃষ্ণরাও সূতোর একটা কোট গায়ে দিয়েছেন, আর মাথায় বেঁধেছেন পাগড়ি। এখনও শীত পড়ে নি, গরম জামার প্রয়োজন বোধহয় আরও কিছু দিন পরে হবে। আরও কয়েকজন প্রৌঢ় লোকের গায়ে কোট আর মাথায় পাগড়ি দেখে আমি ধরে নিলুম যে এই বেশ এঁদের বৈশিষ্ট্য। এ যুগের ছেলেরা হয়তো মানে না, আর অর্থনৈতিক কারণে তারা প্রশ্রয় পায়।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি। গাড়ি ব্যাঙ্গালোর ছাড়বার আগে ভদ্রলোক আমাকে কফি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। একবার অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হন নি। এই অনুরোধের আড়ালে আমি আন্তরিকতা দেখেছি। রাজী হই নি অন্য কারণে। স্টলে গিয়ে খেতে হত। গাড়ি ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে তাড়াহুড়ো আমার ভাল লাগে না।

গাড়ি ছাড়বার পরে কৃষ্ণরাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন : আদর যত্ন আমরা আর কী-ই বা করতে পারি। শুধু একটু কফি।

ভদ্রলোক যে দুঃখ পাবেন, আমি তা ভাবতে পারি নি। বললুম : আপনার আন্তরিকতা কি আমি বুঝি নি! এই আদরের কি মূল্য নেই!

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন : ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

ভেবেছিলুম ভদ্রলোক আরও কিছু বলবেন, কিন্তু বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: কী মনে পড়ে?

সে বোধহয় বলবার মতো কথা নয়।

যে কথা মনে আসে, সে শোনবার মতো কথা।

অন্যমনস্ক ভাবে ভদ্রলোক বললেন: হাতে তখন পয়সা থাকত না, অথচ সঙ্গে বন্ধু আছে। হোটেলে গিয়ে কফি চাইতুম ওয়ান বাই টু, মানে এক পাত্র কফিকে দু ভাগে দিতে হবে। কিংবা ডোসা ওয়ান বাই থ্রি। একখানা ডোসা তিন বন্ধুতে ভাগ করে খাব। আপনাদের হয়তো লজ্জা করবে, আমাদের করে নি। ঐ ভাগটুকু দিতে না পারলেই বরং আমাদের লজ্জা হত। এ মন শুধু ছেলেদের নয়, এ হল দেশের সমস্ত দরিদ্র জনের মন। এ প্রথা আজও অনেক জায়গায় আছে।

উত্তরে আমি বললুম: এর পরের স্টেশনে আমরা কফি খাব।

কিন্তু সব স্টেশনে তো কফি পাওয়া যায় না।

কোথাও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

তারপরেই আমি অন্য কথা বললুম: এ দেশের একটা বিয়ে দেখবার আমার শখ ছিল।

এ কথা সত্য নয়। নিজের দেশে আমি বিয়ে দেখি নি। অন্য দেশের বিয়ে দেখবার জন্য কেন ব্যস্ত হব। এ প্রশ্ন করবার আগে আমি কি স্বাতির শখের কথা ভেবেছিলুম, না নিজেরই অজ্ঞাতসারে এ প্রশ্ন করে ফেলেছি!

কৃষ্ণরাও কী বুঝলেন তিনিই জানেন। একটুখানি হেসে বললেন: শখ হওয়া স্বাভাবিক।

নিজের ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি বললুম: এ দেশের সর্বত্র দেখছি আচারের প্রভেদ। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের তো কিছুই মেলে না।

ভদ্রলোকের হাসি তখনও মিলিয়ে যায় নি। বললেন: স্মৃতি-শক্তি ভাল হলে অনেক কিছু বলতে পারতুম।

কৃষ্ণরাও প্রৌঢ় হয়েছেন, কাজেই অনেক কিছু ভুলে গেছেন বললে দোষ হবে না। মেনে নিয়ে আমি বললুম: যা মনে আছে, ততটুকুই যথেষ্ট হবে।

মনে রাখবার মতো কথা হচ্ছে কাশী যাত্রা। ব্রহ্মচারী জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এক দিন সকাল বেলায় কাশী যাত্রা করেছিলুম। সংকল্প ছিল যে কোন সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসী হব। অনেকটা দূর এগিয়েও গিয়েছিলুম। কিন্তু এক ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন: কোথায় যাচ্ছ? এই বয়সেই সংসারে এমন বিরাগ কেন? ব্রহ্মচারী? বিয়ে হয় নি? তাই বুঝি সংসারে মন নেই। চল চল, আমি তোমার ব্যবস্থা করছি। আমার ভাগনী বড় হয়েছে, ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে। কদিন থেকে তারও মন দেখছি উড়ু উড়ু। তাকে আমি তোমার সঙ্গেই বেঁধে দেব। দেখি, তোমার সংসারে মন লাগে কিনা।

ভারি অদ্ভুত শোনাচ্ছিল কৃষ্ণরাও-এর কথাগুলো। এমন ঘটনাও মানুষের জীবনে কখনও ঘটে!

ভদ্রলোক বললেন: মেয়ের বাড়ি পৌঁছে দেখি, সে আজব ব্যাপার। লোকজন ফুলমালা ছাঁদনাতলা—সবই তৈরি হয়ে আছে। বরের জন্যই শুধু অপেক্ষা। দরজায় পা দিতে না দিতেই নাগস্বরমে আলাপ শুরু হল শঙ্করাভরণ।

এ নিশ্চয়ই আপনার বানানো গল্প।

গল্পটা বানানো নয়, ঘটনাটা সাজানো। আমার গুরুজনেরা সাজিয়ে গুছিয়ে আমাকে বার করেছিল কাশী যাত্রায়, আর সমস্ত আয়োজন করে মেয়ের মামা পথের ধারে অপেক্ষা করছিলেন।

ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছেন।

আমার কাছে তখনও সব হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।

বললেন: এ শুধু আমার বেলায় নয়, সকলের বেলাতেই এই

নিয়ম। সব বরকেই কাশী যাত্রা করতে হয়। পরনে শৌখিন বেশ, কানে কোডবেলে। কোডবেলে বোঝেন?

না।

এক রকমের গোল নিমকি, মাকড়ির মতো পরা।

ভারি আশ্চর্য তো!

সবই দেশাচার। এর আগের কথা শুনবেন?

শুনব বৈকি!

বিয়ের চেয়ে বিয়ের উদ্যোগ পর্বটা ছোট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শুনেছি বিয়েটাই সব চেয়ে ছোট পর্ব। তবে ভরসা এইটুকু যে আমাদের দেশের উদ্যোগ পর্বে ছেলেমেয়ের কোন কাজ নেই, কাজ সব অভিভাবকদের। লগ্ন পত্রিকায় ঠিকুজী বিচার হবে, নিশ্চয়ার্থমে হবে বরকন্যাকে আশীর্বাদ আর বিবাহের দিন স্থির, তার নাম মুহূর্তম। দিনকাল যখন ভাল ছিল তখন চার দিন ধরে উৎসব হত। প্রথম দিন ব্রত দিয়ে শুরু হত, আর শেষ হত হোম দিয়ে। বিয়ের আগের দিন বিষ্ণু বা শিবের পূজা, উপবাসী থাকবে বর-কনে। বিয়ের দিন ব্রত উদ্‌যাপন, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে তার ব্রহ্মচারী জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা। মঙ্গল স্নান হবে, নতুন কাপড় পরা, থালি পরানো। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোহিত উভয়কে সতর্ক করে দেবেন। তারপর গানের আসর বসবে।

আমি হেসে প্রশ্ন করলুম: কাশী যাত্রা?

কাশী যাত্রা করেই তো বর কনের বাড়ি আসবে। বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান হবে কনের বাড়িতেই।

আমি যখন নূতন কিছু জানতে চাইব ভাবছিলুম, কৃষ্ণরাও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার দেশে কী আচার?

বিপদে ফেললেন।

কেন বলুন তো?

একটা বিয়েও আমি মনোযোগ দিয়ে দেখি নি।

নিজেও বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিয়ে করতে কেউ রাজী হচ্ছে না।

কৃষ্ণরাও হেসে বললেন: নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব না রেখে অন্যের হাতে ছেড়ে দিন, ব্যবস্থা এখুনি হয়ে যাবে।

বলেন কি!

ঠিকই বলছি। যত দিন আমি মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরেছি, তত দিন একটা মেয়েও পছন্দ হয় নি। যে দিন অন্যের পছন্দে নির্ভর করে ছাঁদনাতলায় বসলুম, সে দিন শুভদৃষ্টিতে মেয়ের রূপ দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছিলুম। তা না হলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এতদিন সংসার করতে পারি!

ভদ্রলোক আগেই তাঁর রসিক মেজাজের পরিচয় দিয়েছেন। সময়টা ভাল কাটবে। হেসে বললুম: আপনার মতো দায়িত্বশীল মানুষ যে খুঁজে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণরাও এ কথার উত্তর দিলেন না, বললেন: এত দূরের পথে নিশ্চয়ই একা বেরোন নি!

সঙ্গী আছে।

সম্পর্ক বোধহয় নেই!

এমন অনুমান কেন করছেন?

শ্রেণীর বিচার তাহলে হত না।

বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হল না যে তিনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেছেন, কিংবা সেই রেলের ভদ্রলোক তাঁকে জানিয়েছে। হেসে বললুম: ও তো দেশেরই বিচার। মনুর বর্ণাশ্রমের বদলে পয়সার বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

গম্ভীর ভাবে কৃষ্ণরাও বললেন: ঠিক কথা। অসবর্ণ বিবাহ আইন করে কায়েম হল, এ সব গোত্রের নতুন নাম শুনছি।

এ আলোচনায় আজ আর লাভ নেই। তাই বললুম: তুঙ্গভদ্রা তো আপনি আগেও দেখেছেন।

কৃষ্ণরাও আমাকে ঠিকই বুঝেছেন, বললেন : আপনি বোধহয় বিজয়নগরের কথা জানতে চাইছেন ?

বললুম : ঠিক তাই।

কিন্তু সে সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে পারব না। ইচ্ছে করে নয়, মনে নেই বলে। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ আমি শৈশবে দেখেছিলুম।

শুনেছি যে একবার দেখলে আর নাকি ভোলা যায় না।

মিথ্যা নয়। মনের ওপর এমন একটা গভীর ছাপ পড়ে যে পুরোপুরি ভোলা যায় না। কী খেয়েছি, কোথায় থেকেছি, তা ভুলে গেছি। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে আজও সেই বন্য প্রান্তরের রুক্ষতা দেখতে পাই। ছোট ছোট ধূসর পাহাড় দিগন্তের গায়ে প্রহরীর মতো দেখেছি। পাথরের ওপর পাথর চাপানো আছে বিপজ্জনক ভাবে। একখানা সরু মাথার পাথরের ওপর বিরাট ভারি পাথর, হাত দিয়ে ছুঁলেই মনে হয় গড়িয়ে পড়বে। কোথাও একটা গাছপালা নেই, কোথাও নেই শ্যামলিমা। শুধু শব্দ আছে। উত্তরে দুরন্ত তুঙ্গভদ্রা সঙ্কীর্ণ খাদের ভেতর দিয়ে বইছে গম্ভীর গর্জনে।

একদা বিজয়নগরের তিনদিক ঘেরা ছিল প্রস্তরের প্রাচীরে। যেখানে প্রাচীর নেই, সেখানে পাহাড়। আর এক দিকে বেগবতী তুঙ্গভদ্রা। তুঙ্গভদ্রা আজ তেমনি আছে, পাহাড়ও আছে, নেই শুধু প্রাচীর। ভেঙে পড়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। নয় বর্গমাইল শহরের সীমানা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে কতকগুলো ইট আর পাথর। তার বাহিরেও যে শহর ছিল বিস্তৃত, এ কথা অনুমান করবার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে ঠিক ন মাইল দূরে এক সুদৃঢ় দুর্গতোরণ দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে শহরে প্রবেশের পথ। পূর্ব সীমায় কামপ্লি ও উত্তরে আনেগুন্দি। বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস না হলে এই আনেগুন্দি গ্রাম তার রাজধানী হত।

ভূমি যেখানে নিম্ন, সেখানে এখন ধান ও আখের চাষ হচ্ছে।

তুঙ্গভদ্রা থেকে একটি খাল কেটে ক্ষেতে জলসেচ হচ্ছে। এ বর্তমানের ব্যবস্থা নয়। বিজয়নগরের সমৃদ্ধির যুগে এখানে যখন ফল ও ফুলের বাগান ছিল, এই ব্যবস্থা তখনকার।

কৃষ্ণরাও বললেন: চারি দিকের ছড়ানো পাথর দেখিয়ে কে একজন বলেছিল ও সব বাঁদরের কীর্তি, কিষ্কিন্ধ্যার বাঁদর ঐ পাথর নিয়ে খেলা করত। বিচিত্র নয়। হনুমান যদি হিমালয় থেকে গন্ধমাদন বয়ে আনতে পারে তো এরাই বা কেন একটার উপর আরেকটা পাথর তুলতে পারবে না!

হাম্পিতে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে শুনেছিলুম। সেই কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম।

কৃষ্ণরাও মেনে নিয়ে বললেন: সত্যিই দেখবার আছে। একেবারে অক্ষত কিছু না থাকলেও যতটুকু আছে তাও মূল্যবান। অন্তত পর্তুগীজ পরিব্রাজক পাএস যা লিখে গেছেন তা কল্পনা করে নিতে একটুও কষ্ট হবে না। এটুকু না থাকলে যেন বিস্মৃত বিজয়নগরের গল্প স্বপ্ন বলে মনে হত।

বিঠল স্বামীর মন্দির আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। তার পাথরের রথটা কিছুতেই ভুলব না। পাথরের চাকা যে পথের উপর চলতে পারে, না দেখলে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের তৈরি এই রথ এক দিন রথের মতো ব্যবহৃত হত। এই বিঠল স্বামীর মন্দির নাকি সম্পূর্ণ হবার আগেই ধ্বংস হয়ে যায়। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় কিংবা তাঁরও আগে এই মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয়েছিল। অচ্যুত রায়ের আমলেও যে কাজ চলেছিল তা জানা গেছে। বিরাট মন্দির, তার তিনটি দরজা। মূল মন্দিরের চারি ধারে আরও পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত গৃহ। কী সুন্দর ভিত্তি, তার খাঁজে খাঁজে কারুকার্য। মানুষ কত যত্নে কত ধৈর্যে এমন কাজ করতে পারে, তাই ভেবে আশ্চর্য লেগেছিল।

মন্দির এখানে একটা নয়। হাজারা রামের সুন্দর মন্দিরটি

ভাল ভাবে রক্ষিত হয়েছে। বোধহয় পঞ্চদশ শতকে দ্বিতীয় বিরূপাক্ষের তৈরি। বাহিরের দেওয়ালে আমরা রামায়ণের চিত্র খোদিত দেখেছিলুম। একটার পর একটা গল্প এমন চমৎকার সাজানো যে মনোযোগ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করেছিল।

পম্পাপতির মন্দিরে বিরূপাক্ষের বিগ্রহ। বিজয়নগর বংশের ইষ্টদেবতা। রাজচিহ্নে কিন্তু বিরূপাক্ষের মুখ নয়, বিষ্ণুর বরাহ অবতার অঙ্কিত ছিল। মন্দির ছিল মতঙ্গ পর্বতেও।

রাজধানীর আর কী অবশিষ্ট আছে?

প্রথমে কী উল্লেখ করা দরকার মনে করতে পারছি না। তবে প্রথমেই একটা উঁচু ভিতের কথা মনে পড়ছে। উঁচু বললে ঠিক ধারণা হবে না। কম করেও এক তলার সমান উঁচু হবে দশেরা ডিব্বা। উৎসবের দিনে রাজার সিংহাসন পাতা হত। কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা জয় করে এসে এটি নির্মাণ করেন।

পর্তুগীজ পরিব্রাজক পাএসের গল্প আমার মনে পড়ল। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে এক মহানবমীর উৎসব তিনি দেখেছিলেন। রাজা বসেছিলেন এই মণ্ডপের উপর পাত্র-মিত্র নিয়ে। সামনে তাঁর সেনাদল, সামন্ত রাজারাও এসেছেন তাঁদের সৈন্য নিয়ে। সবাই মিলে কুচকাওয়াজ হবে। সে কী রাজকীয় ব্যাপার! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পাএস নিজের চোখে দেখে এই আপাত-অবিশ্বাস্য কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ভদ্রলোক বললেন: রাজপ্রাসাদেরও এখন শুধু ভিৎটুকু আছে। তাতে প্রচুর কারুকার্য। দশেরা ডিব্বায় দেখেছি সেনাদল চলছে, দেখেছি নৃত্যপরা সুঠাম কন্যা, হাতি আর ঘোড়ার শোভাযাত্রাও দেখেছি। রাজপ্রাসাদের ভিতে হাতি আর ঘোড়ার সঙ্গে শিকারের দৃশ্য দেখেছি। দরবার গৃহ আজ আর নেই। কাঠের স্তম্ভের উপর কয়েক তলা উঁচু বাড়ি ছিল। আজ শুধু ভাঙা ভিৎটা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আরও অনেক দেখবার জিনিস আছে—জেনানা মহল, কনসার্ট হল, কাউন্সিল রূম। হাতিশালায় সারি সারি হাতি থাকবার ব্যবস্থা ছিল। এখন নাকি জাদুঘর হয়েছে।

কৃষ্ণরাও বললেন: আর একটি গৃহ আমরা দেখেছিলুম। তার ভিতর অসংখ্য সুড়ঙ্গ। কা কাজে এই সুড়ঙ্গগুলি ব্যবহৃত হত, এখনও তা আবিষ্কৃত হয় নি।

আর কিছু?

আরও আছে। একখানা পাথর থেকে খুদে বার করা বিরাট নরসিংহ মূর্তি। দুধারে দুই স্তম্ভ, মাথার ওপরে বাসুকির ফণার মতো ছাদ। নরসিংহ বসে আছেন। তাঁর হাত পা এখন ভেঙে গেছে। এমনি এক-পাথরের মূর্তি আরও দুটি আছে। গণেশের মূর্তিটি আমার ভাল লেগেছিল।

কৃষ্ণরাও বলতে লাগলেন: একটা জিনিস এখন আমার মনে পড়ে। বিজয়নগরের স্থাপত্য রীতিতে যে নূতনত্বের আমদানী হয়েছিল, তখন সে কথা বুঝতে পারি নি। এখন বইপত্রে ছবি দেখে অনুমান করতে পারি। অনেক গম্বুজে খিলানে মুসলমানী ঢং দেখেছি হিন্দুরীতির পাশাপাশি। মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান স্থপতি এক সঙ্গে কাজ করেছে। আজ এই পদ্ধতিকে ইণ্ডো-সেরাসেনিক শৈলী বলা হচ্ছে। তার অজস্র নমুনা।

গাড়িটা একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্টেশনের নাম আমি পড়তে পারি নি, কিন্তু কৃষ্ণরাও কফির গন্ধ পেয়েছেন। হেসে বললেন: গলাটা না ভিজিয়ে আর গল্প বলতে পারছি না।

আমার রাজী না হবার আর কারণ নেই।

২৫

সন্ধ্যা ছটায় ট্রেন গুণ্টাকলে পৌঁছল। কৃষ্ণরাও এখান থেকে হস্পেটের ট্রেন ধরবেন ঘণ্টাখানেক পরে। তিরিশ মাইল পথ, রাত সাড়ে দশটাতেই পৌঁছে যাবেন। আমরা সোজা উত্তরে যাব সেকেন্দ্রাবাদের দিকে।

স্বাতি এসে উপস্থিত হল। গম্ভীর মুখে বলল : বাবা তোমাকে ডাকছেন।

কেন ?

তোমার অনেক ধৃষ্টতা সহ্য করেছেন, আর করবেন না।

এটা তোমার কথা, না মামার ?

যার কথাই হোক, কথাটা সত্যি। সত্য কথা বলবার অধিকার সবারই সমান।

ভুল হল।

কেন ?

সরকার কি সব সত্য কথা বলতে দেয় ! ইংরেজের আমলে গুজব ছিল যে রুশ দেশের একটা লোকেরও সত্য বলার অধিকার নেই।

তর্ক নয় গোপালদা, তর্কে হেরে আমি তোমায় রেখে যেতে আসি নি, আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।

কৃষ্ণরাও কিছু বুঝতে পারেন নি। তাঁর দিকে চেয়ে বললুম : আমার মামাতো বোন। বলছে, মামা মামী আমার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়েছেন।

কৃষ্ণরাও তাড়াতাড়ি নমস্কারটা সেরে নিয়ে বললেন : তাহলে আপনার আর দেরি করা উচিত নয়।

নমস্কার করে আমরা সরে গেলুম।

আমি সরাসরি মামার গাড়ির দিকে এগোবার জন্য পা বাড়িয়েছিলুম, কিন্তু স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : স্টেশনটা একটু দেখব না!

আমি এই স্টেশন দেখার মানে বুঝি। তাই হেসে বললুম : কিছু গোপন কথা আছে বুঝি?

স্বাতি একটা তাচ্ছিল্যের নিঃশ্বাস ফেলে বলল : হুঁ, গোপন কথা বলার লোকই বটে!

বললুম : তাপ্তিকে কী বলেছ?

কী বলেছি?

কী বল নি!

স্বাতি যে একটু ভাবনায় পড়েছে তা দেখতে পেলুম। বিব্রত ভাবে বলল : নিশ্চয়ই কিছু তৈরি করে বলেছে।

তৈরি করে বলেছে, না সত্যি বলেছে, সে বিচার পরে হবে। এখনও অনেক পথ আমাদের এক সঙ্গে চলতে হবে। এখন নতুন কী বলবে বল।

বলতে আমার বয়ে গেছে।

হেসে বললুম : এ তোমার হারের কথা স্বাতি, জিতলে মাথাটা সুস্থ থাকত।

স্বাতি যে আমার কথা মেনে নিয়েছে তা তার আচরণেই প্রকাশ পেল। বলল : আমাদের গাড়িতে একটা বার্থ খালি আছে। বাইরের একটা লোক ঢুকলে মা বাবা কি রাতে ঘুমতে পারবেন!

এই ভাবনা!

আমি তোমার চাদর বিছিয়ে এসেছি। কেউ এলে লোক আছে বলা হবে।

আশ্বস্ত হবার ভান করে বললুম : আমার আর কোন কাজ নেই তো?

আর কী কাজ থাকবে।

নাচ গান বক্তৃতা ?

স্বাতি হেসে বলল : আমাকে ভয় পাও বুঝি ?

পাই বৈ কি।

তবেই দেখ, তোমাকেও হারিয়ে দিয়েছি।

দুজনের হারার ভেতর কোন তফাৎ নেই ?

কোন প্রশ্ন না করে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমি হেরেছি তোমার মুখের কাছে, আর তুমি—

তোমার মনের কাছে বলবে, এই তো। বুদ্ধি থাকলে বুঝতে যে মন জিনিসটা সকলের থাকে না। আমরা তোমার হ্যাংলামির কাছে হেরেছি।

প্রায় একই কথা হল। লোভ চেপে রাখলে ভদ্র ভাষায় বলি মন, আর প্রকাশ হয়ে পড়লে হ্যাংলামি বলি। মেয়েরা শুনেছি হ্যাংলামি ভালবাসে।

তোমার নিজের অভিজ্ঞতা ?

কিছু হয়েছে বৈ কি

একটুখানি পথ চলতে আমাদের অনেক সময় লাগছিল। স্বাতি সেই কথা মনে করিয়ে দিল : গাড়িটা ছেড়ে গেলে কি তোমার ভাল লাগবে ?

রোমান্সে কার লোভ নেই বল।

গাড়ি ফেল করার মধ্যে রোমান্স কোথায় ?

রোমান্স তো তার পরে। তোমার হাত ধরে স্টেশনের বাইরে নতুন পথে নেমে পড়ব। মামা নেই, মামী নেই, শুধু—

ঐ যে বাবা আসছেন !

সত্যিই মামা তোমাকে ভয় পান দেখছি।

আমাকে নয়, তোমাকে।

মামার গাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি এগোতে এগোতে বললুম : আমাকে তিনি আর কতটুকু জানেন ! তোমাকে তো মানুষ করেছেন, তোমাকে চেনেন ভাল করে।

মামা গাড়ি থেকে নামেন নি, দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

গাড়িতে উঠেই স্বাতি বলল : সাংঘাতিক লোককে তুমি খুঁজে আনতে বলেছিলে বাবা, গাড়ির ভেতর লুকিয়ে ছিল। ভাগ্যি সেই ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছিলাম!

কোন্ ভদ্রলোক?

যিনি নেমে পড়লেন এইখানে, তিনিই তো জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে খুঁজছি কি না। বললাম, গরু খোঁজা করছি। ভদ্রলোক হেসে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে, এক বাঙালীবাবু এখানে পোঁছেই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে।

ইচ্ছে হল, সত্যি কথাটা আমি বলে দিই। কিন্তু মামী তা পছন্দ করবেন না। তার চেয়ে যা পছন্দ করবেন তাই বলি : একটু দূরে থাকাই ভাল।

মামা যে ব্যস্ত হয়েছিলেন তা তাঁর কথাতেই ধরা পড়ল। বললেন : দূরে অনেক থেকেছ, এবারে কাছে এসে উদ্ধার কর।

আমি বসবার পরে বললেন : এর চেয়ে ম্যাড্রাস হয়ে দেশে ফেরাই ভাল ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শুয়ে বসে গড়িয়ে আর ভাল লাগে না।

বললুম : ভোর বেলাতেই সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছে যাব।

সেরকম তো বাড়িতেও একদিন পৌঁছতে পারি।

স্বাতি মুখ টিপে হাসছিল। মামী বললেন : তা চটছ কেন! গোপাল কী করবে!

কী করবে মানে! গল্পও তো করতে পারে।

স্বাতি আর চুপ করে থাকতে পারল না, খিলখিল করে হেসে উঠল।

মামা চটে উঠে বললেন : হাসছিস যে!

গোপালদা ভারি খুশী হয়েছে। বলছিল--

মামা বললেন: তামাসা এখন থাক। সবার মুখ বন্ধ দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি।

সে কি বাবা, আমরা তো সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলেছি।

মামী বললেন: কাজের কথা কি ওঁর কানে গেছে!

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: এবারে কোথায় পাহাড় আছে আর কোথায় ঢিপি আছে, সেই কথা ওঁকে শোনাও। খুব মন দিয়ে শুনবেন।

মামা বললেন: হতভাগা কফি আনতে তো বড় দেরি করছে!

দেরি হলেও কফি এল। গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় বলেই তা পাওয়া গেল। ছোট ছোট পেয়ালায় ঢেলে আমরা তা শেষ করে ফেললুম্। মামী খেলেন না। কফির গন্ধ তাঁর হুঁকোর জলের মতো মনে হয়। একবার নাক সেঁটকালে আর উপায় নেই। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও আর মত ফিরবে না।

কফির দাম চুকিয়ে মামা পাইপ ধরালেন। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মামার মনও হয়েছে প্রসন্ন। বললেন: বুঝলে গোপাল, সেকেন্দ্রাবাদটা ঠিক ব্যাঙ্গালোরের পরেই নয়। মাঝখানে আরও অনেক দেখবার জায়গা আছে, যা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি। ভারতবর্ষ কি আর আজকের দেশ, না কালোবাজারীর মতো এ ভুঁইফোঁড় বনেদী!

স্বাতি গম্ভীর ভাবে বলল: কী কী দেখবার জায়গা আমরা না দেখে চলে যাচ্ছি, তাই বল।

বলে একখানা মানচিত্র আমার সামনে এগিয়ে দিল।

এই মানচিত্রটি আমি খুব মনোযোগ সহকারে দেখেছিলুম। আর কৃষ্ণরাওএর কাছেও নানা জায়গার কথা শুনেছি সারাদিন ধরে। কিন্তু সে কথা স্বীকার না করে বললুম: ওটার দরকার হবে না। নিজের দেশের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমার আছে।

তাহলে শুরু কর।

বললুম : পথের সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে ব্যাঙ্গালোর শহরের অবস্থানটাই ভাল করে জানা দরকার।

কী রকম? বলে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : ব্যাঙ্গালোর এই রাজ্যের পাঁচ মাথায় অবস্থিত। আমরা দক্ষিণে উটি থেকে এসেছি। পূবে ম্যাড্রাসের দিকে গেলুম না বড় লাইনের ট্রেনে, পশ্চিমে ছোট লাইনের ট্রেনে হাসানের দিকেও গেলুম না। হাসান থেকে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হচ্ছে। কিছুদিন পরেই শুনতে পাব যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলছে ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোর। তার মানে বঙ্গোপসাগরের তীরে ম্যাড্রাস থেকে আরবসাগরের তীরে ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছনো যাবে ব্যাঙ্গালোরের উপর দিয়ে, এখনকার মতো সমস্ত দক্ষিণ ভারত ঘুরে আর যেতে হবে না। এ ছাড়া একটি পথ উত্তর-পশ্চিমে হুব্‌লির দিকে গেছে, যে পথে গোয়া বা পুনে পৌঁছনো যায়। আব আমরা সরাসরি উত্তরে সেকেন্দ্রাবাদের দিকে চলেছি।

স্বাতি হেসে বলল : রেলের মানচিত্রটা মুখস্থ করে ফেলেছ দেখছি।

উত্তরে বললুম : না। রেলের মানচিত্র পেলে দেখে নিতুম, খেলনা গাড়িতে কোলারের সোনার খনিতে পৌঁছবার ব্যবস্থা এখনও আছে কিনা।

মামা বললেন : যে পথে গেলুম না, সে পথে কী দেখবার ছিল বল।

দেখবার মতো অনেক জায়গা আমাদের দেখা হল না। তবে তার জন্যে দুঃখ নেই এই জন্যে যে আমাদের মতো টুরিস্টদের সে সব জায়গা দেখার সৌভাগ্য কমই হয়।

মামা বললেন : এমন হেঁয়ালি করে বলো না গোপাল, ব্যাপারটা খুলেই বল। না গেলেও কিছু জানা তো যাবে।

বললুম : আরবসাগরের তীরে এ রাজ্যের দুটি জেলা—দক্ষিণ ও উত্তর কানাড়া। সমুদ্রের ধারে ধারে একটি ভাল সড়ক ম্যাঙ্গালোর থেকে উত্তর কানাড়ার প্রধান শহর কারোয়ার পৌঁছেছে। তারপর বেলগাঁও কোলাপুর হয়ে পুনার দিকে গেছে। এই পথের উপরেই লোণ্ডা থেকে গোয়ার প্রধান শহর পানাজি যেতে হয়। ব্যাঙ্গালোর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে গেলে এই লোণ্ডায় গাড়ি বদল করে পশ্চিম ঘাট পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে গোয়ায় ঢুকতে হয়।

মামা বললেন : পথে যেসব দর্শনীয় স্থান আছে তার কথা বল।

বললুম : ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোরে যাবার তিনটি প্রধান পথ আছে—একটি মাইসোর ও মার্কারা হয়ে, দ্বিতীয় পথ হাসানের ওপর দিয়ে আর তৃতীয় পথটি বেলুর ও হালেবিডের ওপর দিয়ে। এই পথে গেলে ধর্মস্থল ভেপুর ও মুদবিদ্রিও দেখা যায়। কর্কল অগুম্বে, উডিপি ও শৃঙ্গেরীও কাছাকাছি।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। একখানা গাড়ি থাকলে এ অঞ্চলের সব দেখবার জায়গা চষে দেখা যায়।

বললুম : ঠিক তাই। বাসে এত ধকল সামলানো কঠিন।

মামা বললেন : কেন, দেশে কি ট্যাক্সি নেই যে বাসে চেপে রাজ্য জয় করতে হবে!

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। আর আমি মামীর মুখের দিকে চেয়ে বললুম : এখন আমাদের ঘরে ফেরার দিকে মন।

মামা ধমক দিয়ে বললেন : তাই বলে কি শুনতেও বাধা আছে নাকি! তুমি যে কারোয়ার ধারোয়ারের কথা বলছিলে, তাই বল।

স্বাতি বলল : ধারোয়ার নয় বাবা, কারোয়ার।

বললুম : ধারোয়ারও আছে। হুব্‌লির পরে বড় স্টেশন হল ধারোয়ার, তারপর লোণ্ডা। কারোয়ার পৌঁছবার পঁয়ত্রিশ মাইল আগে গোকর্ণ একটি তীর্থস্থান, এখানে মহাবলেশ্বর শিবের মন্দির।

শিবরাত্রির সময়ে দেবতাকে রথে তুলে শোভাযাত্রা বের হয়। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপরে একটা রেস্টহাউস আছে।

তারপর ?

তারপরেই কারোয়ার। সুন্দর সমুদ্র সৈকতের জন্যেই এ জায়গার আকর্ষণ। মোটর লঞ্চে কালী নদী বেয়ে লোকে পিকনিক করতে যায়। এখান থেকে অরণ্যময় পাহাড়ের ওপর দিয়ে হুবলি একশো মাইল দূরে।

মামা কতকটা হতাশ হয়ে বললেন: এত তাড়াতাড়ি হুবলি পৌঁছে দিলে!

হেসে বললুম: হুবলি থেকে তেরো মাইল দূরে ধারোয়ার কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। গোকর্ণ থেকে ধারোয়ারের পথের ধারে মগড জলপ্রপাত, আর গোকক ফল্‌স্‌ ও ঘটপ্রভা ড্যাম বেলগাঁও থেকে পুনার পথে।

স্বাতি বলল: তুমি জোগ ফল্‌সের কথা বললে না?

বললুম: সে অন্য পথে। ব্যাঙ্গালোর থেকে হুবলির ট্রেনে না উঠে অন্য ট্রেন ধরলে বিরুর থেকে ভিন্ন পথে ভদ্রাবতী শিমোগা সাগরের উপর দিয়ে জোগ ফল্‌সে পৌঁছবে। জোগ ফল্‌স্‌ থেকেও সড়ক পথে হুবলি আসা যায়। ইচ্ছা করলে আমরা গুন্টাকলে নেমেও হুবলি যেতে পারতুম।

স্বাতি বলল: তার মানে গুন্টাকল পর্যন্ত আর কোন দেখবার মতো জায়গা নেই!

উঁহু, কথাটা ঠিক হল না। হিন্দুপুর নামে একটা স্টেশনের ওপর দিয়ে আমরা এসেছি। সেখান থেকে দশ মাইল দূরে লেপাক্ষী গ্রামে আছে অপরূপ সুন্দর একটি মন্দির। কিংবদন্তী আছে পৌরাণিক যুগের ঋষি অগস্ত্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু আসলে বিজয়নগর রাজার কোষাধ্যক্ষ এই মন্দির নির্মাণ করেন ষোড়শ শতাব্দীতে। মুখোমুখি শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরের মাঝখানে বীরভদ্রের

মন্দির। মন্দিরের ছাদ ও দেওয়ালে আছে শিব ও শিবভক্তদের অনেক চিত্র। নাটমণ্ডপ ও অর্ধমণ্ডপের অপরূপ কারুকার্য। এর দুশো গজ দূরে বিশাল এক নন্দী, তিরিশ ফুট লম্বা আর উঁচু কুড়ি ফুট। এত বড় নন্দী ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই।

স্বাতি বলল: এই মন্দিরের কথা তুমি আগে নিশ্চয়ই জানতে না!

মামা বললেন: তুমি তো আগে এ সব বল নি!

এ সব কথা যে পথে আমি কৃষ্ণরাওএর কাছে শুনেছি, তা বেমালুম চেপে গেলুম। বললুম: এদেশে দেখবার জায়গা এত অসংখ্য যে বলে কি শেষ করা যায়!

মামা বললেন: সেখানে থাকবার জায়গা নেই?

বললুম: আছে বৈকি। হিন্দুপুর থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে, আর যাত্রীরা থাকে ডাক বাংলোয়।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না।

স্বাতি বলল: তার পর বল।

বললুম: গুণ্টাকলে হুবলির ট্রেনে উঠলে ঘণ্টা তিনেক পরে আমরা হস্পেট পৌঁছতে পারতুম। সকলবেলায় হাম্পি বিজয়নগর কিষ্কিন্ধ্যা আর বিকেলবেলায় তুঙ্গভদ্রা ড্যাম। সবই কাছাকাছি। সেখানেও যদি না নামতুম তো হুবলি পৌঁছবার আগে গডগ নামে একটা জংসন আছে। সেখান থেকে শোলাপুরের গাড়ি। এই লাইনে দুটো স্টেশন আছে দেখবার মতো। প্রথমটা বাদামি, গডগ থেকে চল্লিশ মাইল। আর দ্বিতীয়টা বিজাপুর। বিজাপুরের গোলগম্বুজ দেখতে বোম্বাই থেকেও লোক আসে। কিন্তু বাদামি আরও পুরনো বনেদী জায়গা। চালুক্য রাজাদের রাজধানী ছিল বাতাপীপুর বা বাদামি।

মামীর মুখের দিকে মামা এমন ভাবে তাকালেন যেন এই গল্প শোনবার জন্যেই সারা দিন ছটফট করেছেন। দুপুরের আহারের পর

আমি এই সব খবর সংগ্রহ করেছি কৃষ্ণরাওএর কাছে। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাঁরও নেই। কাজেই সারা দুপুর আমরা গল্প করে কাটিয়েছিলুম। আমি জানতুম যে এ সব আমার কাজে লাগবে। বললুম ঃ বাদামির কথাই তাহলে আগে বলি।

বাদামি একা সম্পূর্ণ নয়, প্রতিবেশী আরও দুটো সুন্দর স্থান নিয়ে সম্পূর্ণ। পট্টডকল ও আইহোল। পট্টডকল বাদামি থেকে মাত্র দশ মাইল। লোকে টাঙ্গায় চড়ে যায়। এখান থেকে আইহোল আট মাইল, কিন্তু মাঝখানে মলপ্রভা নদীর জন্য কিছু অসুবিধে। লোকে বাদামি থেকে ট্রেনে একটা স্টেশন এগিয়ে যায়, কিংবা দুটো। বগলকোট স্টেশনে ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। বাদামি থেকে বগলকোট ষোল মাইল দূরে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাতাপি বা বাদামি ছিল চালুক্যদের রাজধানী। তখন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। শক্তিমান ও খ্যাতিমান পুরুষ। মনের মতো করে তাঁর রাজধানী গড়েছিলেন। কিন্তু এই রাজধানীর উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরা এই নগর অধিকার করে, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তার হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার হয়। রাষ্ট্রকূটরা অধিকার করে ঠিক একশো বছর পর ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর মারাঠার অধিকার। ব্রিটিশ প্রভুত্ব পেয়েছে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এই নগরের উপর সবারই যেন লোভ ছিল। তার একটা কারণ বোধ হয় সৌন্দর্য। দুটি পাহাড়ের পাদদেশে এর প্রাকৃতিক শোভা বড় মনোরম। সেইটিই বোধ হয় লোভের কারণ।

যারা পুরাতত্ত্বের ছাত্র কিংবা স্থাপত্য বিদ্যায় অনুরাগী, তাদের কাছে এই গুহা ও মন্দিরগুলি গবেষণার অপূর্ব বিষয়। কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে, এই নিয়ে স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তন অনুসরণ করা চলে। গবেষণা যে হয় নি তা নয়। সে আলোচনা আমাদের জন্য নয়। এইটুকু জেনেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে বাদামির

ব্রাহ্মণ মন্দির তিনটি নির্মিত হয়েছে ষষ্ঠ শতকের ঠিক মধ্য ভাগে, আর জৈন মন্দিরটি তার একশো বছর পরে। গুহা মন্দিরের ভিতর তখন কয়েকটি নূতন জিনিস দেখা দিয়েছে—বাহিরে একটা স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, তারপর একটি বড় ঘর আর পাহাড়ের গভীর অংশে বিগ্রহের জন্য একটি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ। বাহিরটা সাদাসিধে, ভিতরে অজস্র কারুকার্য।

এক নম্বর গুহা মন্দিরের পরিকল্পনা বড় সুন্দর। বারান্দায় শিবের অনুচরগণের নানা ভঙ্গির মূর্তি। বামে দ্বারপাল ও নন্দী, তারই সামনে অষ্টাদশভুজ শিব তাণ্ডব নৃত্যে রত। ভিতরে চতুর্ভুজ বিষ্ণু, তাঁর দক্ষিণে অর্ধনারীশ্বর। পিছনের দেওয়ালে মহিষমর্দিনী দুর্গা। তাঁর দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

দু নম্বর গুহার দুটি দ্বারপাল, সঙ্গে নারী। বারান্দার বামে বরাহ অবতার। গৃহের ছাদে গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণু। আর ষোড়শ মৎস্যবেষ্টিত সুন্দর পথ।

তিন নম্বর গুহা বিষ্ণুর মন্দির। তার ভিতর নানা অবতারের মূর্তি শোভা বৃদ্ধি করছে।

চতুর্থ গুহা জৈনদের। এই মন্দিরে পার্শ্বনাথ আছেন। সর্প-বেষ্টিত গৌতম আছেন, আর আছেন মহাবীর। এ ছাড়া আরও একটি আকর্ষণ আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনে একটি চমৎকার সরোবর দেখা যায়।

স্বাতি হঠাৎ বলে উঠল : আর কটা গুহা আছে গোপালদা ?

ভাল লাগছে না বুঝি ?

মামা বললেন : তুমি তো নিজে এ সব দেখ নি, এত কথা মনে রাখলে কী করে ?

টাটকা শুনেছি বলেই মনে আছে। দেশে পৌঁছবার আগেই হয়তো ভুলে যাব। কিন্তু সে কথা স্বীকার না করে বললুম : নিজের চোখে দেখলে সত্যিই অনেক দিন মনে থাকে, ভোলবার চেষ্টা করেও সব ভোলা যায় না।

মামা মেনে নিয়ে বললেন : কথাটা ঠিক। পড়া জিনিস আমরা ভুলে যাই, কিন্তু দেখা জিনিস ভুলি নে।

স্বাতি বলল : শোনা জিনিস!

উত্তর মামা দিলেন : ও পড়ারই মতো।

তারপর আমাকে হুকুম করলেন : তোমার গল্প বল।

বাদামির গল্প ফুরিয়েছে, এবারে পট্টডকলের গল্প বলি।

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল : সেখানে কটা গুহা?

এ তার তামাসার কথা সন্দেহ নেই। উত্তর তবু সহজ ভাবেই দিলুম : ভয় নেই, দুটি মাত্র মন্দিরের নাম মনে আছে, তার বেশি বলতে পারব না। চালুক্য স্থাপত্যের নমুনা হল আপনাথের মন্দির। দ্রাবিড় শিল্পের নমুনা অনেক, তার মধ্যে বিরূপাক্ষের মন্দিরটিই সব চেয়ে ভাল। জৈন মন্দিরও আছে। সবই প্রায় সপ্তম ও অষ্টম শতকের কীর্তি।

মামা বললেন : এই সব শিল্পের কোন বড় পার্থক্য জানো?

কৃষ্ণ রাও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি আমার মাথায় ঢোকে নি। বললুম : চালুক্যদের কায়দা পলেস্তারার ব্যবহার আর কারুকার্যের অজস্রতা। আর দ্রাবিড় মন্দিরে একটা শিখর থাকবে চারকোণা পিরামিড। পরবর্তী যুগে গম্বুজের ধারণা নাকি এর থেকেই আসে। পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনার অভাব আছে।

এর পর আইহোল। আইহোলের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার কথা জানি নে। কিন্তু সে যে এক সময় মন্দিরের নগর ছিল তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। আজও সেখানে সত্তরটি মন্দির আছে, তার ভিতর তিরিশটি একই প্রাঙ্গণের মধ্যে।

স্বাতি চমকে ওঠার ভান করে বলল : এবারে সত্তরটি মন্দিরের বর্ণনা দেবে তো?

বললুম : মাত্র দুটির বর্ণনা জানি। হিন্দুদের দুর্গা মন্দির আর জৈনদের মেগুটি মন্দির। সব চেয়ে প্রাচীন মন্দিরটির নামও মনে

পড়ছে দেখছি—লধ-খন। এই মন্দিরের বাহিরে আসনের যে নমুনা দেখা যায়, পরবর্তী যুগে তা অতি প্রিয় অলঙ্কার হয়ে দাঁড়ায়। এই মন্দিরগুলিও সব সপ্তম ও অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছে।

স্বাতি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল: বোধ হয় শেষ করেছ?

শেষ মনে করলেই শেষ।

মামা বললেন: এ সব আমাদের দেখাবে না?

দেখবার মতোই জিনিস। কিন্তু দেবতাহীন মন্দির কি আপনার ভাল লাগবে!

বলে মামীর দিকে তাকালুম। তাই দেখে মামা বললেন: বুঝেছি।

কিন্তু কী বুঝেছেন তা বললেন না।

আমি বললুম: আমরা তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুহা দেখবই। অজন্তা ইলোরা যারা দেখবে, তাদের কাছে এ সব ছেলেখেলা। পশ্চিম ভারতে এ রকম গুহার শেষ নেই।

বল কি!

বম্বের এলিফ্যাণ্টা, কানেরি যোগেশ্বরী মণ্ডপেশ্বর, করলা ভাজা বেদ্‌সা, নাসিক আর জুনাগড়ের গুহা। আমরা বাদামি পট্টডকল আইহোল দেখলুম না, দেখব ইলোরা আর অজন্তা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে আবিষ্কার করতে এই দুটি নামই যথেষ্ট।

মামা বললেন: তারপর?

বললুম: গডগে না নামলে হুব্‌লিতে নামার দরকার নেই, সোজা এগিয়ে গিয়ে লোণ্ডা জংসনে নেমে গোয়ার গাড়ি ধরতে হবে। ট্রেন যাবে মার্মাগাও বন্দর পর্যন্ত। গোয়ার প্রধান শহর পানাজি যেতে হলে মাড়গাও বা ভাস্কো-ডা-গামা স্টেশনে নেমে মোটরে বা বাসে যেতে হবে।

স্বাতি বলল : দেখবার মতো শহর নাকি ?

বললুম : পর্তুগীজদের প্রিয় শহর ছিল পানাজি, তারা বলত যে এই শহর দেখা থাকলে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন দেখবার আর দরকার নেই। মাণ্ডবী নদী শহরের ধার দিয়ে বয়ে গিয়ে আরব সাগরে পড়েছে। বম্বে থেকে জাহাজ এসে নদীর জেটিতে ভেড়ে। আশে পাশে যত গির্জা, তত মন্দির। আর এতগুলো সুন্দর সমুদ্র-সৈকত আর কোথাও নেই।

স্বাতি আর কোন মন্তব্য করল না। আমি তার দৃষ্টিতে নেশার মতো বিহ্বলতা দেখলুম। তার সৌন্দর্য-চেতন সরল মনটাকে সে আর লুকিয়ে রাখতে পারল না। বাহিরে এখন রাত্রির অন্ধকার অভিসার।

২৮

ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা সেকেন্দ্রাবাদে পৌঁছলুম। কাল সারা দিনটা ট্রেনে কেটেছে। দুপুর একটার পরে হিন্দুপুরে নিরামিষ খেয়েছি। রাত আটটায় আমিষ খাবার পাওয়া গেছে দ্রোণাচলমে। শুয়ে বসে গড়িয়ে দেহে ক্লান্তি এসেছিল। ভাল করে স্নান সেরে খানিকটা বেড়াতে পারলে মন মেজাজ ভাল হবে।

মামা বললেন : এ রাজ্যে কদিন থাকতে হবে ?

এক দিনও না। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় আমাদের ঔরঙ্গাবাদের গাড়ি।

স্বাতি বলল : এক বেলাতেই সব দেখা হয়ে যাবে ?

দেখবার আর বিশেষ কী আছে !

মামী বললেন : এবারে আর নরককুণ্ডে নিয়ে তুলো না।

ব্যাঙ্গালোরের ওয়েটিং রুমের কথা তাঁর মনে পড়েছে। দশজনের ব্যবহারের জায়গা নিজের বাড়ির মতো পরিষ্কার হয় না। খানিকটা নোংরামি থাকবেই। সেটুকু মেনে নিলেই শান্তি পাওয়া যায়। মামা বললেন : তাহলে স্বর্গের সিঁড়িটা দেখ।

কুলিরা মালপত্র মাথায় তুলে নিয়েছিল। বললুম : রিটায়ারিং রুমে চল।

ঘর খালি ছিল। ব্যবস্থাও ভাল। স্নানের ঘর মামীর পছন্দ হল। বললেন : কাল বড় কষ্ট গেছে, আজ স্নানটা আগে সেরে নিই।

মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে আমরা যখন নিচে নামলুম তখন বোধ হয় আটটা বেজে গেছে। একটা গাড়ি ঠিক করে বেরিয়ে পড়বার আগে

আমি রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম। সারা রাত আমাদের ট্রেনে কাটাতে হবে। কাজেই বার্থ রিজার্ভ করা চাই।

মামা বললেন : এইজন্যেই তোমাকে—

আমরা রিজার্ভেসন অফিসের সামনে এসে গিয়েছিলুম। বললুম : এইখানেই টিকিট কাটতে হবে।

এ দেশের গাড়িতে বোধ হয় ভিড় কম হয়। জায়গা পেতে অসুবিধা হল না। টিকিট কেটে রসিদ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

স্টেশনটি যে বেশি পুরনো নয়, তা আমরা ওপরতলা দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। নিচেও একটি পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া। সামনে প্রশস্ত বাঁধানো পথ বিস্তৃত হয়ে আছে। তারই শেষ প্রান্তে ছোট বড় একতলা দোতলা বাস যাত্রীর অপেক্ষা করছে। পরিষ্কার সুন্দর বাস। শহরের সমস্ত প্রান্তে নাকি অবাধে যাতায়াত করে। পথ-ঘাট চেনা থাকলে আমরাও যাতায়াত করতে পারতুম। মামা বললেন : ও কাজ কোরো না। নতুন জায়গায় বাসে উঠলে অকারণে ঘুরে মরবে। তার চেয়ে একটা ট্যাক্সি ধর। সে-ই সব দেখিয়ে দিক

স্বাতি বলল : আমি সব ব্যবস্থা করছি বাবা।

বলে এগিয়ে গেল।

মামী ব্যস্ত হয়ে বললেন : তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস ?

কিন্তু সে কথা তার কানে গেল না। মামী চিন্তিত ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাই আমিও এগিয়ে গেলুম।

চোখের সামনে একটা মস্ত বড় হোটেল। বাহির থেকে বেশ পরিচ্ছন্ন বোধ হচ্ছে। স্বাতি আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বলল : স্টেশনের খাবারে অরুচি ধরেছে। আজ আমরা এই হোটেলে খাব। তন্দুরি রুটি আর মোরগ মুসল্লম।

কিসের আচার থাকবে ?

স্বাতি একটা কটাক্ষ করল, কিন্তু কিছু বলবার সুযোগ পেল না একটা ট্যাক্সি সে ধরে ফেলেছিল।

এ শহরে কানাড়ী জানবার দরকার নেই, মারাঠী বা তেলুগু না জানলেও চলে। উর্দু এখানকার প্রধান ভাষা। হিন্দীতেই কাজ চালানো যায়। ট্যাক্সিওয়ালাকে স্বাতি হিন্দীতে বলল : কী দেখাবে বল।

যা দেখতে চাইবেন।

আমরা সব দেখব। চিড়িয়াখানা যাদুঘর—

আমি যোগ করলুম : চার মিনার—

ট্যাক্সিওয়ালা এতক্ষণে বুঝেছে যে আমরা বাইরের লোক, শহর দেখতে এসেছি। বলল : মক্কা মসজিদ ফলকনুমা প্যালেস ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি মুসি নদী পাবলিক গার্ডেন্‌স্ হসপিটাল হাইকোর্ট—

ব্যস ব্যস, ওতেই হবে। হাইকোর্টের পর আর কিছু দেখাতে হবে না।

পিছন থেকে মামা বাঙলায় এই কথা বললেন।

সবাই আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। দরাদরির প্রশ্ন তখনি ওঠে, যখন খরচ করতে হয় হিসেব করে। মামা বলেন, খরচ করতেই তো বেরিয়েছি, দরাদরির দরকার কী! পয়সা শেষ হলেই বাড়ি ফিরে যাব। আমি বলি না যে এমন কথা এ দেশে বেশি লোক বলতে পারে না। সামান্য পুঁজি নিয়ে লোকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ আসে, দ্বারকা সোমনাথ যায়, যায় কেদার বদরী অমরনাথ। অনিদ্রায় অর্ধাহারে কোন রকমে তীর্থ সেরে দেশে ফেরে। দেহের স্বাস্থ্য যায়, কিন্তু মনে সম্পদ জমে। আমাদের তীর্থদর্শন সে রকম নয়। আমাদের শখের ভ্রমণ।

গাড়ি চলতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন : এ জায়গাটার নাম সেকেন্দ্রাবাদ না হায়দ্রাবাদ?

শুনেছি এই দুটো পাশাপাশি শহর। হায়দ্রাবাদ পুরনো শহর, আর সেকেন্দ্রাবাদ নূতন। হায়দ্রাবাদেও একটা স্টেশন আছে, সেটা

বড় লাইনের উপর। সেকেন্দ্রাবাদে ছোট বড় দুটো লাইনই আছে। বললুম: এটা তো সেকেন্দ্রাবাদ। কতটা এগোলে হায়দ্রাবাদ সেটা জেনে নিতে হবে।

আমি ড্রাইভারকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। ড্রাইভার বলল যে এই দুই শহরের সীমানা হল হুসেন সাগর। আসল শহর হল হায়দ্রাবাদ। যা কিছু দেখবার সবই সেখানে। হায়দ্রাবাদ থেকে মাইল ছয়েক দূরে সেকেন্দ্রাবাদ শহরের পত্তন হয়েছিল সেনাবিভাগের প্রয়োজনে। জল-হাওয়া ভাল, সুযোগ-সুবিধাও অনেক। তাই একটা নতুন শহর গড়ে উঠল।

আজ সেনানিবাস দেখতে পেলুম না। দেখলুম একটা পরিচ্ছন্ন শহর—বাঁধানো পথ-ঘাট, সুদৃশ্য ঘর বাড়ি আর শৌখিন দোকান-পাট।

এক সময় আমাদের গাড়ি হুসেন সাগরে পৌঁছল। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। এক ধারে বিস্তৃত জল, অন্য ধারেও পথ আর প্রান্তর। গাড়ি ছুটেছে মাঝখানের রাস্তা ধরে। জলের দিক থেকে শীতল বাতাস আসছে অল্প অল্প, রূপোলি রোদে চারিদিক ঝক্‌ঝক্‌ করছে। সূর্যাস্তের পরে চাঁদনি রাতে এই স্থান যে মায়াময় হয়ে উঠবে, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। পিছন থেকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: আজ সন্ধ্যের আগেই কি আমরা চলে যাব?

এ প্রশ্নের মানে বুঝতে আমার সময় লাগল না। বললুম: ইচ্ছে করলে থাকা যায়।

সঙ্গে আর কেউ না থাকলে বলতুম: মায়া বাড়িয়ে লাভ কী!

মাইল চারেক জায়গা জুড়ে এই হুসেন সাগর লেক। এমন জলাশয় নাকি এ রাজ্যে আরও তিনটে আছে। ওসমান সাগর হিমায়াৎ সাগর আর নিজাম সাগর। মুসি নামে একটা নদী হায়দ্রাবাদ শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। ছোট নদী, কিন্তু বড় দুরন্ত। বন্যা লেগেই আছে। ধনে জনে মারে। এই নদীকে জব্দ

করবার জন্যে মাইল দশেক দূরে গান্ধীপেটে তাকে বাঁধা হয়েছে। চুয়ান্ন লাখ টাকার পরিকল্পনা। জলাশয়ের নাম হল ওসমান সাগর। হায়দ্রাবাদ শহরের খাবার জল আসে সেখান থেকে। আর ছুটির দিনে শহরের লোক যায় বাঁধের বাগানে পিকনিক করতে। দু মাইল দূরে হিমায়াৎ সাগর। তেত্রিশ বর্গ মাইল তার পরিধি। আর নিজাম সাগর প্রায় একশো মাইল দূরে, ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয়। পঞ্চাশ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে আছে, আর আড়াই লক্ষ একর জমিতে চাষের জল সরবরাহ করতে পারে।

হুসেন সাগরের জল শেষ হয়ে গেল। ড্রাইভার ডান দিকে ফিরে বলল: আগে পাবলিক গার্ডেনটা দেখিয়ে দিই।

মস্ত বড় বাগান। ভিতরে যাতায়াতের জন্য দুটো গেট। মোটর সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল। খানিকটা এগিয়ে ড্রাইভার বলল: কোথায় দাঁড়াব?

তা আমরা কী জানি!

সে কথা সে নিজেও বুঝেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল: এই বাড়িগুলো আপনাদের চিনিয়ে দিই। টাউন হল জুবিলী হল আর জাদুঘর। এ দিকে চিড়িয়াখানা, বাকিটা বটানিকেল গার্ডেন।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তাহলে দেখবার কিছুই নেই।

ড্রাইভারকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এইটাই কি হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত জাদুঘর?

সে হল সালারজং মিউজিয়ম। বিরাট ব্যাপার। কয়েক দিন ধরে আপনাদের দেখতে হবে।

মামা চমকে উঠলেন: কয়েক দিন!

সাহস পেয়ে ড্রাইভার বলল: তারপর গোলকুণ্ডা ফোর্ট। সেও পুরো এক দিনের ব্যাপার।

মামা আমার দিকে তাকালেন কাতর ভাবে। আমি বললুম: এ জাদুঘরের দরজা তো এখনও খোলে নি। বাগানটি ভালই

দেখতে পাচ্ছি। এক সঙ্গে এত রকম রঙের ক্যানা খুব কমই দেখা যায়।

স্বাতি বলল : চিড়িয়াখানা দেখব না?

দুনিয়াটাই তো চিড়িয়াখানা হয়েছে। তা দেখে আর সময় নষ্ট কেন!

ড্রাইভার বলল : চিড়িয়াখানাটা তেমন ভাল কিছু নয়।

কাজেই আমরা নামলুম না। রাস্তাটা সমস্ত বাগান ঘুরে আর একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এক ধারে খানিকটা নিচু জমি। নানা রকমের বসবার ব্যবস্থা, ফুল পাতাও বেশি। মনে হল, সন্ধ্যে বেলায় এখানে রংবেরঙের প্রজাপতি আসে।

এবারে আমরা হায়দ্রাবাদ শহর দেখব। অন্য কোথাও না গিয়ে মুসি নদীর পুলের উপর এলুম। আফজলগঞ্জের ঘন বস্তি। সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশন থেকে বাস এসে দাঁড়াচ্ছে। অজস্র রিক্স। রিক্সগুলি একটু বেশি উঁচু। চাকা সমানই, উঁচু পাদানিটা। লোকেরা আরাম করে বসতে পাচ্ছে না, বসছে হাঁটু মুড়ে। এমন অস্বস্তিকর আকারের রিক্স তৈরি করবার কী দরকার ছিল বোঝা গেল না। বাস থেকে নেমেই লোকেবা রিক্সয় উঠছে। নদীর পুল পেরিয়ে আবিদ্‌স্ রোড যাবে, কিংবা চার মিনার। দূরের পথ নয়, তবু রিক্সয় উঠছে। ভাড়া নিশ্চয়ই কম। ড্রাইভার সমর্থন করে বলল, দু আনায় এরা অনেকটা পথ নিয়ে যায়। বাঙলায় দু আনার কোন দাম নেই। আমি জানতুম যে এ রকমের যানবাহন আর বেশিদিন চলবে না, দেশে অটো রিক্স আসছে।

মুসি নদীর ধারে রিভার গার্ডেন আছে। বাগান দেখবার সময় আমাদের নেই। দুপুরে আহারের আগেই আমাদের সব কিছু দেখে নিতে হবে। তার পরের জন্য আর কিছু রাখলে চলবে না। মামা-মামীর বিশ্রামের পর বেরোবার আর সময় থাকবে না।

নদীর এপারে আমরা ওসমানিয়া হাসপাতাল দেখলুম, ওপারে হাইকোর্ট। অদ্ভুত সুন্দর বাড়ি। নদীর জলে ছায়াও পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমে স্বাতি ছবি নিল হাসপাতালের। মনে হচ্ছিল দুটো বাড়ি, একটা জলে আর একটা আকাশে। হেমন্তের খণ্ড মেঘ স্থানে স্থানে ঘন হয়ে আছে। তারও ছায়া জলে পড়েছে।

আস্তে আস্তে বললুম : হাইকোর্টের ছবি নেবে না ?

তোমাকে তো দেখিয়েই দিলাম, আবার ছবির কী দরকার !

আরও আস্তে আরও সন্তর্পণে বললুম : দেশে বুঝি দেখবার লোক নেই ! সেই বিলেত-ফেরৎ সাহেবকে দেখাবে না !

মামীর কাছে শুনেছিলুম যে অগ্রহায়ণে স্বাতির বিয়ে ঠিক হয়েছে এক বিলেত-ফেরৎ ছেলের সঙ্গে। তার সম্বন্ধে স্বাতির মন্তব্যও আমি শুনেছি। কিন্তু আমার এই কথায় স্বাতি গম্ভীর হয়ে গেল, বলল : তুমিই ভাল করে দেখ।

চার মিনারে আসবার আগে আমরা আবিদ্‌স্ রোড দেখে নিলুম। হায়দ্রাবাদের ব্যবসাকেন্দ্র। ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি আর ফলক্‌নুমা প্যালেস। হায়দ্রাবাদে সুন্দর প্রাসাদ আরও আছে — চৌমহল্লা আর কিং কোঠি। নিজাম বাহাদুর নাকি এক প্রাসাদে বেশি দিন থাকতে ভালবাসেন না। দিল্লীতেও তাঁর গোটা কয়েক প্রাসাদ আছে। একটা প্রাসাদে এক হপ্তার বেশি থাকেন না। ভারত সরকার এখন একটা রেখে বাকি প্রাসাদগুলো নিয়ে নিয়েছেন। নিজাম বাহাদুরের তাই কষ্ট হচ্ছে।

মামার মুখে এই গল্প শুনলুম। বললেন : সত্যি মিথ্যে জানি নে, তবে চালু গল্প।

নিজাম বাহাদুরের গল্প মামা আরও একটা বললেন। সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর সিনেমা দেখার গল্প। নিজাম বাহাদুরের শখ হল, ছবিঘরে তিনি একা বসে ছবি দেখবেন। ম্যানেজারকে বললেন, তুমি এক দিনের সমস্ত আয় আমার কাছে নাও। কিন্তু ম্যানেজার

রাজী নয়, তিনি একজনের খেয়ালে অসংখ্য লোক ফেরাতে পারবেন না। নিজাম বাহাদুরেরও জেদ আছে। হলটা তিনি কিনেই নিলেন। ছবি দেখলেন, তারপর বিক্রি করে দিলেন।

স্বাতির বোধ হয় এ গল্প বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু কোন সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত হবে না বলেই নীরব রইল। মামার নিজেরও যে সন্দেহ ছিল, তা বোঝা গেল তাঁরই কথায়। বললেন : এ সমস্তই গাল-গল্প। বড় লোকের নামে অনেক গল্পই চলে। সত্য মিথ্যা ভগবানই জানেন।

চার মিনারের একটা ইতিহাস আছে। মুহম্মদ কুলি কুতব শাহর আমলে একবার প্লেগে এ দেশ ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। এক দিন রোগ বন্ধ হল, দেশের লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাজা যেমন দেশ জয় করে এসে বিজয়স্তম্ভ তোলেন, কুতব শাহ তেমনি রোগ জয় করে চার মিনার তুললেন। এ গল্প আমরা ইতিহাসে পড়ি নি, শুনলুম স্থানীয় লোকের মুখে। গাড়ি থেকে নেমে তখন আমরা চার মিনার দেখছিলুম।

বাজারের রাস্তায় ঘণ্টাঘরের মতো একটা সৌধ। সদর রাস্তা ছভাগ হয়ে বেড় দিয়ে আবার মিলে একটা হয়েছে। চার দিকে চারটি খোলা খিলান, আর চার কোণায় চারটি মিনার। একশো আশি ফুট উঁচু। মনে হয় না যে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে এটি তৈরি হয়েছিল।

চার মিনারের নাম আজ ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। এই চার মিনার যারা দেখে নি, নামও শোনে নি কোন দিন, তারাও অনেকে চার মিনার বলতে অজ্ঞান। এমন সরস সিগারেট নাকি নেই, এমন সস্তাও নয় কোন সিগারেট। আমার সহকর্মীরা বলে ফোর্ কাস্ল্স্। মধ্যবিত্তরা কাঁচি খায়, ক্যাপ্স্টান খায়, কিন্তু চার মিনার চলে বড় চাকুরের সমাজেও। ধীরে ধীরে নাকি নামছে, এক দিন সব স্তরে সমান চলবে।

কয়েক পা এগিয়ে আমরা মক্কা মসজিদ দেখলুম। শোনা গেল, এটিও নির্মাণ শুরু করেছিলেন মুহম্মদ কুতব শাহ। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এটি সম্পূর্ণ করেন। কুতব শাহী বংশের শেষ রাজাকে তো তিনিই পরাজিত করেছিলেন। মসজিদের ভিতরে গিয়ে বিস্ময় জাগে। সমস্ত মসজিদটি পাথরে তৈরি, পালিশ করা প্লাস্টারের কাজ, তার উপর ফ্রেস্কো আর জেনো। এক সঙ্গে নাকি দশ হাজার লোক নমাজ পড়তে পারে।

স্বাতি বলল: পায়রা দেখেছ গোপালদা?

পায়রাও দেখবার মতো। এত অসংখ্য পায়রা বোধ হয় আমরা কোথাও দেখি নি।

ট্যাক্সির ড্রাইভারের কাছে শুনলুম যে এই অঞ্চলেই চার মিনারের মতো চার কামান আছে। কামান মানে খিলান। চার দিকে চারটি খিলান আর মাঝখানে একটি ফোয়ারা। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতব শাহীর পঞ্চম সুলতান মুহম্মদ কুলি কুতব শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন।

এখান থেকে আমরা সালারজং মিউজিয়মে এলুম। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ পরে আসবে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। মামা তার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। বললেন: বেলা একটার মধ্যে ফিরলেই হবে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই।

জাদুঘরের টিকিটের দাম একটু বেশি। একখানা টিকিট কাটলে প্রায় সব ঘরই দেখা যাবে। অস্ত্র-শস্ত্র ও হীরে-জহরতের ঘর দেখতে আর একখানা টিকিট লাগে। শিশুদের মহলের জন্য তৃতীয় টিকিট। অসংখ্য ঘর। দরজার উপরে নম্বর দেওয়া। সেই নম্বর দেখে দেখে ঘুরতে হয়, একের পর দুই, তারপরে তিন। নম্বরের দিকে নজর না রাখলে নাকি গোলকধাঁধা থেকে বেরনো কঠিন।

সালারজং নিজাম বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শৌখিন লোক। সারা জীবন ধরে যা সংগ্রহ করেছেন, তাই এখন জাদুঘর হয়েছে। নিজের পৈতৃক বাড়িতেই এই জাদুঘর। ছোটবড় আশিটা ঘর ও বারান্দায় সব জিনিস সাজানো আছে। ভারত সরকার নিজের হাতে নিয়ে সাধারণের জন্য খুলে রেখেছেন। শোনা যাচ্ছে যে মুসি নদীর ধারে নতুন বাড়ি তৈরি করে এই জাদুঘরটি সেখানেই স্থানান্তরিত করা হবে।

আমরা কতকটা রুদ্ধ শ্বাসে সব দেখতে লাগলুম। থামবার সময় নেই, ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখাও চলবে না। কয়েক দিন ধরে যা দেখতে হয়, আমরা তার জন্য কয়েকটা ঘণ্টাও পাচ্ছি না। নিতান্ত চোখ ফেরাতে না পারলে আমরা খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখছি। আবার ছুটছি।

এ আমাদের কলকাতার মতো জাদুঘর নয়। উল্কার পাথর এখানে নেই, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুর কঙ্কাল নেই একটাও, নেই মহেঞ্জোদারোর মাটি খুঁড়ে পাওয়া প্রাচীন শিল্পের নমুনা। এখানে যা আছে, তা নিতান্তই বড় লোকের ব্যবহারের জিনিস বা শখের জিনিস। বিচিত্র আসবাব, কিংখাবের পোষাক, ঝাড় লণ্ঠন, পুতুল, ছবি, কী নেই! হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কাজ আছে, কোরাণের এত ছোট বই আছে যা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। কত কী যে আছে, তার হিসেব দেওয়া এক রকম অসম্ভব ব্যাপার! এরই মধ্যে যে জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেবের ছোরা আর চুনি বসানো নূরজাহানের ছোরা আছে, আমরা তা দেখতে পাইনি।

সেই ফরাসী যুবকটির কথা আমার মনে পড়ল। ওয়ার্ধা থেকে মাইসোরে আসবার পথে সালারজং মিউজিয়ম সে দেখেছে। তার ভাল লাগে নি। কেন লাগে নি, সে কথাও গোপন করে নি। সে এটাকে একটা বড়লোকের খামখেয়ালি সংগ্রহশালা বলে মনে করে। সুরুচির অভাবও সে লক্ষ্য করেছে।

সুরুচির অভাব !

না না, নিন্দা আমি করছি না। এমন অনেক জিনিস সেখানে দেখলাম, যা এই জাদুঘরে স্থান পাওয়া উচিত ছিল না।

কী রকম ?

খুব সস্তা ফুটপাথের জিনিস। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কিনে খানিকক্ষণ খেলে, তারপর ফেলে দেয়। সে সমস্তও যত্ন করে রাখা হয়েছে।

এই ছেলেটির ভাষার দারিদ্র্য আছে। ভারতবর্ষ দেখবার জন্যেই সামান্য ইংরেজী শিখেছে। যা বলতে চায়, তার সবটুকু এখনও প্রকাশ করতে পারে না। সুরুচির অভাব আমরা দেখি নি, বুঝতে পারলুম যে সে তার মনের মতো কিছু দেখতে পায় নি। অজন্তা-ইলোরা যার ভাল লাগে, ভাল লাগে মহাত্মাজীর সহকর্মীদের, বেলুর আর হালেবিডের পরিত্যক্ত মন্দির দেখেও যে মুগ্ধ হয়, তার রুচি জানতে আমার বাকি নেই। সালারজং মিউজিয়ম তার ভাল লাগবে কেন ! আবার এই একটি মাত্র জায়গা দেখে পরিপূর্ণ অন্তরে ফিরে যাবার মতো লোকও সব দেশে আছে।

ফেরার পথে গোলকুণ্ডার দুর্গ দেখার সময় আমাদের হল না। সে প্রায় মাইল চারেক দূরে। মামা বললেন : গোপাল তো সঙ্গেই রইল। খেয়ে দেয়ে ওরই মুখে গল্প শুনব।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল।

ঘুরে ঘুরে যে দুর্গ দেখতে গোটা একটা দিন সময় লাগে, আমি তার ভিতরের খবর কী রাখি ! আমার তো শুধু নামের সঙ্গে পরিচয়। শুধু গোলকুণ্ডা কেন, বেরার বিদর বিজাপুর আহমদনগর নামও তো জানি। বাহমনি বংশের ধ্বংসের পর এই সব ছোট ছোট রাজ্য গজিয়ে উঠেছিল। সম্মিলিত ভাবে তারা হিন্দুদের বিজয়নগর ধ্বংস করেছে। তারপর নিজেরাও এক দিন হারিয়ে গেছে। আজ

শুধু হায়দ্রাবাদ আছে বেঁচে। কিন্তু এ সব তো ইতিহাসের গল্প এ গল্প সবার ভাল লাগবে কেন!

মামী বললেন: আর কোথাও নয়, সোজা স্টেশনে চল।

স্বাতি বলল: আমরা কিন্তু সেই হোটেলটায় খাব গোপালদা।

উত্তর মামা দিলেন, বললেন: বহুৎ আচ্ছা।

২৭

স্টেশনে পৌঁছবার আগে একটা সমস্যা জেগেছিল। হোটেলের সামনে আমরা নেমে পড়ব, না স্টেশনে যাব। দূরত্ব কিছুই না। মুখোমুখি না হলেও সামনা-সামনি বলব। মাঝখানে যানবাহন দাঁড়াবার ও চলাচলের জন্য প্রশস্ত জায়গা, আর একটা চওড়া রাস্তা। সেটি পার হতে হয়। মাইলের নয়, ফার্লঙের নয়, মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান। মামী বললেন : খাবার আগে মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে নাও।

অর্থাৎ স্টেশনে চল।

মামা বললেন : খেয়েদেয়েই একেবারে স্টেশনে চল না। এই দুপুর-রোদে হাঁটাহাঁটিটা বাঁচে।

মামী বললেন : দূর তো কলকাতা দিল্লী, খুবই কষ্টের কথা।

মামার কাছে কষ্টের কথাই। স্টেশনে যাওয়া মানে দোতলার রিটায়ারিং রুমে উঠতে হবে। আবার নামা, আবার ওঠা। খেয়েদেয়ে গেলে একবারের ওঠা-নামার কষ্ট লাঘব হতে পারে। মামা আমাকে বললেন : গোপাল কী বল ?

আমি দুজনের মনটাই দেখতে পাচ্ছি। মামীর পরিচ্ছন্নতা বোধ, আর মামার দৈহিক কষ্ট। স্বাতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে আমার অবস্থাটা উপভোগ করছে। বোধ হয় একটু দয়াই হল, তাই বলল : হোটেলে নিশ্চয়ই মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা আছে।

আলবৎ আছে।

এ আমার কথা নয়, মামার কথা। তিনি জোর পেয়েছেন, বললেন : এ না হলে মেয়ের বুদ্ধি।

স্বাতি তাঁর পক্ষ না নিলে মামার অনিবার্য হার হত।

হোটেলে খাবার বিরাট ঘর আছে, তাতে ছোট ছোট টেবল আর চেয়ার ছড়ানো। এ ছাড়াও আছে সারি সারি ছোট ঘর, তাতে চারজন এক সঙ্গে খেতে পারে। বেয়ারা এমনি একটি ঘরে আমাদের নিয়ে এল।

অর্ডার?

কাঠের পার্টিসনে ছাপানো মেনু টাঙানো আছে। স্বাতি বলল: আমি অর্ডার দেব।

তার পরেই তার মুখ মলিন হল। মামী লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন: কী হল?

কিছু না। তন্দুরি রুটি আর—

বেয়ারা বলল: চিকেন?

না না, চিকেন নয়, মাটন দাও।

মামী বললেন: দাঁড়াও, আমি বলছি। কী কী আছে বল তো?

উত্তর বেয়ারা দিল: চিকেন বিরিয়ানি, ফাউল রোস্ট—

মামী বললেন: সবই এক এক প্লেট দাও।

স্বাতি আশ্চর্য হল। মার কি আজ মাথা খারাপ হয়েছে যে এক সঙ্গে এক টেবলে বসে মুর্গি খাবেন! নিজের কান দুটোকেই বোধ হয় সে বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, মামী তাকে ডেকে বললেন: আমি মুর্গি খাই নে।

আমি তাকে হিন্দীতে সে কথা বুঝিয়ে দিলুম।

মামী আর স্বাতি পাশাপাশি বসেছিলেন। আস্তে আস্তে স্বাতি বলল: ও সব ফরমাস কেন করলে মা! এক টেবিলে—

স্বাতিকে মামী ধমক দিয়ে বললেন: তুই থাম তো!

মামা কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

খেয়েদেয়ে দাম দেবার সময় মামা চটে উঠলেন: ইয়ার্কি

পেয়েছে ! গণ্ডে পিণ্ডে গিলিয়ে তার এই দাম ! আমরা কি ভিখিরী যে দরিদ্র-ভোজন করাচ্ছ !

আশ্চর্য হবার কথাই বটে। মামী যা খেয়েছেন তার দাম দশ আনা। আধ প্লেট করে বিরিয়ানি আমরা খেতে পারি নি। পয়সা নষ্ট হবে বলে আমরা আকণ্ঠ গিলেছি। তার দাম চার টাকাও হল না। খুচরো পয়সা মামা আর ফেরত নিলেন না। বললেন : ঐ পয়সায় তোমরা গেলো।

বাহিরে বেরিয়ে পানের দোকান দেখলুম। কিন্তু পেটে আর জায়গা নেই। বললুম : ছোট ছোট করে সাজ, পয়সা পুরোই দেব।

পরে শুনেছিলুম যে হায়দ্রাবাদে খাদ্য বেশী। সেখান থেকে অন্যত্র চালান যাচ্ছে। মামা বললেন : এমন জানলে মাইসোরে না থেকে হায়দ্রাবাদেই কদিন থেকে যেতুম। কিন্তু আর বেশি দিন এ রকম থাকবে না।

আমি জানতুম যে আমার কাজ শুরু হবে রিটায়ারিং রূমে পৌঁছে। মামা ইজিচেয়ারে বসে পাইপ ধরাবেন। তারপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলবেন, এবারে শুরু কর। সেই ভয়ে তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই বললুম : আমি একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। মিথ্যা কথাও মুখে এল না। বললুম : একটু ঘুরে আসব।

মামা বললেন : কোথায় যাবে সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি।

স্বাতি আমাকে রক্ষা করল, বলল : মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত। নিচে নেমে রেলের কোন লোক পাকড়াবে। গোপালদার ভাণ্ডার মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে।

মামা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন : তবু ভাল। আমি ভেবেছিলুম বোধহয় গোলকুণ্ডা যাবে।

গোলকুণ্ডার ভয়েই তো গোপালদা পালাচ্ছে।

ভয় কিসের?

খেয়েদেয়ে গোলকুণ্ডার গল্প শুনবে বলেছিলে।

গম্ভীর মুখে মামা বললেন: তোমার তো এখন যাওয়া হবে না গোপাল, গোলকুণ্ডার গল্পটা আমায় শুনিয়ে যেতে হবে।

মামী একখানা চাদর টেনে খাটের উপর শুয়ে পড়েছিলেন। স্বাতি বসে ছিল তাঁরই পাশে। মামাকে লুকিয়ে একটা কটাক্ষ করল আমাকে। ভাবখানা এই যে কী হল এবার!

গোলকুণ্ডার গল্প বলতে হলে বাহমনি রাজ্যের কথা দিয়ে গল্প শুরু করতে হয়। দিল্লীতে মুহম্মদ তুঘলুকের শাসন তখন শিথিল হয়ে গেছে। সেই সুযোগে হাসান নামে এক যোদ্ধা দক্ষিণে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। এই বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। বাহমনি নাম কেন হল, তা নিয়ে তর্ক আছে। লোকে বলে, হাসান তার শৈশবে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিল। সেই কৃতজ্ঞতায় নিজের নাম নিয়েছিল আলাউদ্দীন হাসান বাহ্‌মন শাহ। কিন্তু ইতিহাস বলে, হাসান নিজেকে পারস্যের বাহ্‌মন শাহ নামে এক প্রাচীন রাজার বংশধর বলে মনে করত। ব্রাহ্মণের ভৃত্য হিসেবে যে পরিচয় সে গোপন রেখেছিল, রাজা হয়ে সেই পরিচয় প্রচার করল।

এই রাজ্যের রাজধানী হল গুলবর্গায়। তার নূতন নাম হল হাসানাবাদ। ১৫১৮ পর্যন্ত এ রাজ্যের চোদ্দ জন সুলতানের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কারও সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অনাচার অত্যাচার ষড়যন্ত্র নরহত্যা ও হিন্দুবিদ্বেষে এঁদের শাসনকাল কলঙ্কিত। তারই সুযোগ নিয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে পাঁচটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হল বাহমনির বদলে—বেরার বিদর আহমদনগর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা।

বেরার বিদর ও আহমদনগরের ইতিহাস স্বল্প কালের।

দাক্ষিণাত্যে তাদের সব চেয়ে বড় কীর্তি হল বিজয়নগর আক্রমণ ও ধ্বংস। কিন্তু নিজেদের তারা দীর্ঘকাল রক্ষা করতে পারে নি। পেরেছিল শুধু বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। শাহজাহান বাদশাহর সময় এই দুই রাজ্য পরাধীন হবার উপক্রম হয়েছিল। ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের সুবেদার। তিনিই আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার আদেশে যুদ্ধ বন্ধ করতে হয়। শোনা যায় যে দারা শাহজাহানকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবকে বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। দারা ঘুষ খেয়ে এই পরামর্শ দিয়েছেন বলেও লোকে সন্দেহ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই দুই রাজ্য আর রক্ষা পেল না। ঔরঙ্গজেব তখন নিজে বাদশাহ। শেষ বয়সে দাক্ষিণাত্যে এসে বসবাস করছেন। তিনি এদের জয় করলেন।

মামা এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন। এইবারে বললেন: হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহলে কোথা থেকে এলেন?

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে চিন্-কিলিচ খাঁ নিজাম উল মুল্‌ক্ এই নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় তিনি অনেক স্থানে সুবেদারি করতেন। দিল্লীর দরবারে প্রধান মন্ত্রীও হয়েছিলেন। এ সবে বিরক্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যে নিজেই রাজা হয়ে বসলেন।

তখনও মামার ঘুম পায় নি। স্বাতি বলল: গোলকুণ্ডার কথা তো কিছুই শুনলাম না!

পুরাকালে সমতলভূমির উপর রাজধানী হয়তো স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু দুর্গ কোন দিন হয় নি। দিল্লী আগ্রা শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ অনেক পরের যুগের। তার আগে পছন্দ মতো একটা পাহাড় বেছে নেওয়া হত। সেই পাহাড়ের উপর দুর্গ হত তৈরি। গোলকুণ্ডার দুর্গও একটা পাহাড়ের উপরে। দু হাজার ফুট উঁচু একটা ত্রিকোণ পাহাড়ের মাথায় এই দুর্গ। ইতিহাসে এ দুর্গ কুতব শাহী রাজাদের

বলেই পরিচিত, কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক অন্য কথা বলে। দুর্গের ভিতরে তাঁরা প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নমুনা দেখেছেন।

দুর্গের প্রাচীর আজ বিধ্বস্ত। পুরনো হয়ে ভেঙে পড়ে নি, ভেঙেছে অবরোধে ও যুদ্ধে। এ দেশে শান্তিতে আর কে কবে রাজত্ব করেছে! দুর্ধর্ষ ঔরঙ্গজেবও তো এই দুর্গের উপর হানা দিয়েছিলেন। জয় করতে পারেন নি। দশ বছর পরে যে জয় করেছিলেন, সে তো শক্তি দিয়ে নয়, সে কৌশলে। এ গল্প শুনতে হলে গোলকুণ্ডার দুর্গে যেতে হবে।

স্বাতি বলল না যে চল দুর্গে যাই। এ কথাও বলল না যে তোমার মুখেই গল্প শুনব। বললুম: এখন শুনেছি একটা মজার জিনিস দেখতে লোকে গোলকুণ্ডায় যায়।

স্বাতি বলল: মজার জিনিস!

বললুম: হ্যাঁ। দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বারের নিচে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিলে পাহাড়ের উপর থেকে শোনা যায়। আর সেখানকার শব্দ আসে নিচে।

মামা বললেন: সত্যি নাকি!

বললুম: তাইতো শুনেছি। সেকালে সুলতানদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে এইভাবে সঙ্কেত করে উপরে পাঠাবার অনুমতি নেওয়া হত।

স্বাতি এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যে মনে হল এখনই তার বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা। তাই তাড়াতাড়ি বললুম: এই দুর্গের কাছেই গোলকুণ্ডার কবর। কুতব শাহী রাজারা সব মাটির নিচে শুয়ে আছেন।

মামা বললেন: আরও যেসব শহরের নাম বললে, তাদের সম্বন্ধেও কিছু বল।

বললুম: হায়দ্রাবাদ থেকে বিরাশি মাইল উত্তর পশ্চিমে বিদর হল মহাভারতের যুগের বিদর্ভ। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বাহমনি

রাজাদের রাজধানী ছিল এইখানে। তাঁদের পতনের পর বাবিদশাহী রাজারা সেখান থেকেই রাজত্ব করেন। নতুন ও পুরাতন এই দুটো দুর্গ আছে সেখানে। আর নতুন দুর্গের ভেতর তিনটি মহল। রাজাদের সমাধি আর নরসিংহের গুহামন্দিরও দেখবার মতো।

তারপর ?

বললুম: বম্বে লাইনে রায়চুর থেকে নব্বই মাইল উত্তরে গুলবর্গা ছিল বাহমনি রাজাদের প্রথম রাজধানী। এখান থেকেই আহমদ শাহ বিদরে গিয়েছিলেন। এখানকার দুর্গে পনরটি টাওয়ার আছে, আর দুর্গের মধ্যে স্পেনের কর্ডোভার মসজিদের মতো একটি মসজিদ। রাজাদের সমাধিগুলি এক একটি দুর্গের মতো বাড়ি। তার মাথায় এক একশো ফুট উঁচু গম্বুজ।

রায়চুরে কিছু নেই ?

ইতিহাসে বিখ্যাত রায়চুরের দুর্গ। হিন্দু রাজারা এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দে ছিল কাকতীয় রাজ্যের অন্তর্গত। ষোড়শ শতাব্দে এই দুর্গের অধিকার নিয়ে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ লেগে থাকত।

আমি দেখছিলুম যে স্বাতি মামার চোখের দিকে চেয়ে আছে। মামীকে দেখবার দরকার নেই। তিনি চাদর দিয়ে চোখ পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছেন। স্বাতি বলল: তোমার বিজাপুরের গল্প কি বেশি বড় ?

কেন বল তো ?

যদি ছোট হয় তো তাড়াতাড়ি শুনিয়ে দাও।

আর বড় হলে ?

বিকেলের জন্যে থাক।

বললুম: ইতিহাস শোনবার তো দরকার নেই, যা দেখবার আছে তাই বললেই যথেষ্ট। সে আর কতটুকু সময় !

মামা বললেন: আমার ঘুমের কথা ভেবো না। একটা দুপুর আমি বসেও কাটাতে পারি।

হঠাৎ তাঁর পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। বললেন: একটা দুপুর কি ট্যাক্সিতে বসে কাটাইনি!

তা কাটিয়েছেন। কিন্তু শোবার ভাল ব্যবস্থা থাকলে কেনই বা শোবেন না!

মামার পাইপে তখনও খানিকটা ধোঁয়া ছিল। ছাই ঝেড়ে ফেললেই যে তাঁর শুতে ইচ্ছে করবে, তা আমি জানি। তাই বললুম: বিজাপুরে এখন সবাই গোলগুম্বজ দেখতে যায়। শ্রীরঙ্গপত্তনের মতো এই গুম্বজও একটা কবর। বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের। নিচের বাঁধানো চত্বর ছ শো বর্গ ফুট। চারি দিকে চারটি মিনার সাততলা উঁচু, মাঝখানে বিরাট গম্বুজ। একশো চব্বিশ ফুট চওড়া তার ব্যাস। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় গম্বুজ আর একটি আছে। সেটি রোমের সেণ্ট পিটার্স। তার ব্যাস মাত্র পনর ফুট বেশি।

স্বাতি বলল: ভিতরে কিছু দেখবার নেই?

আছে বৈকি। লোকে তাকে হুইস্পারিং গ্যালারি বলে। ফিস ফিস শব্দ, আর তার এগারটি প্রতিধ্বনি।

সে আবার কী?

তাহলে গিয়ে দেখতে হবে। গম্বুজের এক দেওয়ালে ফিসফিস করে কথা কইলে একশো চব্বিশ ফুট দূরের দেওয়ালেও কান পেতে তা পরিষ্কার শোনা যায়।

গিয়ে যখন শোনা আর হবে না, তখন আর কী দেখবার আছে বল।

আলি আদিল শাহর পিতার সমাধি, ইব্রাহিম রোজা, আসর-ই-শরিফ, জুম্মা মসজিদ, আনন্দ মহল, গগন মহল, চিনি মহল, আদালত মহল। আদিল শাহী মহল আর নেই, এখন নব্বুই ফুট খিলান আছে একটা। এরই নিচে দিয়ে নাকি বিজাপুরের শেষ সুলতানকে বিজয়ী ঔরঙ্গজেবের সামনে আনা হয়েছিল। তাজ বাউরি আর চাঁদ বাউরি

নামে দুটো সুন্দর পুষ্করিণী আছে। আর আছে দুটো কামান। তার একটার নাম মালিক-ই-ময়দান। তালিকোটের যুদ্ধে নাকি এটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

মামা ঝিমোতে ঝিমোতে বললেন: ইতিহাসের গন্ধ না থাকলে গল্প কিছুতেই জমে না।

আদিল শাহী ইতিহাস তো দুশো বছরের। তার আগে হিন্দুদের ইতিহাস আছে। তখন বিজাপুরের নাম ছিল বিজয়পুর, আর কল্যাণপুরের চালুক্যদের অধীন ছিল এই শহর। সে একাদশ শতাব্দীর কথা। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দে ছিল দেবগিরির যাদবদের অধীন। হিন্দু অধিকার গেল মালিক কাফুরের হাতে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতেই আলাউদ্দীন খিলজীর পুত্র করিম উদ্দীন হলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা। তারপর বাহমনী অধিকার। আর মোগল বাদশাহের পরে এল নিজামের হাতে। তাঁর হাত থেকে মারাঠাদের হাতে, তার পরে সাতারার রাজাদের হাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশের অধিকার কায়েম হয়েছিল।

স্বাতি হাসছিল। আমি তার হাসির অর্থ না বুঝে বিস্মিত হলুম। তারপরে আমিও হাসলুম। মামা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

স্বাতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত থেকে পাইপটা সংগ্রহ করল। রেখে দিল টেবলের উপর। আস্তে আস্তে বলল: চল এইবারে।

কিন্তু দরজা যে খোলা থাকবে!

দুপুর রোদে টৈ টৈ করতে বেরিও না।

মামীর আদেশ শোনা গেল চাদরের নিচে থেকে। স্বাতি বলল: আমরা বাইরে বারান্দায় বসছি।

রিটায়ারিং রুমের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আমরা বাহিরে এলুম। স্বাতি বলল: এখানকার ওয়েটিং রুম দেখেছি ভারি পরিচ্ছন্ন।

উপর তলায় ওয়েটিং রুম, পরিচ্ছন্ন হওয়াই উচিত। উপর তলার নিয়মই তাই। যত ময়লা, সব নাকি নিচের তলায়। সরকার তাই একতলা বস্তি রাখবেন না। শুনতে পাচ্ছি, এবারে কলকাতার বস্তি হবে কয়েক তলা উঁচু। তাহলে আর নোংরামি থাকবে না। বললুম: মনে হচ্ছে, তুমি এতক্ষণ এরই অপেক্ষা করছিলে!

কিসের অপেক্ষা?

ইচ্ছে হল বলি, এই অভিসারের। কিন্তু মুখে আটকে গেল। পরিচয়ের পুঁজি খুব ভারি নয়. সৌজন্যের অভাব হলে হয়তো বড় কিছু হারাতে হবে। তাই সংযত ভাবে বললুম: এমনি করে বেরিয়ে পড়বার!

এ কথা মনে করবার কোন কারণ ঘটেছে?

অনেকবার হল কি না।

তারপর?

আর কিছু মনে পড়ছে না।

আমার কী মনে হচ্ছে জানো?

জানি নে।

তুমি গোপালদা না হয়ে আর কেউ হলে আমার অনুসরণ করতে না।

হাত ধরে সে টেনে আনত, তাই না!

স্বাতি উত্তর দিল না, প্রতিবাদও করল না। আমার মনে হল,

নীরব থেকে স্বাতি আমাকে তার ক্ষোভের কথা জানিয়ে দিল এর পরে আমি কী বলব, ভেবে পেলুম না।

স্টেশনের বাহিরে প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। ভিতরের প্ল্যাটফর্মে অনির্দিষ্ট কাল পায়চারি করা চলে না। কাজেই আমাদের ওয়েটিং রুমেই এসে বসতে হল। সমুদ্র-সৈকত হলে কবিত্ব করতে পারতুম, পাহাড় হলেও কল্পনা-বিলাস চলে। কিন্তু পথে ঘাটে বা হাটের মাঝে কি মনের দোর খোলে! টেবিলের কাছ থেকে দুখানা চেয়ার সরিয়ে নিয়ে আমরা পাশাপাশি বসলুম।

হঠাৎ আমার ঘরের এক কোণার দিকে নজর পড়ল। এক দম্পতি মুখোমুখি বসে গল্প করছেন। ভারতবর্ষের কোন্ প্রান্ত থেকে এসেছেন, তা বোঝবার উপায় নেই। কেননা পুরুষের বিদেশী পোশাক আর স্ত্রীর ভারতীয় শাড়ি। বাঙালী হলে সিঁথিতে সিঁদুর থাকবে, কিন্তু পাশ থেকে তা দেখা যাচ্ছে না। আমি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বয়সের অনুমান করতে লাগলুম।

মহিলার পরিধানে সূক্ষ্ম রেশমি শাড়ি, হাওয়ায় উড়ছে। ঘরের পাখা বন্ধ নয়, অল্প করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হাওয়াতেই আঁচল খসে পড়েছে। মহিলা তাঁর নিজের হাত বাড়িয়ে বুকের আঁচল তুললেন না, ভদ্রলোক উঠে এসে আঁচলটা তুলে দিলেন।

স্বাতি বলল: অমন হাঁ করে কী দেখছ?

ঐ মহিলাকে দেখছি, আর বুঝতে চেষ্টা করছি যে কে কার হাত ধরে টেনে এনেছে।

মহিলাদের দিকে তো তুমি কখনো তাকাতে না!

সত্যি কথা।

তবে আজ কেন হ্যাংলার মতো তাকাচ্ছ?

হ্যাংলামি করি না বলেই তো আমার বদনাম।

ও কাজ করলে আরও বেশি বদনাম হত, ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকতে পেতে না।

এমনিতেই কি পাই! মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্ত—ট্রেনের কামরা আর এই ওয়েটিং রুম।

এরই মধ্যে গাছের খাওয়া আর তলার কুড়নো!

পেট ভরে খেতে পেলে তো তলার কুড়বো!

স্বাতি বলল: এ সব বুদ্ধি তোমার নতুন হয়েছে দেখছি!

বললুম তো, এই বুদ্ধির অভাবেই নিন্দা হচ্ছে।

এবারে দেখলুম, স্বাতিও সেই মহিলার দিকে তাকিয়েছে। বেশ ভারি চেহারা, কিন্তু তা লুকোবার চেষ্টা করেছেন। অন্তর্বাস একটু উৎকট দেখাচ্ছে। স্বাতি আমাকে বলল: ওদিকে তাকিয়ো না।

কেন বল তো?

অশোভন আচরণ।

আমার, না তাঁর?

স্বাতি বুঝি রাগ করেই বলল: দুজনেরই।

এই সময়ে মহিলা তাঁর মুখ ফেরালেন। আমি চমকে উঠলুম। প্রসাধন বললে ঠিক বোঝাবে না, মহিলা রঙ মেখেছেন। স্নো পাউডারের প্রলেপ তো অনেক আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম, এবারে গালের আর ঠোঁটের রঙও দেখতে পেলুম। ভ্রূ নেই, চোখের উপর দুটো কালো দাগ দেখতে পেলুম। রূপের কথা বলব না। বিধাতার দান নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। চোখ আমি ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। তবু মনে হল, মহিলা তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। রুমালখানা পড়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে সেখানা মেঝে থেকে কুড়িয়ে তুললেন, কিন্তু মহিলার দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি নাক সেঁটকালেন। সঙ্কুচিত ভাবে ভদ্রলোক হাত গুটিয়ে বাথ রুমের দিকে চলে গেলেন।

আমি নজর রেখেছিলুম। দু হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে ভিজে রুমালখানা ধরে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চেয়ারে বসেও সেখানা নাকের উপর নাড়তে লাগলেন। হাওয়ায় শুকোবে।

এবারে ভদ্রলোককে দেখা দরকার। নিঃসন্দেহে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু কত তা অনুমান করা শক্ত। মাথার চুল একটু বেশি কালো, দাঁতও একটু সাদা বেশি। তিনি যদি কলপ দেওয়া চুল আর বাঁধানো দাঁত বলেন, তাহলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে না।

স্বাতি বলল : শোন।

কিন্তু আমার দৃষ্টি আবার মহিলার দিকে পড়েছে। তাঁর শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রুমালের একটা কোণা ছেড়ে দিয়ে আঁচলের একটা কোণা ধরলেন। নিজের হাত দুখানা নামিয়ে মহিলা তাঁকে আঁচল তুলে দেবার সুবিধা করে দিলেন।

ঘরের আরও কোন যাত্রী কি এঁদের লক্ষ্য করছেন! বোধহয় কেউ না, কিংবা তাঁদের কৌতূহল শেষ হয়ে গেছে। ঘরে যাঁরা আছেন, এখন তাঁরা চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

স্বাতি বলল : কী করছ বল তো?

চোখ যে ফেরাতে পারছি নে!

তবে এস, আমরা ঘুরে বসি।

বলে সত্যিই সে তার চেয়ার ঘুরিয়ে নিল।

আমিও ঘুরে বসে বললুম : কাজটা ভাল হল না।

কেন?

প্রথমত অশোভন হল, আর দ্বিতীয়ত এবারে নিজেদের কথা ভাবতে হবে।

তাকিয়ে থাকার চেয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকা বেশি অশোভন হবে না। আর ভাবনার কথা! পরের ভাবনা আমরা কেন ভাবতে যাব!

কাজেই নিজেদের ভাবনা ভাবব।

স্বাতি আর তর্ক করল না। তার কাজের কথা ছিল, বলল: তোমার পূজোর ছুটি কত দিন?

সে বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে।

তবে কী হবে?

স্বাতির ভাবনা দেখে আমার হাসি পেল। বললুম: চাকরিটা যাবে।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: সত্যি বলছ?

যাওয়া উচিত, কিন্তু যায় না। সরকারী চাকরির নানা আইন-কানুন, নানা মারপ্যাঁচ। কারও চাকরি নিতে যত কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তার চেয়ে পরিশ্রম কম জ্বালাতন সহ্য করার। ইচ্ছে করে আসি নি বললে মাইনে দিও না। দু টাকা দিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট কিনে দিলে সাত খুন মাপ। এ সব ব্যাপারে আমাদের কোম্পানী ভাল। অতশত বাঁধাবাঁধি নেই। ট্যাঁ-ফোঁ করলেই তাড়িয়ে দেবে।

ফিরে গিয়ে তুমি কী বলবে?

সত্যি কথাই বলব। সঙ্গী এমন ভাল পেয়েছিলুম যে ফিরে আসতে ইচ্ছে হল না।

তামাসা রাখো।

তামাসা কেন বলছ! তোমারই কি আজ ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, না ফিরে গিয়ে তোমার ভাল লাগবে!

তুমি বেশ মন-গড়া কথা বলতে পার।

মনের কথা মনই গড়ে। নিজের মনের কথা যদি সত্যি হয় তো পরের মনের কথাই বা কেন মিথ্যে হবে!

পরকে চেন না বলে।

আর যাকে চিনি?

তাকে সারাক্ষণই ভুল বোঝ।

বললুম : একটা সত্যি কথা বলবে ?

আমি তো মিথ্যা বলি না।

উত্তর তাহলে এড়িয়ে যেয়ো না।

বললুম : অঘ্রাণে কি সত্যিই তুমি বিয়ে করছ ?

স্বাতি হেসে বলল : এ তো আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তোমার তাতে দরকার ?

তোমার ব্যক্তিগত বলেই জানতে চাইছি। তুমিও তো আমার ব্যক্তিগত কথা জেনে নিলে !

সব কি জেনেছি! জানবার কথা তো সবই রয়ে গেছে।

অঘ্রাণে যদি তোমার বিয়ে না হয় তো সবই জেনে নেবার সুযোগ পাবে।

বিয়ে হলে বুঝি সুযোগ পাব না ?

কী করে তা পাবে ! তুদিন পর পরের স্ত্রী হবে জেনেও কি সব কথা বলা যায় !

স্বাতির দৃষ্টিতে অপরিমিত পুলক দেখলুম। বলল : হিংসে হচ্ছে না কি !

তার পরেই বলল : ভাবনা কিসের ! তোমারও বিয়ে হবে।

স্বাতি সত্যিই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে। তাই বললুম : আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নি।

তোমার দরকারটা যে প্রমাণ করতে পার নি !

এ রকম কোন চুক্তি ছিল না।

আমি বাজে কথার আলোচনা পছন্দ করি না।

আমার প্রয়োজনটা যদি বেয়াড়া হয় ! যদি বলি—

থাক থাক, বলতে হবে না।

বলে স্বাতি আমায় থামিয়ে দিল।

হেসে বললুম : এইবারে বল।

কিন্তু বলবার সুযোগ সে পেল না। ওধারে সেই মহিলার চাপা

গর্জন শুনে আমরা ফিরে তাকালুম। মহিলার হাতে এক গ্লাস জল, সেই জল তিনি দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে ফেললেন। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন চোরের মতো। বুঝতে কষ্ট হল না যে স্বামীর গড়িয়ে দেওয়া জল মহিলার পছন্দ হয় নি। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাসটা সংগ্রহ করে ফ্লাস্কের মাথায় পেঁচিয়ে রাখলেন। তারপরে বাহিরে ছুটে গেলেন। তাঁর হাঁকডাকও শুনতে পেলুম। রিফ্রেশমেণ্ট রুমের বেয়ারাদের বোধ হয় ডাকাডাকি করছেন।

চুপি চুপি স্বাতি বলল : প্রার্থনা করি, তোমার যেন এমনি একটি বউ হয়।

ও তো দশ বছর পরের অবস্থা।

মানে ?

প্রজাপতির কথা শোন নি বুঝি ?

না।

প্রজাপতি সবই লিখে রেখেছেন। বিয়ের পর প্রথম দশ বছর স্বামী কথা কইবে আর স্ত্রী শুনবে, আর তার পরের দশ বছর স্ত্রী কথা কইবে আর স্বামী শুনবে। তারপর স্বামী স্ত্রী দুজনেই কথা কইবে, কিন্তু কেউই শুনবে না।

স্বাতি তার ছোট রুমালখানা মুখে চেপে হেসে উঠল। বললুম : এই প্রবাদটা আমি একটু বদলে দিতে চাই। প্রথম দশ বছর স্বামী কবিতা শোনাবে আর স্ত্রী শুনবে, পরের দশ বছর স্ত্রী 'সারমন' দেবে, মানে উপদেশ—আর স্বামী শুনবে। তারপর নিত্য কলহ।

বিয়ের আগে কী হবে বললে না ?

গম্ভীর ভাবে বললুম : প্রজাপতির যুগে তো পূর্বরাগ ছিল না। তাই তিনি কিছু লিখে যান নি। বলতে সাহস হচ্ছে না যে দুজনেই কথা কইবে আর দুজনেই শুনবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : দশটা বছর অত্যন্ত বেশি সময় ! দশ বছর কারও কবিতা শোনা সম্ভব নয়। ওটা দশ মাস কর, কিংবা—

কথাটা শেষ করবার আগেই আবার সোরগোল উঠল। সোরগোল কেন, মনে হল একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। কাচের গ্লাসে বরফ জল নিয়ে বেয়ারা আসছিল। ওধারের ভদ্রলোক ছুটে যাচ্ছিলেন, দেওয়ালের ধারে জলের উপর তাঁর পা হড়কে গেল। পড়ে যান নি, কিন্তু দেওয়ালে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। ব্যাপারটা এত অল্প সময়ে ঘটল যে আমরা সবাই চমকে উঠেছিলুম। যাত্রীরা যাঁরা জেগে ছিলেন, তাঁরা হায় হায় করে উঠলেন। আর বেয়ারা হতভম্ব হয়ে গেল। স্বাতি আমার হাত টেনে না ধরলে আমি হয়তো ছুটে চলে যেতুম।

পরে বুঝলুম যে স্বাতি আমার হাত চেপে ধরেছে সঙ্গত কারণেই। ভদ্রলোক কপালে হাত দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী এবারে তৎপর হয়ে উঠেছেন। বেয়ারার হাতের জলে রুমাল ভিজিয়ে স্বামীর কপালে ধরেছেন চেপে। তাঁর রেশমি শাড়ির হাল্কা আঁচল খসে পড়বার আগেই একটা কোণা কোমরে গুঁজে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

স্বাতি আমার হাত ছেড়ে দিল তার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পর। বলল : কী যে কর, বুঝি নে।

বসে বসে মুখ ফিরিয়ে আমরা দেখলুম যে ভদ্রলোক অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। তাঁর কপালটা কেটে যায় নি, একটু ফুলে উঠেছে মাত্র। বেয়ারাকে আর এক গ্লাস জল আনতে বললেন।

মহিলা যখন তাঁর চেয়ারে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বড় অসুস্থ বোধ হল। গায়ের জামা ভিজে দেখাচ্ছে, মুখের রঙও মনে হল অনেকটা মুছে গেছে। বিড়বিড় করে কী বললেন তা শোনা গেল না।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে তিনি স্নানের ঘরে গেলেন। ভদ্রলোক দেখলুম, ছোট একটা এটাচি কেস তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

আমার কৌতূহলের সীমা নেই। স্বাতিকে বললুম: তুমি একটুখানি একা বস, ব্যাপারটা আমি বুঝে আসি।

বলে সেই আহত ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম: আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি?

আমি ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিলুম, কিন্তু ভদ্রলোক উত্তর দিলেন বাঙলায়, বললেন: আমাকে!

এবারে আমিও বাঙলায় বললুম: আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

তা হবে। সারা রাত ট্রেনে কেটেছে, রিটায়ারিং রুমে জায়গা পাই নি। সন্ধ্যাবেলায় জায়গা পাবার ভরসা পেয়ে স্টেশনেই বসে আছি। বাইরে যা রোদ!

ভদ্রলোক বোধ হয় স্ত্রীর কথা ভেবেই বেরোতে সাহস পান নি। বললুম: বেড়াতে এসেছেন বুঝি!

কতকটা তাই। বম্বে এসেছিলুম কেনাকাটা করতে। উনি বললেন, হায়দ্রাবাদেও কিছু কেনবার আছে। ঐ যে কী বলে আপনাদের—সূতোর শাল--

নামটা ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না।

কেনা কাটা হয়ে গেছে বুঝি!

পাগল হয়েছেন! এই তো পৌঁছলুম। দশটার বদলে প্রায় বারোটায়। রাতে থাকবার একটা ব্যবস্থা হোক, তারপর বেরোব।

কেন জানি না ভদ্রলোকের জন্য আমার ভারি মায়া হল। বললুম: আমি আপনার ব্যবস্থা করে দেব।

ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসে বললেন: সত্যি বলছেন?

আশ্বাস দিয়ে বললুম: আমাদের রিটায়ারিং রুম আমরা পাঁচটার পরেই ছেড়ে দেব। আপনার জিনিসপত্র ঢুকিয়ে খাতায় আপনার নাম লিখে তবে ছাড়ব।

ভদ্রলোক আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন: কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি নে।

তার দরকার নেই।

একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোক বললেন: হায়দ্রাবাদ আপনাদের দেখা হয়ে গেছে?

যতটা পেরেছি দেখেছি।

এখানে একটা বিখ্যাত দরগা আছে শুনেছি, পীরের দরগা।

দরগা! কোন দরগা তো দেখি নি! চার মিনার আর মক্কা মসজিদ দেখেছি।

ভদ্রলোক বললেন: বম্বেতে শুনলুম, হায়দ্রাবাদের রগায় পীরের সিন্নি দিলে যে কোন মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সত্যি!

সত্যি বলেই তো অনেকে বিশ্বাস করে!

এই নিঃসন্তান দম্পতি এখানে কেন এসেছেন. আমার সে কথা বুঝতে বিলম্ব হল না। সূতোর শাল একটা ছল মাত্র। তার আড়ালে আছে গভীর বেদনা। এতক্ষণ ধরে যা দেখছিলুম, তা এই বেদনারই বিষণ্ণ রূপ। এক সময় আমি বিদায় নিয়ে উঠে এলুম। আমার প্রতিশ্রুতির কথা ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন।

ভেবেছিলুম যে স্বাতিকে এঁদের সব কথা বলব। কিন্তু বলতে পারলুম না। মানুষের বেদনা নিয়ে পরিহাস চলে না। চায়ের টেবিলে মামাকে বললুম এঁদের প্রয়োজনের কথা। মামা রাজী হয়ে বললেন: এখনি ওঁদের আসতে বল না!

স্বাতির মুখে যেন হাসি আর ধরে না।

মামী বললেন: অত হাসছিস কেন!

হাসতে হাসতেই স্বাতি বলল: ওঁরা ঘরে এলেই দেখতে পাবে।

দেখে আমার দরকার নেই। আমি বেরোলে তোমাদের যা ইচ্ছে কোরো।

আমি দেখলুম, হাসিতে স্বাতির বিষম লাগার উপক্রম হয়েছে।

ব্যস্ত ভাবে তার রুমাল খুঁজছে জামার ভিতর। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। কেন জানি না, আমি আমার রুমালের জন্যে পকেটে হাত দিয়েছিলুম। ছোট একখানা হাল্কা জিনিস আমার হাতে ঠেকল। অনুমানে মনে হল, ওটা স্বাতিরই রুমাল। কিন্তু আমার পকেটে এল কী করে? আমি তো চেয়ে নিই নি, সেও নিশ্চয়ই দেয় নি। দিলে সে কেন অমন করে খুঁজতে যাবে! রুমাল না পেয়ে সে আঁচলের প্রান্তেই মুখ মুছল।

আমি স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। ওয়েটিং রুমে ভদ্রলোক যখন আঘাত পেয়েছিলেন আমি তখন স্বাতির হাতে রুমাল দেখেছি। গন্ধ পেয়েছি চন্দনের আতরের।

তারপর?

তারপরের কথা আর মনে পড়ছে না।

বিকেল পাঁচটার পরেই আমরা সেই বাঙালী দম্পতিকে ঘর ছেড়ে দিলুম। আর্দ্র চোখে ভদ্রলোক অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। আমাদের ঔরঙ্গাবাদের গাড়ি ছটার পরে ছাড়বে।

২৯

ঔরঙ্গাবাদের গাড়িতে গুছিয়ে বসেই মামা বললেন : আমাদের এবারের যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল।

মামী বললেন : তোমাদের যাত্রা শেষ কি আর কোন দিন হবে! বাড়ি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বলবে, চল, দিল্লীতে দরবার বসছে।

তবে এখান থেকেই দিল্লী চল।

স্বাতির বিয়ে বুঝি দিল্লীতেই দেবে?

এ কথার উত্তর মামা দিলেন না। কিন্তু মামী তাঁকে নীরব থাকতে দিলেন না, বললেন : তোমার মতলবখানা কী?

মতলব খারাপ নয়। একটি মাত্র সন্তান। সে যাতে সুপাত্রে পড়ে, তার চেষ্টার ত্রুটি করব না।

মামার উত্তরটি আমার ভাল লাগল। সব চেয়ে সত্য কথাটি তিনি বললেন, অথচ তাঁর মনের কথাটি ধরা গেল না। মামী বিরক্ত হলেন।

স্বাতি বলল : ঔরঙ্গাবাদ থেকেই আমরা অজন্তা আর ইলোরা দেখব, তাই না?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

তারপরে?

তারপর সোজা কলকাতা।

মামা আমাদের দলে যোগ দিলেন, বললেন : আর কদিন এমন চলবে?

আমি হিসেব করে বললুম : আজকের দিনটা বাদ দিলে আর দুদিন, তারপর আমরা কলকাতার ট্রেনে উঠব।

তারপর আমাদের এই আনন্দের দিনগুলোর উপর চিরদিনের

মতো যবনিকা পড়বে। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েই আছে, শুধু সবার ফেরার অপেক্ষা। দেখতে দেখতেই বিয়ের বাজার শুরু হবে। নিমন্ত্রণ পত্র, বাড়ি বাড়ি ঘোরা। রশুনচৌকি, ছাঁদনা তলা। তারপর আর স্বাতিকে দেখতে পাব না। ঠিক এমন সময় তার সঙ্গে দেখা না হলে কি চলত না!

কিন্তু আমি তো কিছুর প্রত্যাশা করে বের হই নি। আমি বেরিয়েছিলুম এই পরিবারকে সাহায্য করতে। যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, কর্তব্য পালন করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে। এতেই তো আমার তৃপ্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন হচ্ছে না! কেতকীর মতো বুকে যে কী বিঁধছে! সৌরভের চেয়ে কাঁটার বেদনা আজ বেশি মনে হচ্ছে।

স্বাতি কিছু বলতে চাইল না, কিছু হয়তো বলবেও না। তার দরকার সে মনে করে নি। সে জানে যে ভালবাসার বানে গা ভাসিয়ে দেওয়া চলে না। জীবনের একটা গভীর অর্থ আছে। তার নানা সমস্যা নানা প্রয়োজন। মনের বদলে বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। জীবনে গোঁজামিল চলে না, তাই খেয়ালকে প্রশ্রয় দিলে পরে পস্তাতে হবে।

মামা বললেন: গোপাল কী ভাবছ?

কিন্তু উত্তর দেবার সময় আমি পেলুম না। এক ভদ্রলোক হুড়মুড় করে গাড়ির ভিতর উঠে পড়লেন। সঙ্গে শুধু বিছানাপত্রই নয়, দুটো বড় বড় বস্তা। কুলিতেই গাড়িটা ভর্তি হয়ে গেল।

মামী আর্তনাদ করে উঠলেন। মামা বললেন: এ কী হল?

আমি রুখে দাঁড়িয়ে বললুম: এ রিজার্ভড্ কম্পার্টমেণ্ট!

কথাটা আমি ইংরেজীতে বলেছিলুম, কিন্তু ভদ্রলোক হাত জোড় করে হিন্দীতে উত্তর দিলেন: দোহাই আপনার, ভয় সঙ্কোয় ভয় দেখাবেন না। রাত দশটায় কান ধরে নামিয়ে দেবেন।

এত মালপত্র কেন, কোথায় রাখবেন এ সব

যদি আদেশ দেন তো ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

আমি আদেশ দেব কেন ?

আদেশ না দেন তো এক টুকরো কাগজে লিখেই দিন।

কি লিখব ?

আপনি ফেলে দিয়েছেন।

এ তো আরও মারাত্মক কথা।

তা না হলে আমার কোম্পানী মানবে না, বলবে বেচে খেয়ে ফেলেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কী আছে ওর ভেতরে ?

দেখবেন ! আচ্ছা দেখাচ্ছি আপনাকে।

ভদ্রলোক নিজের জিনিসপত্র সব সাজিয়ে রাখলেন, কুলিদের পয়সা মেটালেন গুনে গুনে। তারপর একটা বস্তার মুখ খুললেন তার ভিতরের জিনিস বার করবার জন্যে।

স্বাতি উঠে গিয়ে মামীর কাছে বসেছে। আর মামা হয় তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমিও হতাশ হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি।

ভদ্রলোক কতগুলো লোহার যন্ত্রপাতি বার করলেন। তারই থেকে একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ বলুন তো, এটা কী।

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বললুম ঃ এ রকম জিনিস সাইকেলের চাকায় দেখেছি।

ঠিক ধরেছেন। এর নাম হাব্। সরুটা সামনের চাকার আর পিছনের চাকার জন্য এই মোটা আকারেরটা।

বলে আর একটা হাব্ আমার হাতে দিলেন।

তা এগুলো নিয়ে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন ?

সেই কথাই তো আপনাকে বোঝাচ্ছি।

গাড়িটা দুলে উঠল। বোধ হয় ছাড়ছে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। এক ধারে নয়,

দু ধারেই লাগালেন। বললেন : তাড়াতাড়ি ভাল করে এঁটে দিই, তা না হলে আবার কোন শর্মা হয় তো উঠে পড়বে।

আপনার নাম বুঝি শর্মা ?

এই কেলেঙ্কারি !

ভদ্রলোক গাড়ি ছাড়তে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, তারপর আমার পাশে বসে বললেন : সব জায়গায় আজকাল এই কেলেঙ্কারি করে ফেলছি। একটু জল আছে স্যর ?

মামীর মুখের দিকে চেয়ে আমার আতঙ্ক হল। নিজেদের গ্লাসে দিলে সে গ্লাস জানলা দিয়ে ফেলে দিতে হবে। বললুম : আপনার গ্লাস আছে ?

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে তাঁর ঝোলা থেকে একটা ঘটি বার করলেন, আমিও আমাদের কুঁজো থেকে তাঁকে জল ঢেলে দিলুম। ভদ্রলোক তৃপ্তির সঙ্গে অনেকটা জল খেলেন। তারপর মুখ মুছে বললেন : ব্রাহ্মণত্ব আর কিছু রইল না।

বলে ঘটিটা ঝোলায় রেখে গল্প করতে ফিরে এলেন।

গাড়ি ছাড়বার পরেই ভদ্রলোক তাঁর যন্ত্রপাতি বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে ফেলেছিলেন। এই তৎপরতা দেখে মামার বুঝতে বাকি ছিল না যে আমাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যেই এ সব বার করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁর হয়তো ভয় ছিল, আমরা তাঁকে বার করে দেবার চেষ্টা করব, অন্ততঃ তাঁর বস্তা দুটো। এত জিনিস সঙ্গে নেবার অধিকার নেই, অথচ সে সব কিছুই করা সম্ভব হল না। শেষটায় আপোস করতে হল, বললুম : কী কেলেঙ্কারির কথা বলছিলেন ?

ভদ্রলোক এখন অন্য মানুষ। প্রচুর গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন : নামের কেলেঙ্কারি। বাপের দেওয়া নাম হল শ্রীরামচন্দ্র শর্মা। বিলেতী কায়দায় আমরা লিখি আর. সি. শর্মা। এটা আমার প্রাইভেট নাম, মানে আত্মীয় বন্ধুর জন্য। একবার চাকরি করব বলে সরকারের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম। বিজ্ঞজনের পরামর্শে লিখেছিলাম এস.

রাম। ঐ রাম শব্দটির ভিতর নাকি বহু যুগের অত্যাচার ও বঞ্চনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। বর্তমান সরকার তাঁদের চাকরির ধাপে ধাপে তার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। তারপর সরকারের চাকরি ছেড়ে যখন কোম্পানীর কাজে গেলাম, দাদামশাই উপদেশ দিলেন শর্মাটাকে ছেটে ফেলবার। তিনি নিজে শর্মা, দিল্লীর বড় দপ্তরে বসে বড় বড় কোম্পানীকে চরিয়ে খান। পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে, সেই ভয়ে নাতির নাম পালটে দিলেন আর চন্দ্রা। আমি যে কোন হুঁদে শর্মার নাতি, সে কথা আর কেউ বুঝতে পারবে না।

আমি হাসছিলুম। শর্মা বললেন: এখনি হাসবেন না স্যর। আমি এখন একই সঙ্গে দুটো কোম্পানীর চাকরি করি দু নামে—এস. রাম ও আর. চন্দ্রা। নানা দুর্ভাবনায় বাপের দেওয়া শর্মা নাম মুখে এসে গিয়েছিল। সত্যিই কোন দিন একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলব।

ধরা পড়লে কী করবেন?

ধরা পড়ব! কে ধরবে! সবাই তো আমারই মতো। তফাৎ শুধু সাহসের বেলায়। আমি নিজে করি, নিজের নামে করি। অন্যেও করে, কিন্তু স্ত্রী পুত্র পরিবারের নামে, এমন কি শালা ভায়রাভাই পর্যন্ত। নিজের মনোবল কম বলেই তো লুকোচুরি করে। আপনি ভাবছেন, তারা আসবে আমায় ধরতে! ছোঃ!

শর্মা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন: দেখেছেন, কী ভুল করেছি!

শুধু আমি কেন, সবাই চমকে উঠেছিলেন।

শর্মা তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে একটা চকচকে সিগারেট কেস বার করলেন। সেটা খুলে আমার দিকে এগিয়ে বললেন: আসুন স্যর।

আমি হাত জোড় করে বললুম: ধন্যবাদ।

খান না?

বলেই মামার দিকে হাত এগিয়ে দিলেন।

মামাও বললেন : ধন্যবাদ।

শর্মা ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কেস বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। আমি বললুম : আপনি খেলেন না?

আমি! আমি সিগারেট খাই নে।

তবে রাখেন কেন?

শর্মা গদগদ ভাবে বললেন : আপনাদের জন্যেই রাখি।

তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললেন : একেবারে যে খাই নে তা নয়, আপনারা নিলে খেতাম। তবে কেশে কেশে মরে যেতে হত।

অমন করে খাবার দরকার কী?

বুঝলেন না, এ হল বিজনেস—

বললুম : বুঝেছি।

ওধার থেকে মামা বললেন : বেশি ভাব জমিয়ো না গোপাল, পরে হয়তো পস্তাতে হবে।

কথাটা বাঙলায় বলেছিলেন, ভেবেছিলেন শর্মা বুঝতে পারবেন না। সে যে কত বড় ভুল, তা পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন। শর্মা পরিষ্কার বাঙলায় বললেন : বলেছি তো স্যর, রাত দশটাতেই কান ধরে নামিয়ে দেবেন।

স্বাতি আশ্চর্য হল, মামা লজ্জিত হলেন, আর আমি বললুম : বেশ বাঙলা বলেন তো?

শর্মা বললেন : কলকাতায় যে বাঙালী সেজে যাই! নাম শ্রীরাম চন্দ্র। অনেকেই চন্দ বলেন।

আমাদের কাছে তো বাঙালী সাজেন নি!

সাহস পাই নি। বাঙালী শুনলে অনেক বাঙালী আজকাল গলাধাক্কা দেয়। বিশেষ করে বাঙালী ব্যবসাদার। বাঙালীকে তারা একেবারেই বিশ্বাস করে না। অফিসেও বড় সাহেব বাঙালী হলে মাদ্রাজীদের রাজত্ব। দিল্লীতে আজকাল পাঞ্জাবীরা জোর

করেছে। দিনে দিনে যাতে প্রাদেশিকতা বাড়ে, তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। ভেদ বজায় না রাখলে লুটে খাবার সুযোগ কম।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বোধ হয় ভাবলেন, এ আপদ ঘাড় থেকে নামানো যাবে না। কিন্তু না নামালেও চলবে না। মামী তাহলে নিজেই নেমে যেতে চাইবেন। বাহিরের একটা লোক থাকলে তাঁর হয়তো ঘুমই আসবে না। চারখানি মাত্র বার্থ, আমরা চারজন আছি, রিজার্ভ করা আছে। পুরো ভাড়া দিয়ে ভদ্রলোক যে মাটিতেই শুতে চাইবেন, এই কথা ভেবেই আমরা উদ্বিগ্ন হলুম। বললুম: কত দূর যাবেন?

ভদ্রলোক বললেন: যত দূর যেতে দেবেন।

আপনার কোন গন্তব্য স্থান নেই?

সে অনেক দূর। দিল্লী।

মামা এতক্ষণ সোজা হয়ে বসে ছিলেন, এবারে হেলান দিলেন। একেবারেই যে হতাশ হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বললুম: কোথা থেকে আসছেন?

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে।

সে তো দেখতেই পেয়েছি। কিন্তু যাত্রার শুরু তো সেখান থেকে নয়!

যাত্রার শুরু জিজ্ঞাসা করছেন? সে দিল্লী থেকে।

বললুম: আমার প্রশ্নটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। উত্তর দিতে বাধা থাকে, বলুন বলব না।

বুদ্ধির দোষে বুঝতে একটু দেরি হয় স্যর, তা না হলে সত্য বলায় বাধা কিসের! দিল্লী থেকে সেকেন্দ্রাবাদ এসেছি কাজিপেট হয়ে, এবারে ফিরে যাচ্ছি।

আর কোন শহরে নামেন নি?

তাও নেমেছি। ওরঙ্গল বলে একটা শহরে কিছু কাজ ছিল। ছ মাইল পথ যেতে আসতে সারাটা দিন গেছে।

ওরঙ্গলের নামে আমার কাকতীয় রাজাদের কথা মনে এল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজবংশের অভ্যুদয়। প্রথম রাজার নাম কাকতি প্রলয়, ছিলেন কল্যাণপুরের চালুক্যদের অধীন। তাঁর বাপের দেওয়া নাম ছিল প্রলয়। কাকতি নাম তিনি নিজে নিয়েছিলেন। তাঁর পাটরাণী কাকতি দেবীর উপাসনা করতেন। রাজাও তাঁর পূজা করে একটি শিবলিঙ্গ পান। পরশ পাথরের লিঙ্গ। ধনরত্নে রাজকোষ ভরে যায়। রাজা স্বাধীন হয়ে নাম নিলেন কাকতি প্রলয়।

রাজ্যের রাজধানী ছিল হনম কোণ্ডায়। সেই শিবলিঙ্গ সরাতে না পেরে রাজা ওরঙ্গলে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। সে হল ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

এই রাজার আর একটি গল্প আছে। তাঁর পিতৃঘাতী পুত্রের গল্প। রাজকুমারের জন্মের পর দৈবজ্ঞ বললেন, এই পুত্র পিতৃঘাতী হবে। আর যায় কোথা! রাজা পুত্রহত্যা করতে না পেরে শিশুকে বনে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু যে ছেলে পিতাকে হত্যা করবে, তার মৃত্যু নেই। কোন গৃহস্থের ঘরে লালিত হয়ে যথাসময়ে সেই পুত্র পরশলিঙ্গের রক্ষক নিযুক্ত হলেন। একদিন অন্ধকারে রাজা মন্দিরে আসছিলেন দেব-দর্শনে, পুত্র রুদ্রদেব তাঁকে চোর ভেবে হত্যা করলেন। রুদ্রদেব প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এক সহস্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে।

দেবগিরির যাদব রাজাদের সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ হয়েছিল। রুদ্রদেবের ভ্রাতা মহাদেব প্রাণ হারিয়েছিলেন, কিন্তু পুত্র গণপতিদেব যাদব-রাজকে পদানত করে রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ইনি জৈন-বিদ্বেষী ছিলেন। জৈন মন্দিরগুলি ধ্বংস করে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এঁর দৌহিত্র প্রতাপরুদ্র ওরঙ্গলের শেষ রাজা। ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানের হাতে তাঁর পরাজয় হয়। দিল্লীতে তাঁর লাঞ্ছনার সীমা

ছিল না। কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি। সে বড় করুণ কাহিনী।

আমি জানতুম যে ওরঙ্গল সম্বন্ধে মামা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। শর্মার চেয়ে তাঁর মামীকে ভয় বেশি। গায়ে পড়ে বাইরের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা মামীর পছন্দ নয়। তাঁকে খুশী করতে হলে নীরব থাকা উচিত। কিন্তু মামা চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন: ওরঙ্গলের কথা তো তুমি বল নি গোপাল?

হনম কোণ্ডার কথাও বলি নি।

শর্মা বললেন: দেখেছি দেখেছি, ও জায়গাটাও দেখেছি। ওরঙ্গল থেকে হনম কোণ্ডা পাকা শড়ক, তার ধারে একটা বিরাট মন্দির দেখেছি। হাজার স্তম্ভের মন্দির। বললে, এ দেশের শেষ হিন্দু রাজবংশের অসম্পূর্ণ কীর্তি সামনেই প্রায় শ তিনেক কারুকার্য করা থাম, আর পশ্চিমের দরজায় অনেক নৃত্যপরা কন্যার মূর্তি।

শর্মা আরও বললেন: কাছেই নাকি হনমন্তগিরি নামে একটা নগর ছিল। আজ সেখানে দেখবার কিছু নেই। শুধু পাহাড়ের গায়ে কিছু জৈন মূর্তি এখনও বর্তমান আছে।

খুব মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলুম: ওরঙ্গলে কী দেখলেন?

সত্যি কথা বলতে কি, ওরঙ্গলে আমি বক্‌রম খুঁজেছিলুম। বক্‌রম বোঝেন তো, দরজিরা ব্যবহার করে!

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তা লক্ষ্য করে শর্মা বললেন: একটু অদ্ভুত শোনাবে বৈকি। কিন্তু মার্কোপোলোর কথা পড়লে এমন আশ্চর্য হতেন না। উনি ছশো বছর আগে এই জায়গা দেখে গিয়ে লিখেছিলেন যে এই রাজ্যে সব চেয়ে ভাল আর সব চেয়ে মোলায়েম বক্‌রম তৈরি হয়, সব চেয়ে দামীও বটে। মাকড়সার জালের মতো তার সূক্ষ্ম তন্তু। বলেছিলেন, There is no king or queen in the world but might be glad to wear

them. আমি এই বক্‌রম দেখতে পেলুম না, তার বদলে কার্পেট তৈরি দেখে এলুম। এও নাকি অনেক পুরনো শিল্প।

ওরঙ্গলে কার্পেট ছাড়া আর বুঝি কিছু দেখবার নেই?

পুরাতাত্ত্বিকের কাছে আছে। শহর তো একটা প্রাচীন দুর্গ, দুটো প্রাচীরে ঘেরা। বাহিরেরটা কাদার, লোকে তার পরিধি বলে পঁচিশ মাইল, ভেতরেরটা পাথরের। রেললাইন এই দেয়ালগুলো এফোঁড় ওফোঁড় করেছে।

এক সময় মামা আমাকে কাছে ডেকে বললেন: কাজটা তোমার ভাল হচ্ছে না গোপাল।

সে কি আমি বুঝি নি! বললুম: দেখি কী করতে পারি।

রাত দশটার আগে ট্রেন নিজামাবাদ পৌঁছবে। সেখানেই আমাদের রাতের আহার। শর্মাকে যদি সেইখানে নামানো যায় তো সব দিক রক্ষা। ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, আর গাড়ি থেকে নেমে যাও, এ কতকটা একই ধরনের কথা। বলতে ভদ্রতায় বাধে, কিন্তু না বলে আজ উপায় নেই। তৃতীয় শ্রেণীকে আমি এই কারণেই ভালবাসি। সেখানে জাতি বর্ণের বিচার নেই, কেউ কাউকে নেমে যেতে বলে না। যতক্ষণ জায়গা থাকে, ততক্ষণ লোক আসে। জায়গা না থাকলে লোকে নিজে থেকেই আসে না। তৃতীয় শ্রেণীতেও যে আজকাল বর্ণ বিচার হচ্ছে, সে উপর থেকে আমদানী করা। মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী যখন পয়সার অভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠে, তখনই তারা দ্বার রোধ করে আপন কৌলীন্য ঘোষণা করে। তৃতীয় শ্রেণীর জাত-যাত্রীরা কারও জন্যে দরজা বন্ধ করে না।

প্রাণের বেলাতেও তাই। হৃদয়ের দরজা তাদের খোলা। ভয় না দেখালে সহজে বন্ধ হয় না। শর্মা যদি তৃতীয় শ্রেণীতে চলতেন আমার সঙ্গে, তাহলে তাঁকে পাশে ধরে রাখতুম। আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতুম না: কোথায় নামবেন?

বলেছি তো।

এবারে আর দ্বিধা না করে সরাসরি বললুম: নিজামাবাদ পৌঁছবে রাত দশটায়. সেখানেই নামবেন তো ?

গম্ভীর ভাবে শর্মা বললেন: নামিয়ে দেবেন।

আবার সেই কথা। ভদ্রলোক কিছুতেই বলছেন না যে নিজে থেকেই নামবেন। এ দিকে নিজামাবাদ পেঁীছতে আর দেরি নেই।

এবারে মামী আমাকে কাছে ডেকে বললেন: অত খোসামোদ কিসের ? গাড়ি তো রিজার্ভ করাই আছে, রেলের লোক ডেকে নামিয়ে দিও।

নিজামাবাদে আমাকে এ সব কিছুই করতে হল না। ভদ্রলোক নিজেই কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামালেন। আমরা সবাই খুশী হয়েছিলুম, কিন্তু তিনি আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে বললেন: আমাকে নামতেই হত, আমার কাজ আছে এখানে। শুধু একটু মানুষ চেনার চেষ্টা করলাম।

সত্যি কথা। এত বড় বিরাট পৃথিবীটা দেখতে বেরিয়েও মনের সঙ্কীর্ণতা আমাদের গেল না। দু হাত জুড়ে শর্মা তো আমাদের নমস্কার করল না, যেন আধুনিক সভ্যতার পিঠে মনুষ্যত্বের একটা চাবুক মেরে নেমে গেল।

বেদনায় স্বাতির দৃষ্টি কি ছল ছল করছে!

৩০

আমরা ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছলুম ভোর সোয়া ছটার পরে। হোটেলের অভাব এ শহরে নেই। সকল শ্রেণীর যাত্রীর জন্য সব রকমের হোটেল আছে। স্টেট হোটেলে রাজকীয় ব্যবস্থা। আমরাও একটা চলনসই জায়গা বেছে নিলুম। এ কাজে একজন ট্যাক্সির ড্রাইভার আমাদের সাহায্য করেছিল। পরে জেনেছিলুম যে সে নিজেই গাড়ির মালিক। তার আরও খান-দুই গাড়ি আছে, মাইনে-করা ড্রাইভার সেগুলো চালায়। হোটেলে দুখানা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল: আপনারা মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নিন। আমি ঘুরে আসছি।

ঘুরে আসবার কারণ মামা বুঝতে পারেন নি। সে নিজেই তা বুঝিয়ে বলল: ইলোরা এখান থেকে আঠারো মাইল। আজই আপনাদের দৌলতাবাদ ইলোরা আর ঔরঙ্গাবাদ দেখিয়ে দিতে পারব। আর কাল অজন্তা।

যাত্রীদের এই নিয়ম। কেউ ইলোরা আগে, কেউ অজন্তা। কেউ ট্যাক্সিতে, কেউ বাসে। কেউ ঔরঙ্গাবাদে ফিরে ট্রেন ধরে, কেউ অজন্তা থেকে জলগাঁওএ চলে যায়। এমন যাত্রী কম যে ইলোরা দেখে অজন্তা দেখে না, কিংবা রাত কাটায় ফর্দাপুর বা খুলদাবাদে। ফর্দাপুর অজন্তা গুহার কাছে। সেখানে স্টেট গেস্ট হাউস আছে, পি. ডব্লু. ডি. ডাকবাংলোও আছে। ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, স্টেট গেস্ট হাউসে খাবারও পাওয়া যায়। খরচ একটু বেশি। খুলদাবাদ ইলোরা গুহার কাছে। সেখানেও স্টেট গেস্ট হাউস আছে, আছে ডাকবাংলো। স্টেট গেস্ট হাউসে যাঁরা থাকেন, তাঁরা খাবার ব্যবস্থা করেন পি. ডব্লু. ডি. ডাকবাংলোর খানসামার

কাছে। জলগাঁওএও আছে ট্রাভলার্স বাংলো আর ইন্‌স্‌পেকসন্ বাংলো।

কলকাতার দিক থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা ভোর বেলায় জলগাঁওএ নেমে বাসে আসতে পারেন অজন্তা। অজন্তা থেকে বাসে করেই ঔরঙ্গাবাদ আসতে পারেন। জলগাঁওএর বাস অজন্তা এসে জলগাঁও ফেরে। ঔরঙ্গাবাদের বাস ঔরঙ্গাবাদ। একাধিক বাস। একটার পর একটা আসে, একটার পর একটা যায়। জায়গার অভাব বড় একটা হয় না। তবু দেখা যায় যে বাঙালীরা জলগাঁওএ না নেমে উজিয়ে যান মনমাড। সেখানে গাড়ি বদল করে ঔরঙ্গাবাদ। একটা গোটা দিন তাতে নষ্ট হয়।

যাঁরা বম্বে বা হায়দ্রাবাদ থেকে আসেন, তাঁরা ঔরঙ্গাবাদেই নামেন। অজন্তা দেখেও জলগাঁওএ গিয়ে ট্রেন ধরতে চান না। অজন্তা থেকে জলগাঁওএর পথে একটা পাহাড়ী নদী কয়েকবার পার হতে হয়। তার উপর উঁচু পুল নেই। এক জায়গায় নিচু রাস্তা আছে, জলের উপর দিয়েই পার হতে হয়। আগে সেখানে মোটর চলত না। হেঁটে পারাপার করতে হত। আজকাল আর হাঁটবার দরকার হয় না। প্রচুর বর্ষা হলে দিন কয়েক অসুবিধা হয়। কিন্তু যাত্রীর ভয় সারা বছর থাকে। পুরনো ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ভয় কারও কমছে না। নতুন ভালো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে।

ইলোরায় একটা চায়ের দোকান আছে, কিছু শুকনো খাবার পাওয়া যায়। দুপুরের আহার তাতে ভাল হয় না। হোটেল থেকেই আমাদের খাবার সাজিয়ে দিল। দৌলতাবাদের দুর্গে উঠতে হবে বলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম।

দৌলতাবাদ নামেও একটা স্টেশন আছে। সেখান থেকে মাইল খানেক হাঁটতে হয়। ঔরঙ্গাবাদ থেকে দেখারই সুবিধে বেশি। ইলোরা যাবার রাস্তার উপরেই এই দুর্গ। ন মাইল পথ। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলতেই আমরা পেঁৗছে গেলুম।

কতগুলি ঘন-পাতার গাছের নিচে জনকয়েক লোক ফলের দোকান নিয়ে বসেছে। কলা পেয়ারা আর বড় বড় আতা। তারই পাশে গাড়ি রাখবার জায়গা। সামনে দুর্গে যাবার পথ। পথের পাশে ভিখারী বসেছে ভিক্ষা চাইতে। ভিক্ষা দেওয়া আমরা ধর্মের কাজ বলে মনে করি। তাইতেই বোধ হয় দেশের সর্বত্র মেলে ভিখারীর সাক্ষাৎ।

দুর্গের দিকে চেয়ে মামা প্রমাদ গণলেন: এই পাহাড়ে আমাদের উঠতে হবে!

বেশি তো নয়, দু হাজার আড়াই শো ফুট উঁচু।

মাত্র!

মামা একটা ভেংচি কাটলেন।

মামী বললেন: ওর মাথায় ওঠবার দিব্বি কে দিয়েছে!

নিচে তো কিছুই দেখছি নে। দু-একখানা বাড়ি যা দেখছি, সে তো একেবারে মাথায়।

স্বাতি বলল: কেন, ঐ মিনারটা!

চাঁদ মিনার। নিচে থেকে মনে হচ্ছে, ঐ মিনারের মাথা বুঝি পাহাড়ের চেয়ে নিচু নয়। সিঁড়ি নিশ্চয়ই আছে। দিল্লীর কুতব মিনারের মতো অগণিত সিঁড়ি। নাও থাকতে পারে। কোন মানুষকে উপরে দেখতে পাচ্ছি নে।

ছোট বড় গাছের পাশ দিয়ে সমতল রাস্তা গেছে দুর্গের দিকে। আমরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগলুম। কয়েকজন যুবক ফিরে আসছে। তাদের দেখে কলেজের ছাত্র বলে মনে হয়। আমি ভাব করবার চেষ্টা করলুম: কী দেখলেন ওপরে?

একজন হেসে বলল: মজুরি পোষায় নি। যত পরিশ্রম করেছি, আনন্দ পেয়েছি তার চেয়ে কম।

আর একজন বলল: অন্ধকার পথ পর্যন্ত নিশ্চয়ই দেখে আসবেন।

সে আবার কী?

পরিখা পার হয়ে দুর্গে প্রবেশের পথ। সৈন্যরা কী করে শত্রুর আক্রমণ সামলাতো, তা নিশ্চয়ই দেখবার জিনিস।

কিন্তু কে বোঝাবে ?

লোক আছে। মশাল জ্বেলে সব আপনাদের দেখিয়ে দেবে কোন রকমে এই ব্যাপারটুকু দেখে নিলেই দৌলতাবাদ আসা সার্থক মনে হবে।

আর একজন বলল : রাস্তার বাঁধারে ভারতমাতার মন্দিরটা দেখে যাবেন।

দৌলতাবাদ যখন সত্যিই দৌলতের ভাণ্ডার ছিল, তখন তার নাম ছিল দেবগিরি। দেবগিরিতে হিন্দু রাজার অধিকার। যাদব বংশের রাজারা একশো বছরের উপর এখানে রাজত্ব করেছেন। এই দুর্ভেদ্য দুর্গ বোধহয় তাঁরাই নির্মাণ করেছিলেন ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। দেবগিরির ঐশ্বর্যের সংবাদ দিল্লীতে অবিদিত ছিল না। কামিনী কাঞ্চনের উপর বাদশাহ আলাউদ্দীন খিলজীর সমান নজর। তিনি ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবগিরি আক্রমণ করলেন। রাজা রামচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত কিছু জমি ও বাৎসরিক করের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিস্তার পেয়েছিলেন। আর যা দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। এক হাজার মণ রূপো, ছ শো মণ সোনা আর দু মণ হীরে ও অন্যান্য মণিমুক্তা। দেবগিরি থেকে দিল্লীর দীর্ঘ পথে এই ধনরত্ন দুর্বহ মনে হয়েছিল। সৈন্যরা নাকি রূপোর জিনিস পথে ফেলে দিয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতে ঐশ্বর্যের অভাব কোন দিন ছিল না। রামায়ণ মহাভারতে বিশ্বাস না হয় নাই থাকল, ইতিহাস তো আমরা মানি। সেই ইতিহাসে এমন ধরনের কথা আরও অনেক আছে। সুলতান মামুদের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের কথা আজ কারও বিশ্বাস হয় না। কাংড়ায় নগরকোট লুণ্ঠন করে তিনি সাত লক্ষ

সোনার মোহর, সাত শো মণ সোনা রূপার বাসন, তু শো মণ খাঁটি সোনা, তু হাজার মণ রূপা এবং কুড়ি মণ হীরা জহরৎ পেয়েছিলেন। কাশিম-পুত্র মুহম্মদও মুলতানের এক মন্দির লুঠ করে সোনা পেয়েছিলেন। এক আধ মণ নয়, পুরো এক লক্ষ তিন হাজার তু শো মণ।

ধনরত্নের এই ফিরিস্তি মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার লেখা। আরব ও পারস্যের নানা স্থানে তখন এক থেকে চার সেরেও মণ হত। কাজেই ফেরিস্তার মণ চল্লিশ সেরে ছিল কিনা, আজ তা জানার উপায় নেই। এই তো সেদিন আমরা চার আনা সেরের আঙুর কিনেছিলুম।

রাজা রামচন্দ্রের পরেই দেবগিরির হিন্দু শাসন শেষ হয়ে গেল। আলাউদ্দীন গুজরাট জয় করে রাণী কমলা দেবীকে আপন অন্তঃপুরে বেগমের সম্মান দিয়েছিলেন। আর রামচন্দ্র দিয়েছিলেন গুজরাটের পলাতক রাজাকে আশ্রয়। দিল্লীর দরবারে কর দেওয়াও বন্ধ করেছিলেন। আর যায় কোথা! আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর এলেন দেবগিরি বিজয়ে। রামচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করলেন। তু বৎসর পরে তাঁর পুত্র শঙ্কর স্বাধীনতা ঘোষণা করেই সর্বনাশ ডাকলেন। মালিক কাফুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন।

শঙ্করের পরে রাজা হয়েছিলেন রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল। এঁদের চরিত্রে ছিল স্বাধীন দেবগিরির স্বপ্ন। বিদ্রোহী হয়ে তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন। সে বড় বীভৎস কাহিনী। খিলজী বংশের বাদশাহ মুবারক শাহ হরপালকে বন্দী করে জীবন্ত অবস্থায় তাঁর দেহের চামড়া তুলে নিয়েছিলেন। সভ্য যুগে এমন দৃষ্টান্ত বুঝি আর নেই।

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুঘলুকের গল্প। দিল্লীর লোকেরা তখন পাগলা রাজার নামে মুখে মুখে ছড়া কাটছে।

পাগলা রাজা বললেন, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। দেবগিরির কথা তাঁর মনে পড়ল। এই দুর্গ তাঁর সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে। সেখান থেকে রাজ্য শাসনের নিশ্চয়ই সুবিধা হবে। কাজেই চল দেবগিরি। একা নয়, পাত্র মিত্র নিয়ে নয়, দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে যেতে হবে। না গেলে প্রাণদণ্ডও নয়, পা ধরে টেনে নিয়ে চল। সত্যি সত্যিই পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল একজনকে। বেচারা অন্ধ: ছ শো দশ মাইল পথ লাঠি ঠুকে চলতে পারবে না বলেই পথের ধারে বসে ছিল। কেন বসে থাকবে! কেন একটা লোকও দিল্লীতে থাকবে! পা ধরে টেনে নিয়ে চল। কিন্তু মানুষটা পৌঁছল না। দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পথেই পড়ে রইল, পৌঁছল শুধু তার একটা পা। দেবগিরি হল মুহম্মদ তুঘলুকের রাজধানী দৌলতাবাদ।

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দৌলতাবাদ জমজমাট ছিল সতেরো বছর। কিন্তু দিল্লীর মায়া কারও কাটে নি। দিল্লী ফেরার অনুমতি পাওয়া মাত্র সবাই তল্পি গোটাল। ছ শো মাইল পথ ছ মাইলের মতো মনে হল। দৌলতাবাদে আর একজনও পড়ে রইল না।

আজও এ জায়গা বড় নির্জন। বাহিরে কয়েকটা ফলের দোকান দেখেছি, আর একজন ভিখারী। ভিতরে চাঁদ মিনারের সামনে দুজন স্ত্রীলোক দেখলুম এক রকম খাবার বিক্রি করছে। ভারত-মাতার মন্দিরের পথ তারাই দেখিয়ে দিল।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এ একটা মসজিদ ছিল, তারও আগে ছিল মন্দির। স্বাধীনতার পর কতকটা জোর করেই এই ভারত-মাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই গল্প একজন ভদ্রলোক বললেন। একটা মস্ত বড় অনাদৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির। চারি দিকে উঁচু প্রাচীর। অযত্নে ও অবহেলায় বড় বড় ঘাস জন্মেছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক সেই ঘাস কাটছে। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছিলেন।

সেখান থেকে ফিরে আমরা চাঁদ মিনার দেখলুম। চাঁদ মিনার কে তৈরি করেছেন, আমাদের জানা নেই। পনর ফুট উঁচু ভিত্তির উপর নব্বুই ফুট উঁচু মিনার। বাইরে হালকা নীল রঙের ডোরা, দেখে মনে হবে পারসী টালি। ভাল করে নজর করলেই ভুলটা চোখে পড়বে। চুনের সঙ্গে রঙ মেশানো হয়েছে। গেছে সবই, আছে অল্প। কিন্তু যেটুকু আছে, তা একেবারে তাজা মনে হবে। এই মিনার ছাড়িয়ে দুর্গের দিকে আমরা এগিয়ে গেলুম।

স্বাতি আজ মামার পাশে পাশে চলেছে। আমাকে শুনিয়ে বলল: গোপালদার আজ মেজাজ খারাপ।

মামা বললেন: কেন?

ইতিহাস কেউ শুনতে চাইছে না।

মামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। নির্জন পরিবেশের ভিতর এই হাসি বড় অদ্ভুত শোনাল। পিছন থেকে আমি বললুম: কোন কবি বিধাতা পুরুষকে বলেছিলেন, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ। এই কবির সঙ্গে আমি একেবারে এক মত।

স্বাতি বলল: কী বললে?

বললুম: হে বিধাতা, অরসিকের কাছে রস নিবেদন করতে হবে, দয়া করে আমার কপালে এ কথা লিখো না।

দুঃখ প্রকাশের ভান করে স্বাতি বলল: ইতিহাসে রস পায়, এমন লোক আর কোথায় পাবে বল! যারা পায়, তারা তোমার প্রথম ভাগের বিদ্যায় খুশী হবে না।

মামা হয়তো ইতিহাস শোনাবার ফরমায়েস করতেন। কিন্তু তার সুযোগ পেলেন না। আমরা তখন সমতল ছেড়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠছি। পায়ের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, পথের দিকেও। খানিকটা উপরে উঠে একটা কামানের খবর পাওয়া গেল। জন কয়েক মজুর কাজ করছে। তাদেরই একজন বলল: গাইড চাই বাবু? কামান দেখাব, ওপরেও ঘুরিয়ে আনব।

কামান কোথায় ?

লোকটা আঙুল দিয়ে দেখাল। কিছু সিঁড়ি ভাঙতে হবে। তা হোক। দেখতেই তো বেরিয়েছি। মামা বললেন: কামান অনেক দেখেছি।

বলে নিচে মামীর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি আর স্বাতি উপরে উঠলুম খুব ধীরে ধীরে। সিঁড়ি তো বেশি নয়। তাড়াতাড়ি উঠলে দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে যাবে।

একটা কুচকুচে কালো লোহার কামান। বাইশ ফুট লম্বা। রোদে বেশ চকচক করছে। কেউ যেন তেল মাখিয়ে রেখেছে। কামানের নাম লেখা মেন্ধা গান। মানে বোধহয় ভেড়ার মুখের কামান। আমি নামতে যাচ্ছিলুম। স্বাতি বলল: অত ব্যস্ত কেন ?

বললুম: মামা মামী যে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন!

স্বাতি বলল: আমাদের সঙ্গে কি ওঁরা চলতে পারবেন!

আমার মনে হল, এই কথা বোধহয় নিচে থেকেও শোনা যাবে। দিনে দুপুরে এমন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সব কথা তো বলা যায় না। স্বাতি নিজেও তা বোঝে। তাই অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল: দেশে ফিরে ভুলে যাবে না তো ?

ভোলা উচিত হবে।

কেন ?

তোমার মঙ্গলের জন্য।

আমার মঙ্গল

নিজে বাউণ্ডুলে বলেই এই কথা বলছি। মেয়েদের নীড় চাই পুরুষকে বাঁধবার জন্যে। একটি মাত্র পুরুষ। তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ যে স্থির হয়ে আছে।

স্থির কি কখনও অস্থির হয় না ?

কামানের উপর বসে স্বাতি পা দোলাচ্ছিল। আমি আশ্চর্য হলুম তার নির্বিকার ভাব দেখে। মনে হল, এ তার হাল্কা কথা।

গভীর ভাবে কিছু ভাবে নি বলেই এমন কথা বলতে পারল। বললুম ঃ অস্থির জিনিসই স্থির হয়।

কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন অন্যত্র স্থির হয়েছে। তাই দেখে স্বাতি বলল ঃ কী দেখছ বল তো!

একটি বাঙালী পরিবার। একটি নয়, দু তিনটি মনে হচ্ছে। সঙ্গে ছেলেমেয়েও আছে।

স্বাতি লাফিয়ে উঠল। কথা না বলে নিচে নামতে শুরু করল। দেখলুম যে সে তরতর করে নামছে। মামীকে দেখতে পেয়েই বলল ঃ অদ্ভুত কামান মা, একেবারে নতুনের মতো ঝকঝক করছে।

আমি জানি, কল্পনার রাজ্য থেকে স্বাতি এখন মাটিতে পা ফেলতে চাইছে।

মেয়ে-পুরুষের দলটি আমাদের এড়িয়ে গেলেন। আমরা এগিয়ে গেলুম।

পরিখার উপরে একটা কাঠের পুল। অনেক নিচে শ্যাওলা রঙের জল স্থির হয়ে আছে। এই পরিখা নিশ্চয়ই সমস্ত পাহাড় ঘিরে। আর দুর্গে প্রবেশের পথ মাত্র একটি। আজ এই পুল সরানো যায় না, এক দিন নিশ্চয়ই যেত। শত্রু সৈন্য অবরোধ করলে এই সাঁকো সরিয়ে দুর্গকে একটা দ্বীপে পরিণত করা হত।

আমরা একটা অন্ধকার পথের সামনে এলুম। সেই মুহূর্তে দেখলুম দুজন মানুষ ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে আসছে। এক জন পুরুষ, অন্য জন নারী। আমাদেরই বয়সী, কিন্তু একেবারেই ঝিমিয়ে নেই। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্রুত পায়ে আমাদের পেরিয়ে গেল।

মামী ওদের লক্ষ্য করেছিলেন। স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমি তাকিয়েছিলুম মেয়েটির মুখের দিকে। সুশ্রী কুমারী মেয়ে। খুশিতে উজ্জ্বল, প্রাণ-চঞ্চল। দক্ষিণের বাতাসের মতো মনে দোলা দিয়ে গেল।

সামনে আঁধেরি ফোর্ট। পাহাড়ের ভিতর সাব্‌টেরানিয়ান

প্যাসেজ। লোকে ব্ল্যাক আউট রোড বলে। আলো আর গাইড না নিয়ে এ পথে এগোনো নিরাপদ নয়। চেষ্টা করে এই পথকে বিপদসঙ্কুল করা হয়েছে। শত্রুসেনা যদি পরিখা অতিক্রম করে, তবে প্রথম বাধা পাবে এইখানেই। আমরা একজন গাইড সঙ্গে নিলুম।

লোকটা জমিয়ে গল্প বলতে পারে। শত্রুসেনা দুর্গে ঢুকতে কোথায় কী বাধা পাবে সেই গল্প শোনাল।—এখান থেকে দুটো রাস্তা। শত্রুরা থমকে দাঁড়াবে, ভাববে কোন্ পথে যাবে! দুর্গরক্ষী যারা লুকিয়ে আছে আশে পাশে, তারা এদের মেরে ফেলবার সুযোগ পাবে। উপরে গিয়ে এ দুটো রাস্তাই আবার এক হয়েছে। এক জায়গায় উপর থেকে আলো আসছে। চোখে ধাঁধা লাগছে। দু দিকে রাস্তা। শত্রু যখন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে যাবে, তখন উপর থেকে গরম তেল পড়বে। পাহাড়ের উপরে সেই ব্যবস্থা আছে। ভয় পেয়ে উল্টো দিকে ছুটলেই সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে নিচে। আরও এগিয়ে আবার দুটো রাস্তা। এক দিক থেকে গরম হাওয়া আসছে, আর এক দিক থেকে শীতল বাতাস। লোহার জাফরিতে আগুন জ্বেলে গরম হাওয়া ছড়ানো হচ্ছে। শীতল হাওয়ার দিকে ছুটলেই বিপদ। সে পথ শেষ হয়েছে পাহাড়ের গায়ে, টুপটাপ করে নিচে পরিখার জলে পড়বে। এই গোটা রাস্তার উপরে-নিচে দুই পাশে দুর্গরক্ষীরা আত্মগোপন করে থাকতে পারে। শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে পারে পদে পদে।

লোকটি এক রকমের লোহার কাঁটা দেখাল। মাটিতে ফেললেই একটা কাঁটা উপরে থাকে গজালের মতো। সেকালে নাকি অসংখ্য কাঁটা বিষ মাখিয়ে ফেলে রাখত এই অন্ধকার পথে। সৈন্যরা বুট পরত না বলে বিষের ক্রিয়ায় মারা পড়ত।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে পৌঁছলুম। চারি দিকের সব কিছু দেখা যাচ্ছে। যত আলো, তত

বাতাস। নিঃশ্বাস নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না। আগেও হয়তো হচ্ছিল না। কষ্ট হচ্ছিল যুদ্ধের গল্প শুনে।

ব্ল্যাক-আউট রোড ধরে আমাদের আর ফিরতে হল না। নিজাম বাহাদুর একটা সিঁড়ি করে দিয়েছেন। পাহাড়ের গায়ে সেই ধাপ বেয়ে আমরা নিচে নেমে এলুম।

বিদায় দেবার আগে লোকটি নমস্কার করল। কোন দাবী দাওয়া নেই। আট গণ্ডা পয়সা পেলেই সন্তুষ্ট হত, মামা একটি টাকা দিলেন। লোকটা খুশী হল খুব। তার এই তৃপ্তি দেখে আমার ভাল লাগল। অপর্যাপ্ত পেয়েও মানুষ আজকাল খুশী হয় না। তার প্রয়োজনের যেন শেষ নেই, দাবীরও নেই। অল্পে সুখী হবার কৌশল যে শিখেছে, সেই সত্যিকার সুখী। আশুতোষ মহাদেবের আদর্শ আমরা কোন দিনই মানতে পারি নি।

এবারে আমরা ইলোরা দেখব।

৩১

অজন্তা আর ইলোরাকে নিয়ে আমাদের কল্পনার শেষ নেই। মনে হয়েছে যে সৌন্দর্যের শেষ কথা সেখানেই লেখা আছে। আজ তা প্রাণ ভরে দেখবার পরম সুযোগ। আজ আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে।

মাইল পাঁচেক এগিয়ে একটা সমৃদ্ধ গ্রাম পেরোবার সময় ড্রাইভার বলল: এই গ্রামের নাম রৌজা। শেষ জীবনটা ঔরঙ্গজেব এইখানে কাটিয়েছিলেন। এখানে তাঁর কবর আছে।

কবর আমরা দেখলুম না। ড্রাইভার বলল, ফেরার পথে দেখাবে। রৌদ্র প্রখর হবার আগে ইলোরায় পৌঁছনো দরকার। ইলোরা তো ছোটোখাটো জায়গা নয়, সে বিরাট ব্যাপার। পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সমানে হাঁটতে হবে। তার পর পাহাড়ের গায়ের পথ ফুরিয়ে যাবে। তখন মোটরে চেপে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে, তার পর আবার হাঁটা। বাসে এলে সমস্ত পথটা হাঁটতেই হবে। বাস এসে কৈলাস মন্দিরের সামনে দাঁড়াবে। সেখান থেকেই ফিরবে। যাত্রীদের শুধু হাঁটার পরীক্ষা। ইলোরা দেখার আনন্দ তাতে অনেকেরই কমে যায়।

পরিষ্কার রাস্তায় আমরা একটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এলুম। হিমালয়ের মতো পাহাড় নয়, নয় গভীর অরণ্যময়। একটা বেঁটে নিচু পাহাড়ের শ্রেণী আধখানা চাঁদের মতো দিগন্তকে খানিকটা আড়াল করে রেখেছে। ড্রাইভার হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল। ডান হাতে লতাগুল্মহীন রুক্ষ পাহাড়ের প্রান্ত। আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: কী হল?

ড্রাইভার বলল: এইখানে নামলে অর্ধেক পথ সংক্ষেপ হবে।

কী রকম করে ?

এইখান থেকেই গুহা শুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে এগিয়ে যাবেন। এক নম্বর থেকে ষোল নম্বর। কৈলাস মন্দিরের সামনে আমি অপেক্ষা করব।

আমি নেমে পড়েছিলুম। মামা ইতস্তত করছিলেন। বললেন : এখানে পথ দেখাবে কে ?

ড্রাইভার বলল : পথ দেখাবার দরকার হবে না। এই পায়ে চলা পথ ধরে একটু ওপরে উঠলে নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। গাইডরাও হয়তো দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাতিও নেমে দাঁড়িয়েছিল। মামীকে অনুসরণ করে মামাও নামলেন। ড্রাইভার নিজে খানিকটা এগিয়ে মামাকে সাহস দিল।

খানিকটা উঠেই চোখ আমাদের জুড়িয়ে গেল। ইলোরার সমস্ত গুহা বুঝি চোখের সামনেই বিস্তৃত হয়ে আছে। ভিতরের সৌন্দর্য আছে বাহিরের আলোকে বিজ্ঞাপিত। আমরা স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। এই মায়াময় পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছু সময় লাগল।

ড্রাইভার এগিয়ে গিয়েছিল। তার বদলে দুজন গাইড এল আমাদের দিকে এগিয়ে। একজন সরকারী গাইড, তার দাম বেশি। আর একজন বেসরকারী ছেলেমানুষ। তার সাদাসিধে সরল মুখ দেখেই মামা তাকে পছন্দ করলেন। তার দক্ষিণার দাবী মাত্র দু টাকা। সবিনয়ে একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল : হাতে সময় কত ?

এ প্রশ্ন কেন ?

সারা দিন সময় থাকলে সমস্ত গুহা দেখাবে, তা না হলে শুধু ভাল গুহাগুলো।

শুধু যদি ভাল গুহা দেখি, তা হলে কত সময় লাগবে ?

তিন চার ঘণ্টা তো লাগবেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাবে।

ব্যস্ত ভাবে মামা বললেন ঃ যথেষ্ট ! তার বেশি আর ঘুরিয়ো না।

পাহাড়ের ধার কেটে পথ তৈরি হয়েছে, আর তার ভিতরে গুহা। গুহার মতো একটা রূঢ় শব্দে তার আসল পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গুহা মানে ঘর নয়, গৃহ নয়, মন্দির। মন্দির শব্দের মধ্যেই কল্পনার অবকাশ আছে। তার শিল্প-মণ্ডিত প্রবেশ পথ, মূর্তি ও কারুকার্যে অপরূপ। কোন কোন গুহার সামনে প্রশস্ত অঙ্গন আছে, বারান্দা আছে। সে বারান্দা বর্তমান শতাব্দীর মতো সাদা-সাপটা নয়, নানা নক্সা ও মূর্তিতে অলঙ্কৃত বিচিত্র বারান্দা। একটার পর একটা গুহা, পাশাপাশি, ঢেউয়ের মতো আগে ও পিছনে। উপরে ও নিচে।

বাহিরে দাঁড়িয়ে স্বাতি বলল ঃ এ কত দিনের পুরনো গোপালদা ?

বললুম ঃ দু হাজার বছরের।

দু হাজার বছর !

স্বাতির এ কথা বুঝি বিশ্বাস হল না। বললুম ঃ গৌতম বুদ্ধের বয়স আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে। এ সমস্ত বিহার ও চৈত্য তাঁর জন্মের দু তিন শো বছর পর থেকে তৈরি শুরু হয়।

মামা বললেন ঃ এ সমস্তই কি বৌদ্ধ কীর্তি ?

প্রশ্নটা আমাদের গাইডও বুঝতে পেরেছিল। বলল ঃ অজন্তার সব কিছুই বৌদ্ধ। কিন্তু এখানে তিন রকম গুহা আছে—বৌদ্ধ হিন্দু ও জৈন। এই কারণেই ইলোরা আরও ইন্টারেস্টিং। চৌত্রিশটা গুহার ভেতর অর্ধেক হিন্দু, বারোটা বৌদ্ধ আর জৈন পাঁচটা। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এগুলো সব পাশাপাশি, বারোটা বৌদ্ধ গুহার পর সতেরোটা হিন্দু গুহা, আর শেষ পাঁচটা জৈন। লোকে মনে করে, বৌদ্ধ গুহাগুলিই সব চেয়ে প্রাচীন, দু হাজার বছরের পুরনো গুহা। তার পর ব্রাহ্মণরা এসেছে। সব শেষে জৈন। মাঝখানের কৈলাস মন্দির থেকে জৈন গুহাগুলি প্রায় দেড় মাইল দূরে। এই পাহাড়ের একেবারে অন্য প্রান্তে।

আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে!

বলে মামা এক নম্বর গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

গাইড বলছিল: এই গুহাগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। সাড়ে তিন শো বছর ধরে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ষোল শো বছর আগে এ সবের প্রথম হদিশ কে পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি তখনি শুরু হয়ে যায়।

মামাকে ভিতরে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে গেল। বলল: এইটেই বোধ হয় সব চেয়ে পুরনো গুহা। বিহার এটা।

বিহার মানে?

বৌদ্ধরা দু রকমের ঘর তৈরি করত---বিহার আর চৈত্য। বিহারে তাদের বাসের ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা, চৈত্যে উপাসনার। চৈত্যের ভিতর চিতাভস্ম বা অস্থি রক্ষার জন্য স্তূপ নির্মিত হত। আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব।

এই বিহারের ভিতর আমরা আটটি ছোট ঘর দেখলুম।

দু নম্বরের গুহাটি বোধ হয় চৈত্য। দুধারে বসবার ব্যবস্থা, মন্দিরে সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের বিরাট মূর্তি। গাইড আমাদের চারটি বুদ্ধ মূর্তি দেখাল। বলল: সেকালের শিল্পীরা মূর্তি কী করে গড়ত, তার একটু নমুনা আছে। প্রথম মূর্তিটি দেখুন, শিল্পী শুরু করেছে মাথার দিক থেকে, বাকিটা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টা দেহ ও হাত। এমনি করে নিচে নেমে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বাহিরে এসে গাইড বলল: তিন নম্বর গুহা দু নম্বরের মতো।

তবু আমরা ভিতরে গেলুম। দু নম্বরের চেয়ে ছোট। বুদ্ধ পদ্মের উপরে উপবিষ্ট।

চার নম্বর গুহায় আমরা পদ্মপাণির মূর্তি দেখলুম। আর গাছের নিচে বুদ্ধ।

পাঁচ নম্বর গুহাটি সব চেয়ে বড়। গাইড বলল:. এই গুহায়

স্কুল বসত। লম্বায় একশো সতেরো ফুট আর আটান্ন ফুট চওড়া। পাশে আরও জায়গা আছে।

পরে শুনেছিলুম, স্কুল নয়, এ গুহায় অতিথি শ্রমণদের বিশ্রামের ব্যবস্থা হত।

ছ নম্বর গুহায় নারী মূর্তির প্রথম সন্ধান পেলুম। গাইড বলল : সরস্বতী।

হিন্দুর বিদ্যাদাত্রী দেবী সরস্বতী। ছোট কক্ষের ভিতর আরও অনেক মূর্তি আছে। দ্বারপাল ও ভক্ত সেবক পরিবৃত বুদ্ধ।

আট নম্বর গুহায় বাপ মায়ের সঙ্গে শিশু বুদ্ধকে দেখে আর ন নম্বরের বারান্দা দেখে আমরা দশ নম্বর গুহায় এলুম। গাইড বলল : এটি হল একটি খাঁটি চৈত্য। এখানকার লোকে বলে ছুতার কি ঝোঁপড়ি।

ছুতোরের ঘর কেন বলে, গাইড তা বলতে পারল না। খোঁজ করে জেনেছিলুম যে এই গুহার নাম বিশ্বকর্মা, স্বর্গের ঐ শিল্পীর নামে উৎসর্গ করা ঘর। বাহিরটা যেমন সুন্দর, ভিতরটাও তেমনি। ঘরের ছাদ সমতল নয়, খিলানের মতো। থামের উপরে নানা মূর্তি খোদাই করা। উপরে বুদ্ধ, নিচে গণ। পিছনে স্তূপ, তার সামনে বুদ্ধের বিরাট মূর্তি।

এগারো আর বারো নম্বর গুহাকে লোকে দোতলা আর তিন তলা বলে। কিন্তু দুটো গুহাই তিন তলা। এগারো নম্বরের তৃতীয় তলাটা নাকি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। বারো নম্বরের বিহার একশো পনর ফুট লম্বা আর তেতাল্লিশ ফুট চওড়া। তিন সারি স্তম্ভে ঘরটি ভাগ করা। দোতলা ও তেতলায় প্রচুর কারুকার্য। তেতলার ঘর লম্বায় একতলারই সমান। কিন্তু চওড়ায় অনেক বড়, প্রায় সত্তর ফুট। এক দিকে বুদ্ধের বড় বড় মূর্তি গাছের তলায়, অন্য দিকে ছাতার নিচে। মন্দিরে বিরাট আকারের বুদ্ধ মূর্তি।

মামা বললেন : মোটামুটি একই রকম দেখছি।

গাইড হিন্দীতেই কথা বলে ইংরেজী মিলিয়ে, বলল : এবারে অন্য রকম দেখবেন। বৌদ্ধ গুহা শেষ হয়ে গেল। এবারে হিন্দু গুহা।

কতগুলো যেন বলেছিলে ?

সতেরোটা।

সবই দেখতে হবে ?

আমি জানি, হাঁটতে মামার কষ্ট হয়। মামীরও ভাল লাগে না। কিন্তু দেখবার শখ আছে ষোল আনা। তাইতেই এত প্রশ্ন। গাইড বলল : পাঁচটি গুহা দেখলেই সব দেখা হবে। চোদ্দ পনর ষোল, তারপর একুশ আর ঊনত্রিশ।

বল কী !

উৎসাহ পেয়ে গাইড বলল : ইলোরা দেখতে এসে যদি শুধু কৈলাস মন্দির দেখে ফিরে যান, তাহলেও আফশোস করবার কিছু থাকবে না ! বিদেশীরা এলে ওখান থেকে আর বেরোতে চায় না, ক্যামেরার সব ফিল্ম এক জায়গাতেই শেষ করে ফেলে।

মামা বললেন : তবে সেখানেই তাড়াতাড়ি চল না বাপু।

স্বাতি বলল : সে কি বাবা, আর কিছু দেখবে না !

গাইড বলল : চলুন না, চোদ্দ আর পনর তো পথেই পড়বে। রাবণ কি খাই আর দশ অবতার। তার পরেই কৈলাস।

চোদ্দ নম্বর গুহায় ঢুকেই বৌদ্ধ ও হিন্দু গুহার প্রভেদটা বোঝা গেল। সামনেই চারটে স্তম্ভ, বড় ঘরে বারটি, আর তার শেষ প্রান্তে মন্দির। দক্ষিণের দেওয়ালে যত মূর্তি, সবই শৈব—মহিষাসুর বধ, হরপার্বতীর দাবা খেলা, শিবের তাণ্ডব নৃত্য, রাবণের কৈলাস হরণ, আর ভৈরব। উত্তরের দেওয়ালে সব বৈষ্ণব চিত্র—লক্ষ্মী, বিষ্ণুর বরাহ অবতার, চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী নারায়ণ। মন্দিরের ভিতর দুর্গার প্রতিমা। বাহিরে দক্ষিণের রাস্তাতেও নানা দেবদেবীর মূর্তি।

পনের নম্বরের গুহাটি দোতলা। মস্ত প্রাঙ্গণ, তার চারি ধারে ছোট ছোট মন্দির ও পুরোহিতের আবাস-ঘর। উপরের তলাটি ঠিক আগের গুহার মতো।

একুশ আর উনত্রিশ নম্বরের গুহা আমরা পরে দেখেছিলুম। প্রথমটির বারান্দা আর থামগুলি আমাদের ভাল লেগেছে। আর দ্বিতীয়টির নির্মাণের কৌশল। গাইড বুঝিয়ে দিয়েছিল যে একমাত্র এই গুহাটিতেই একাধিক প্রবেশ দ্বার, ঠিক যোগেশ্বরী গুহার মতো। আর নির্মাণের কৌশল হল বম্বের এলিফ্যাণ্টার মতো। সে সবের চেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল একটি ঝর্ণা। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে গভীর খাদের ভিতর পড়ে বয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে দেখতে হয়। জলের স্বচ্ছ ধারা নিচে বাষ্পাকুল হয়ে আছে।

কিন্তু এ সবের আগে আমরা কৈলাস দেখেছিলুম।

কৈলাসের বর্ণনা আছে কালিদাসে, কিন্তু সে তুষারমৌলি কৈলাস। হিমালয়ের সেই শিখরে শিবের অধিষ্ঠান। ইলোরার কৈলাসের বর্ণনা কোন কবির লেখায় পড়ি নি। স্তব্ধ হয়ে নির্বাক বিস্ময়ে যা দেখতে হয়, নীরস গদ্যে তার বর্ণনা অসম্ভব। সে চেষ্টা কোন কবি করবেন সুললিত কবিতায়।

ইলোরার চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আমরা কৈলাসের দরজায় এসেছিলুম। আমাদের গাড়ির মতো আরও কয়েকখানি গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দৌলতাবাদেও এই গাড়িগুলি দেখেছি। বুঝতে কষ্ট হল না যে সেই বাঙালী দলটি এখন এখানে আছেন। তাঁদের ফেরার সময় নিশ্চয়ই হয়েছে। একজন দুজন করে বেরিয়ে আসছিলেন।

বাহিরে দাঁড়িয়ে কৈলাসের ভিতরের ঐশ্বর্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবু আমি কিছু খুঁজছিলুম। হঠাৎ কানে গেল : তার অভিভাবকরা যখন প্রশ্রয় দিচ্ছে, আমাদের কিছু বলার নেই।

এক প্রৌঢ়া মহিলা বললেন: আমি তাকে সাবধান করে দেব।

পাশের বউটি অল্প বয়সের। আর্তনাদের মতো বলে উঠল: না পিসিমা, না পিসিমা, তার কী দরকার! পরের ব্যাপারে আমাদের মাথা না গলানোই ভাল।

মামা মামী ভিতরে চলে গেলেন। স্বাতিও গেল। কিন্তু যাবার আগে সে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে গেল। এই কথোপকথন বোধ হয় সে শুনতে পেয়েছে।

আমি আরও একটু দাঁড়িয়ে ছিলুম। বোধ হয় আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশা ছিল। এবারে দুজন পুরুষ আসছিলেন পাশাপাশি। একজন বললেন: হতভাগা ভাবছে, দেশে ফিরলেই সব ফুরিয়ে যাবে।

তারপর আমি আর শুনতে পেলুম না।

স্বাতি পিছিয়ে এসে বলল: দাঁড়িয়ে রইলে কেন গোপালদা, চলে এস।

মুখে তার কৌতুকের হাসি।

ভিতরে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পরিকল্পনার বলিষ্ঠতা বুঝতে সত্যিই সময় লাগে। এ তো গুহা নয়, চোখে না দেখলে এ জিনিস কল্পনা করা যায় না। পাহাড়ের মাঝখানে একটি অপূর্ব মন্দির—প্রাঙ্গণ আছে, ধ্বজস্তম্ভ আছে। অলিন্দ আছে চারিদিক ঘিরে—সবই পাহাড়ের মধ্যে। এই মন্দিরের চারি দিকে পাহাড় বললে ভুল হবে। পাহাড়ের মধ্যে এই মন্দির। তফাৎ শুধু এইখানে যে প্রাঙ্গণের উপরে ছাদ নেই অন্য গুহার মতো। কিন্তু মন্দিরের শিখর আছে মন্দিরেরই মতো।

মামা মামীর পাশে এসে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর মামা বললেন: এ কেমন করে সম্ভব হল গোপাল?

মনে মনে আমি একটা ধারণা করে ফেলেছিলুম। বললুম: পাহাড়টা এখানে ভরাট ছিল। মজুররা ওপর থেকে কেটে কেটে নিচে নেমেছে, একেবারে আমাদের পায়ের কাছ পর্যন্ত। চারি দিক থেকে কেটে নেমেছে, কিন্তু মাঝখানটা কাটে নি। যে দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে এলুম, সেটা ছিল সুড়ঙ্গের মতো।

মামা বলে উঠলেন: বুঝেছি বুঝেছি। এই দরজা আর প্রাঙ্গণটা আগে গড়েছে। মাঝখানের পাহাড়টা খুদে মন্দির গড়েছে পরে।

ধীরে ধীরে স্বাতি বলল: দু হাজার বছর আগের মানুষ এ সব কী করে তৈরি করেছিল, আজ আমরা সেই কথা ভাবছি। কিন্তু তারা কী ভেবেছিল বলতে পার?

গাইড বলল: হিন্দুদের এই গুহাগুলো সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছে। রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের কীর্তি এই কৈলাস। শোনা যায়, অসংখ্য মজুর একশো বছর ধরে এই মন্দির গড়েছে। তিরিশ লক্ষ কিউবিক ফুট পাহাড় কেটে চেঁচে বাইরে ফেলতে হয়েছে। তৈরি জিনিস দেখে কাজের পরিমাণের ধারণা করা আজ বোধ হয় অসম্ভব।

তারপর বলল: আসুন।

মাঝখানের এই শিবের মন্দির লম্বা ও চওড়ায় দেড়শো আর একশো ফুট। পঁচিশ ফুট উঁচু ভিতের উপর পঁচানব্বই ফুট উঁচু মন্দির। পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে নন্দীর স্থান। দুপাশে দুই ধ্বজস্তম্ভ। প্রার্থনা ও উপাসনার ঘর দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। সামনা-সামনি তিনটি গৃহ সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত। প্রথমে আমরা উপরে না উঠে নিচেটাই ভাল করে দেখতে লাগলুম।

মন্দিরের গায়ে কারুকার্যের ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময় জাগে। এক জায়গায় গোটা রামায়ণখানা চিত্রিত দেখলুম। পাথরের উপর এমন সূক্ষ্ম কাজ আগে কখনও দেখি নি। স্বাতিকে একখানা ছবি নিতে বললুম। আমি বলবার আগেই সে ক্যামেরা খুলেছিল।

অলিন্দের ধার দিয়ে আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলুম। পিছনে এক সারি হাতি দেখলুম। বিরাট আকারের—যেন জীবন্ত জীব। আরও অনেক জন্তু ও মূর্তি।

বারান্দার অন্য ধারে গিয়ে আর একটি চিত্র দেখলুম। অদ্ভুত অপরূপ কল্পনা। দশানন রাবণ এসেছেন শিবকে লঙ্কায় নিতে। শিব যাবেন না। দশানন তাই গোটা কৈলাসটাকেই লঙ্কায় নিয়ে যাবেন। পাহাড়ের উপর নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন হর-পার্বতী। নিচে দুই অনুচর নন্দী ও ভৃঙ্গী। ক্রুদ্ধ রাবণ তাঁর বিশ হাতে কৈলাসকে উৎপাটিত করবেন। সমস্ত পাহাড় থরথর করে কাঁপছে। পার্বতী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অর্ধশায়িতা হয়ে শিবের বাম বাহু আবেষ্টন করেছেন নিজের দক্ষিণ হাতে। শিব তাঁর একখানি পায়ের ভার রেখেছেন পাহাড়ের উপর। পরিশ্রমে রাবণ স্বেদাক্ত হচ্ছেন।

নিচে থেকে এ দৃশ্যের সম্পূর্ণ ছবি উঠবে না। স্বাতি উপরের বারান্দায় উঠে ছবি নিল। বললুম: একটা জিনিস লক্ষ্য কর। কৈলাস যে কাঁপছে তা রাবণের দশ মুণ্ড ও বিশ হাত দেখে বোঝা যাচ্ছে। মনে হয়, ছবিতেও এই ভাবটি ফুটে উঠবে। ক্যামেরা বা অব্‌জেক্ট নড়ে গেলে যেমন ছবি ওঠে, এই দৃশ্যের ছবিও ঠিক তেমনি উঠবে। শিল্পীর কল্পনাকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

উপরতলা থেকে স্বাতি মূল মন্দিরেরও ছবি নিল। পিছনে পাহাড়, তার উপরে আকাশ।

মামী মন্দিরের মধ্যে ঠাকুর দেখতে ঢুকেছেন, শিবলিঙ্গ। শিবের পূজা এখানে চালু আছে কিনা জানি নে। দেশ বিদেশের লোক তো এখানে মন্দির দেখতে আসে, দেবতার দর্শনের জন্য কেউ আসে না।

বাহিরে এসে মামী বললেন: খাবে কখন?

ড্রাইভার বলল: আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাকি কয়েকটা গুহা দেখিয়ে দেব।

এবারে দূরের হিন্দু গুহাগুলি, আর জৈন গুহা। বড় অসমতল

পথ। কখনও নিচে নামছে, তারপর উপরে উঠছে। পুরনো গাড়ি টানতে চায় না, গতি রোধ হয়ে গড়িয়ে পড়বে না তো! গিয়ার বদল করে করে কোন রকমে আমরা জৈন গুহার সামনে এসে পৌঁছলুম।

পাঁচটি গুহার মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগে ইন্দ্রসভা, তারপর জগন্নাথ সভা। ইন্দ্রসভা দোতলা গুহা। পাহাড়ের ভিতর প্রায় দুশো ফুট লম্বা। চৌকো উঠোন। ডান পাশে একটি সুন্দর হাতি। উপরের তলাটি অদ্ভুত সুন্দর। ইন্দ্রের পায়ের কাছে ঐরাবত, সভার ছাদে একটি বিরাট পদ্ম। বারোটি স্তম্ভে অপূর্ব কারুকার্য, চব্বিশটি তীর্থঙ্করের মূর্তি। সভার চারি দিক ঘিরে মহাবীরের মন্দির। অনেকে বলেন, এইটিই ইলোরার সব চেয়ে সুন্দর গুহা।

জগন্নাথ সভার পরিকল্পনা একই রকম, কিন্তু আকার ছোট।

এই পাহাড়ের উপর পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি আছে। ষোল ফুট উঁচু। মন্দিরটি দুশো বছরের পুরনো। কিন্তু আমাদের আর দেখবার সময় নেই। আকাশের সূর্য অগ্নিবৃষ্টি করছে, আর পেটে হুতাশন। এখন কোন ছায়ায় বসে ক্ষুধা নিবৃত্তি না করলে সৌন্দর্য-চেতনা ফিরে পাব না।

ড্রাইভার বলল: গিরীশেশ্বর শিবের মন্দিরে খাবার ভাল জায়গা আছে। পৌঁছতে দশ মিনিটও লাগবে না।

কৈলাসে প্রবেশের আগে আমরা একবার জল খেয়েছিলুম। আবার একটু জল খেয়ে যাত্রা শুরু করলুম। খালি পেটে সৌন্দর্যের সমালোচনা আর ভাল লাগছে না।

৩২

রাণী অহল্যাবাঈ-এর তৈরি গিরীশেশ্বরের মন্দির বেশি দূরে নয়। বড় রাস্তা ধরে ফেরার পথে একটুখানি ভিতরে যেতে হয়। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শিবের মন্দির। প্রশস্ত অঙ্গন। প্রাচীরের ধারে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান। বড় বড় গাছে অনেকটা জায়গা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মামা খাবার জিনিসপত্র নামাতে বলেছিলেন। মামী বলে উঠলেন: কী নাস্তিক গো! মন্দিরে এসে কোথায় ঠাকুর দর্শন করবে, তা নয় আগেই খাবার ভাবনা!

মামীর পিছনে পা বাড়িয়ে মামা বললেন: বিপদের কথা।

আক্রমণের জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রস্তুত ছিলেন। মামা মামীকে পূজার জন্য ধরে নিয়ে গেলেন।

স্বাতি আর আমি একটা বাঁধানো গাছের নিচে বসলুম। স্বাতি বলল: শুনলে তো!

কী শুনলুম?

ওরা কী বলল তোমাকে!

কে কী বলল, আমি মনে করতে পারলুম না।

স্বাতি বলল: দেশে ফিরেই সব ফুরিয়ে যাবে ভাবছ!

এইবারে আমার মনে পড়ল, বললুম: কী এমন পাচ্ছি যে ফুরিয়ে যাবার ভয় পাব! কোন দিন ফুরোবে না, এমন জিনিস কি কিছু পেয়েছি?

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না, বলল: বোধহয় ঐ মেয়েটার কথা বলছিল, তাই না?

ঐ মেয়েটাই, যাকে আমরা একটি যুবকের সঙ্গে দেখেছিলুম

দৌলতাবাদের দুর্গ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে। সঙ্গীরা তাদের পিছিয়ে থাকবার সুযোগও দিয়েছে, আবার সমালোচনাও করেছে আড়ালে। মজা দেখছে, উপভোগ করছে। ভুলে যাচ্ছে নিজেদের যৌবনের কথা।

কৌতুকে মুখ উজ্জ্বল করে স্বাতি বলল: আমি ভাবলাম, তোমার কথাই বুঝি বলছে।

প্রথমটায় আমিও তাই ভেবেছিলুম। দুজন বউ তোমাকে সাবধান করে দেবে বলছিল।

তখুনি ভাবলাম, তোমার কথা নিশ্চয়ই না।

কেন?

তুমি তো কাপুরুষ, তোমার আর সাহস কতটুকু!

আমি চমকে উঠলুম! কী বলছে স্বাতি! এ কেমন অভিযোগ! এই কৌতুকের আড়ালে কোন গভীর ইঙ্গিত নেই তো! গম্ভীর মুখে বললুম: সত্যি বলছ স্বাতি?

মুখে আঁচল দিয়ে স্বাতি হেসে উঠল। কেন হাসল, তা কিছুতেই বলল না।

পূজা শেষ করে মামা মামী ফিরে আসছেন। আমরা খাবার আনতে গেলুম। মন্দিরের অঙ্গনে বসেই আমাদের খেতে হবে। আর কোন ভাল জায়গা নেই।

আহার সেরে ধীরে সুস্থে যখন গাড়িতে উঠলুম, মামা বললেন: এইবারে গোপাল কিছু বল।

বললুম: এই মন্দিরটি নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছি।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: কী রকম?

বললুম: শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে শেষ লিঙ্গটি নিয়েই যত গোলমাল। জয়ন্তকৃষ্ণ দাভে বলেছেন, সেটির নাম ঘুশ্মেশ্বর আর তার অবস্থান ইলোর কাছে।

তুমি কি—

হ্যাঁ, আমরা যে মন্দির দেখলুম, এরা তার নাম বলছে গিরীণেশ্বর। একেই ঘুষ্মেশ্বর বললে আর কোন গোলমাল থাকে না।

মামী বললেন: তবে তো আজ আমাদের একটা বড় কাজ হল।

আর মামা বললেন: এ নিয়ে একটু অনুসন্ধান কোরো গোপাল। শিবপুরাণের সঠিক নামটি কী, আর এই সেই জ্যোতির্লিঙ্গ কি না, তা সঠিক জানা দরকার।

কিছুক্ষণ চলবার পরে ড্রাইভার বলল: বিকেলেও একবার ইলোরা দেখতে হয়।

কেন?

বেলা শেষের শেষ আলোয় তার অপূর্ব দৃশ্য। সমস্ত পাহাড়টা লাল হয়ে যায়, আর গুহার ভিতরগুলো উজ্জ্বল আলোয় যায় ভরে। একেবারে শেষ প্রান্তে যে সব বুদ্ধের মূর্তি আছে, মনে হবে যে তাদেরও যেন প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে।

পিছন ফিরে দেখলুম, স্বাতি আমার দিকে তাকিয়েছে করুণ ভাবে। এমন একটা দৃশ্য না দেখে ফিরতে হবে! মামা বললেন: তাহলে তো বিকেল পর্যন্ত এখানেই বসে থাকতে হয়।

ড্রাইভার ঔরঙ্গাবাদের দিকে ছুটেছে। বলল: রোয়াজা, বিবি কা মক্‌বারা আর পানচাক্কি দেখতে এখনও বাকি আছে। এ সব দেখতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

কাজেই আর কোন কথা বলা চলে না।

রৌজায় ঔরঙ্গজেবের সমাধি। বড় রাস্তার ধারেই ফটক। ডান হাতে ফুল ও মালার দোকান। ভিখারীরা বসে আছে। লোকে ফুলের মালা দেয় সমাধির উপর। প্রায়ই দেখতে পাই যে মসজিদের ভিতর হয় সমাধি, কিংবা সমাধির পাশে উঠেছে মসজিদ। শ্রীরঙ্গপত্তনে

টিপু সুলতানের সমাধির পাশেও এই রকম দেখেছি। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখলুম না।

মামী গাড়ী থেকে নামলেন না। সমাধি শুনেই শ্মশানের মতো কোন স্থান কল্পনা করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ফুলওয়ালা ফুল নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। মামা ভেংচি কেটে বললেন: ফুল দেবার তো আর জায়গা নেই, এইখেনেই দিচ্ছি।

বাংলা কেউ বোঝে না, তাই রক্ষে। ঔরঙ্গজেবকে নিশ্চয়ই এরা সম্মানের আসনে বসিয়েছে। মুসলমান প্রজার জন্য তিনি কী না করেছিলেন! মুসলমান যেন নেমকহারাম না হয়!

ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সে তো বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, যাকে মামা ঘৃণা করেন। কিন্তু মানুষ ঔরঙ্গজেবের খবর কি তিনি মনে রেখেছেন? সাদাসিধে সরল নিরভিমান মানুষ, নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান। মদ তিনি স্পর্শ করেন নি, চরিত্রহীনতা তাঁকে কলঙ্কিত করে নি। মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও তিনি পুত্রদের যে পত্র দিয়েছিলেন তা তো ঘৃণা করবার মতো নয়, কোন আদর্শ রাজর্ষির অমূল্য উপদেশ বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হবে।

ঔরঙ্গজেবের শিল্প ও সাহিত্যপ্রীতি ছিল না, সরকারী ইতিহাস রচনা বন্ধ করেছিলেন। সাধারণ লোকও যাতে তাঁর রাজ্যশাসনের কথা না লেখে, তিনি সেই আদেশই জারি করেছিলেন। ধর্মে তাঁর গোঁড়ামি ছিল। সেই গোঁড়ামি তাঁকে সন্দিগ্ধ ও নিষ্ঠুর করেছে। তাঁর উদ্যম ও দক্ষতাকে অতিক্রম করেছে তাঁর সন্দিগ্ধ মন। এত বড় মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার বীজ তিনি নিজে হাতেই বপন করে গেছেন। সে ইতিহাসের কথা।

এমন সাদাসিধে অনাড়ম্বর কবর আমরা আগে কখনও দেখি নি। উন্মুক্ত আকাশের নিচে একটি শ্বেত পাথরের বেদী, তার

পশ্চিমের দিকটা একটা সুন্দর পাথরের জালি দিয়ে আড়াল করা। সমাধির উপরে কিছু লেখা নেই। সজ্জা নামের একটি পবিত্র গুল্ম এর একমাত্র অলঙ্কার। সমাধির উপরে কিছু ফুল ছড়ানো আছে। ভক্তদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। উৎসবের দিনে এখানে মেলা বসে, সঙ্গীত পরিবেশন হয় নহবৎখানার উপর থেকে।

আমার মনে পড়ল ঔরঙ্গজেবের শেষ বাসনার কথা। তাঁর রাজকোষের কোন অর্থ ব্যয় হবে না তাঁর সমাধি নির্মাণের জন্য। নিজে হাতে টুপি তৈরি করে বিক্রি করতেন। মৃত্যুর পূর্বে সেই টাকা থেকে চার টাকা দু আনা সরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর সমাধির খরচ বলে। আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সমাধি নির্মিত হয়েছে চার টাকা দু আনায়।

দুঃস্থ প্রজার জন্যও তিনি স্বোপার্জিত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন— তিনশো পাঁচ টাকা। নিজে হাতে তিনি কোরাণ নকল করেছিলেন, সেই কোরাণ বিক্রির টাকা।

এই ঔরঙ্গজেবের সমাধি দেখে আমরা ফিরে এলুম। তাঁকে আমরা খামখেয়ালি বাদশাহ বলেই জানি, নিরভিমান মানুষ বলে তাঁর পরিচয় পাই নি।

বিবি কা মক্‌বারা তাঁরই পত্নী রাবিয়া দুরানীর সমাধি। ঔরঙ্গাবাদ শহরের মাইল খানেক উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। দূর থেকে এই সমাধিকে তাজমহল বলেই মনে হবে। অনেকক্ষণ সময় লাগবে ভুল বুঝতে। ঔরঙ্গজেব দ্বিতীয় তাজমহল রচনার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পপ্রীতির অভাবে অর্থব্যয় করেন নি অকৃপণ হাতে। সেই দৈন্যের জন্যই তাজমহল হয় নি, হয়েছে বিবি কা মক্‌বারা।

এখানে একটি নতুন খবর পেলুম। এই মক্‌বারা নাকি ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহ নির্মাণ করেছেন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মা দিলরসবানু বেগমের স্মৃতিতে। রাবিয়া দুরানী নামে তিনিই পরিচিত ছিলেন।

স্থপতির নাম আতাউল্লা ও হনস্পৎ রায়। খরচ হয়েছে ছ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছুশো তিন টাকা সাত আনা।

উঁচু খিলানওয়ালা ফটক থেকে মক্‌বারা পর্যন্ত ফোয়ারার সারি আছে। সাইপ্রাস গাছ আছে ছুধারে, আছে ফুলের বাগান। সাদা মার্বল পাথরও কিছু ব্যবহার করা হয়েছে, বাকিটা স্টাকো প্লাস্টার আর অরাবেস্ক। ফাঁকির কাজ, কিন্তু এ ফাঁকি দূর থেকে ধরা পড়ে না, ছবিতে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না চাঁদের আলোয়। দূর থেকেই স্বাতি ছবি তুলল।

এখানে আমরা বেশি সময় নষ্ট করলুম না। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের পানচাক্কি দেখতে হবে। পানচাক্কি কী জিনিস, না দেখে তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়েছিল। দেখবার পর সহজেই সব বুঝতে পারলুম। কয়েক পয়সার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছিল। ছোট গেট, ডান দিকে একটা বড় জলাশয়। কোনখান থেকে তোড়ে জল আসছে। নদীর সঙ্গে নাকি যোগাযোগ আছে। নদী দেখি নি। জলাশয়ের তিন দিক ঘুরে আমরা অপর প্রান্তে এলুম। তিন দিকেই বাঁধানো রাস্তা। সেই কোণায় একটি ঘর। সেইটেই পানচাক্কি। আমাদের টিকিট দেখে একজন লোক চাক্কি দেখাল। গম পেষার জাঁতা। সেটা হাতে চলে না, চলে জলে। কোথাও একটা ব্যবস্থা আছে, সেখানে ঘুরিয়ে দিলেই হুড়মুড় করে সেই মস্ত জাঁতাটা ঘোরে। ঘর থেকে বেরিয়ে একটা জানালা দিয়ে আমরা জাঁতা ঘোরানোর কারসাজিটা দেখলুম। কোন এক রন্ধ্র দিয়ে এই জলাশয়ের জল ভিতরে ঢুকছে, জলের তোড়ে নিচে একটা পাখনা ঘুরছে। উপরের জাঁতা তার সঙ্গে যুক্ত বলে জাঁতাও ঘুরছে। ভারি সরল ব্যবস্থা। পুরাকালে নাকি এতেই গম পেষা হত। আজকাল পানিচাক্কির বদলে তেল কলের চাক্কি বসেছে। বিছ্যুতের চাক্কিও।

ফেরার পথে শুনলুম যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মগুরু বাবা শাহ্ মুজফ্ফর শাহর সমাধি আছে পানচাক্কিতে। আর কী দেখবার আছে সে খবরও

নিলুম। খাস ঔরঙ্গাবাদে আর কিছু নেই। কিন্তু শহরটি যে খুব প্রাচীন তার প্রমাণ এখনও আছে। শহর থেকে মাইল দুই উত্তরে আছে সপ্তম শতাব্দীর বারোটি বৌদ্ধ গুহা। কিন্তু ইলোরা দেখতে এসে এ সব গুহা কেউ দেখে না। শহর পত্তন করেছিলেন মালিক অম্বর। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে মোগল এই শহর অধিকার করেন। শাসনকর্তা হয়ে আসেন ঔরঙ্গজেব। তাই তাঁর নামটি আজও এখানে অক্ষয় হয়ে আছে।

কাল ভোর বেলায় আমাদের অজন্তা যেতে হবে। পঁয়ষট্টি মাইল পথ যাওয়া আসা। মোটরে গেলে আমাদের ফিরে আসতে হবে। সঙ্গে মালপত্র বেশি, অত মালপত্র মোটরে উঠবে না। বাসে গেলে সব নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু মামা তাকে হাঙ্গামা মনে করেন। কাজেই আমরা মোটরে যাব, ফিরে এসে ট্রেন ধরব এইখানেই।

ড্রাইভার বলল, পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে একটা শহর আছে, নাম পাইথন। গোদাবরী নদীর তীরে হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। নাগ ঘাট একটি প্রসিদ্ধ স্নানের ঘাট। নিকটেই দুটি মন্দির, গণপতির মন্দির তাদের অন্যতম। অনেক প্রাচীন ভাঙা বাড়ি পাইথনের একটা ঐতিহ্যময় ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মামা আমাকে প্রশ্ন করলেন: এ রকম নাম কি ইতিহাসে আছে?

বললুম: ইতিহাসে এই শহরের নাম প্রতিষ্ঠান। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় একশো বছর আগে থেকে যে সাতবাহন বা অন্ধ্র ভৃত্যরা তিনশো বছর রাজত্ব করেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁদেরই রাজধানী। টোলেমির লেখাতেও এ কথা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, পাইথনে ছিল অন্ধ্র রাজা দ্বিতীয় পুলমায়ীর রাজধানী। কিন্তু সে গৌরব কি আর আজ আছে!

একটি নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম শুনলুম। মনভাও। একান্ত ভাবে তারা কৃষ্ণভক্ত। চতুর্দশ শতাব্দে এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র স্থাপিত

হয়েছে পাইথনে। পাইথনের আরও একটি জিনিস বিখ্যাত। সোনা-রূপোর কাজ-করা কিংখাব, তাতে অজন্তার নক্সা। সেই জন্যেই বোধহয় সুন্দর বেশি।

ড্রাইভার যখন হোটেলের সামনে আমাদের নামিয়ে দিল, সূর্য তখন অস্ত গেছে। কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে নামে নি। বলল: আবার আসব কি?

আবার কেন?

কেনাকাটার যদি কিছু থাকে?

মামী উৎকর্ণ হয়ে বললেন: কেনবার মতো কিছু আছে নাকি?

ড্রাইভার বলল: ঔরঙ্গাবাদের অনেক জিনিস বিখ্যাত। পাইথনের কিংখাব বলেছি, ঔরঙ্গাবাদেরও কিংখাব আছে। কার্পেট আছে সুতো রেশম আর পশমের। সুতোর শাল, হিমরু, মশরু, নির্মল আর বিদ্রির কাজ—

মামী বিচলিত হলেন।

আমি বললুম: ঘণ্টাখানেক পরে বেরোব।

আবার বেরোবে?

মামা খুশী হতে পারলেন না। কিন্তু বাজারে গিয়ে মামী যে খুশী হবেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। স্বাতিও সে কথা বিশ্বাস করে। আমার মতলব বুঝে স্বাতি একটু হাসল।

বাজারে গিয়ে স্বাতিও খুশী হল। আমি তার সামনে একটি নতুন জিনিস ধরে দিলুম। সুতোর শাল, কিন্তু দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। নানা রঙের, নানা ডিজাইনের। অল্পস্বল্প কাজ করাও আছে, আবার, জামেয়ারের মতো সারা গায়ে কাজও আছে। আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: এ সব কলকাতায় আজকাল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এমন সুন্দর কোথাও দেখি নি।

দাম শুনে মামী আশ্চর্য হলেন। পনর ষোল থেকে পঁচিশ ত্রিশ

টাকা পর্যন্ত। আঠারো কুড়ি টাকাতেই পছন্দমতো পাওয়া যাচ্ছে। আশ্চর্য হবারই কথা। কিন্তু মামা বললেন: এ ফ্যাশান বেশি দিন থাকবে না।

শাড়ি এখানে সব আর্ট সিল্কের। আর্ট সিল্কের কারখানা আছে ঔরঙ্গাবাদে। স্বাতি এ সব পছন্দ করে না। বলল: আর্ট মানে তো নকল। আমি খাঁটি জিনিস পছন্দ করি।

বললুম: আর্ট নকল নয়, তোমরা আর্ট নকল কর। জগতে খাঁটি জিনিস যদি কিছু থাকে তো সে আর্ট।

মামা বললেন: গোপাল ঠিকই বলেছে। মানুষ যত দিন খাঁটি ছিল, তত দিনই আর্টের মর্যাদা দিয়েছে। এই ভেজালের যুগেই নকলের নাম হয়েছে আর্ট।

এ সব কথায় মামীর কান ছিল না। তিনি ততক্ষণে দুখানা শাল কিনে ফেলেছেন।

ড্রাইভার যে সব নাম বলেছিল, সে সবও আমরা একে একে দেখলুম। হিমরু আর মশরুও নক্সা করা কাপড়। হিমরু দিয়ে পুরুষের আর মশরু দিয়ে মেয়েদের পোশাক হয়। মোটা হিমরু দিয়ে টেপেস্ট্রির কাজও চলে।

বিদ্রি আর নির্মলের কাজ অন্য দোকানে। বিদরের মাটি দিয়ে নানা জাতের জিনিস হয়। মেয়েদের হাতের বালা ট্রে সিগারেট-কেস, আরও কত কি। কুচকুচে কালো আর উজ্জ্বল সাদার উপরে নক্সা। ভিতরে ধাতুর জিনিস, বাহিরে মাটির সঙ্গে রূপোর জরি। নক্সা তুলেছে বিদরের প্রাচীন দুর্গ থেকে।

নির্মল হল খেলনার কাজ। এক রকমের হাল্কা সাদা কাঠ পাওয়া যায়। তার উপরে রঙ চড়িয়ে নানা রকমের খেলনা তৈরি হয়। এখন কাজের জিনিসও তৈরি হচ্ছে—ট্রে ফার্নিচার ইত্যাদি।

মামা বললেন: আর কত ঘোরাবে?

ড্রাইভারের বোধ হয় আরও কিছু দেখাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু

আমরা রাজী হলুম না। কালকের জন্তে উৎসাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ফেরার পথে মামা বললেন : আর একটি দিন।

তারপর ?

তারপর আমাদের যাত্রা শেষ।

স্বাতি বলল : কিন্তু যাত্রার কি শেষ আছে ! কই, পৃথিবী তো থামে না !

মানুষ থামে।

কেন থামে ?

এ কথার উত্তর কে দেবে ! উত্তর আমার জানা নেই।

৩৩

সকাল বেলাতেই বেরোতে হল। পঁয়ষট্টি মাইল পথ যাতায়াত আছে, তারপর ঘুরে ঘুরে দেখা। শুধু তো গুহা আর তার কারুকার্য নয়, মূর্তি আছে, চিত্র আছে। সমস্ত দেওয়াল ভরা বিচিত্র চিত্র। বিজলির বাতি জ্বেলে একটা একটা করে দেখতে হয়। ইলোরায় এ সব চিত্র ছিল না। রঙের কাজ যা সামান্য ছিল, তা দেখতে সময় লাগে নি। খোলামেলা পরিবেশে আর অনেক লোকের ব্যবহারে তার বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে।

হঠাৎ মামা বললেন: গোপাল আজকাল কিছুই বলছ না।

স্বাতি বলল: ভাণ্ডার খালি হয়ে গেছে।

সত্যি নাকি?

নিরাপদে থাকবার জন্য বললুম: সত্যি।

মামা বললেন: বল ক্লান্ত হয়েছ।

তাও সত্যি। এক সঙ্গে এত ঘোরার অভ্যাস ছিল না।

আমাদেরই কি ছিল! হরিদ্বারে গেলে কাশী, আর দিল্লী গেলে মথুরা বৃন্দাবন। বড় জোর প্রয়াগ আর আগ্রা। এবারের মতো রাজ্য জয় আমরা কখনও করি নি।

স্বাতি বলল: রামখেলাওন থাকলে —

মামীর চোখের দিকে চেয়ে স্বাতি থেমে গেল।

ভেবেছিলুম, পিছন ফিরে ইতিহাস শোনাবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, দুধারের প্রান্তর আর গাছপালা দেখতে দেখতেই চলতে পারব। কিন্তু স্বাতির কথায় সে ভুল ভাঙল।

বলল: এত শহর থাকতে গাঁয়ের ভেতর কেন অজন্তা হল?

বললুম: অজন্তা নিজে থেকে হয় নি, মানুষে গড়েছে।

সেই কথাই তো বলছি। মানুষ যখন গড়ল, তখন একটা ভাল জায়গায় গড়তে পারত। কলকাতায় কিংবা দিল্লীতে।

কলকাতায় পাহাড় কোথায়?

দিল্লীতে তো আছে। ঐ বেঁটে আরাবল্লীতেই তো গুহা তৈরি করতে পারত।

বললুম: দু হাজার বছর আগে দিল্লীর বেশি মান ছিল, না অজন্তার, সেইটে ভেবে দেখতে হবে।

মামা বললেন: বল কি!

আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের পরে দিল্লীতে আর দর্শনীয় কিছু ছিল না। বর্তমান দিল্লীর ইতিহাস খুব পুরনো নয়। এ দিকে অজন্তার দাম ছিল অন্য কারণে। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে যে বাণিজ্য পথ ছিল, অজন্তা তারই ধারে। তার নাম ছিল দাক্ষিণাত্যের দরজা। বৌদ্ধ শ্রমণরা তাই এই স্থানকেই সংঘারামের উপযুক্ত বলে বেছে নিয়েছিলেন। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আরও একটা সুবিধা ছিল। যাত্রীরা বিশ্রাম নিতে আসত। তাদের প্রয়োজন মেটাবার সময় কিছু উপদেশও দেওয়া চলত।

বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় তিন শো বছর পরে সন্ন্যাসীরা এই স্থান নির্বাচন করেন। আর অনলস পরিশ্রমে এই গুহাগুলি নির্মাণ করেন প্রায় সাড়ে চার শো বছর ধরে। এই প্রসঙ্গে চালুক্য ও রাষ্ট্রকুট রাজাদের কথা এসে পড়ে। চালুক্যরা সকল ধর্মকে সমান সম্মান দিতেন। আর তাঁদের সময়েই এই গুহা মন্দির নির্মাণ উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছে। রাষ্ট্রকুটেরা এত উদার ছিলেন না। তাদের সময়ে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি কমেছিল, কিন্তু এই নির্মাণের কাজ চলেছিল কতকটা অবাধেই। পণ্ডিতরা বলেন, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সব কাজ হয়েছে।

মামা বললেন: যত গুহা মন্দির সব এ দিকেই শুনেছি।

বললুম: পশ্চিমঘাট পাহাড়টা শুনেছি তার খুব উপযোগী। এ

দেশের লোক বুঝেছিল যে ইট কাঠের মন্দিরে অনেক ঝামেলা আছে, মেরামত লেগেই থাকবে। কিন্তু এই কঠিন পাহাড় কেটে একবার একটা মন্দির গড়লে আর কোন ভাবনা নেই, চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত।

যে পথ ধরে আমরা চলেছি, সে পথের কোন সৌন্দর্য নেই। আশেপাশেও কিছু সুন্দর দেখতে পাচ্ছি না। স্বাতি বলল: অজন্তার পথ এমন রুক্ষ!

ড্রাইভার তার মন্তব্য বুঝতে পেরেছিল। বলল: সুন্দর পথ দেখতে হলে জলগাঁও থেকে অজন্তা আসতে হয়। প্রাচীন ঘর বাড়ি, শস্যশ্যামল গ্রাম, নদী পাহাড় সবই আছে। অজন্তার পাহাড় থেকে যে নদী বেরিয়েছে, সে নদী আপনি তিনবার পেরোবেন।

স্বাতি নিরাশ হয়েছিল। ড্রাইভার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: ফর্দাপুর পেরিয়ে আপনার ভাল লাগবে। ঘাটের দৃশ্য খুবই সুন্দর। দু দিকের পথ এসে মিলেছে, তারপর পাহাড়ে ওঠা।

অজন্তা বুঝি পাহাড়ের ওপর!

পাহাড়ের মাঝখানে। গুহা না থাকলেও অজন্তার দৃশ্য আপনাদের ভাল লাগত।

আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলুম। কত কালের পুরাতন এই গুহা মন্দিরগুলি, তার সঠিক বয়স কি কেউ নির্ণয় করতে পেরেছেন! সাধারণ ভাবে বলা হয় যে তিনশো থেকে তেরোশো খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে ইলোরার গুহাগুলি। অজন্তা আরও পুরাতন। এর নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে আর আটশো খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এর চেয়ে প্রাচীন গুহা কি ভারতে নেই!

আছে। কোথায় যেন পড়েছি যে অজন্তার চেয়ে এক শো বছর আগে এই ঔরঙ্গাবাদ জেলার পিতলখোরায় নির্মিত হয়েছিল ভারতের প্রথম গুহা মন্দির। সে তিন শো পূর্বখ্রীষ্টাব্দের কথা। ঔরঙ্গাবাদ থেকে

ইলোরা ও খুলদাবাদ হয়ে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে ও চালিশগাঁও রেল স্টেশন থেকে একুশ মাইল দূরে এই গুহাগুলি এখনও মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। বাসে যেতে যেতে কোন অখ্যাত স্থানে নেমে হেঁটে যেতে হয় অনেকটা পথ। তারপর পাহাড়ের গায়ে ছশো ফুট নেমে সেই চোদ্দটি গুহা দেখে স্তম্ভিত হতে হয় তার স্থাপত্য শিল্প ও ফ্রেস্কো দেখে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অজন্তা আবিষ্কৃত না হলে লোকে হয়তো পিতলখোরার গুহা দেখত পরম বিস্ময়ে।

প্রশান্ত ও মসৃণ পথে অজন্তা পৌঁছতে আমাদের বিলম্ব হল না। সকালের রোদ প্রখর হবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলুম। প্রাঙ্গণের মতো একটা প্রশস্ত খোলা জায়গায় মোটর দাঁড়ায়। বড় বড় বাস এসেও এইখানে দাঁড়াবে। এক ধারে একটি চালাঘরের ভিতর চা-এর দোকান। অর্ডার দিলে নাকি ডাল ভাতও খেতে দেয়, কিংবা ডাল রুটি ডিমের ওমলেট। অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাবার দরকার কারও নেই। একটা পাকা ঘরের ভিতর যাত্রীদের মালপত্র রাখবার ব্যবস্থা আছে। যারা বাসে আসে, তাদের মালপত্র নামিয়ে রাখা হয়। পয়সা দিতে হয় মাল প্রতি এক আনা। কুলিদের আলাদা পয়সা। পরে দেখেছিলুম যে বাসের মাথায় যারা মাল তোলে তাদের স্বতন্ত্র দক্ষিণা।

চারি দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: অজন্তা কোথায়?

অজন্তার পথ ড্রাইভার দেখিয়ে দিল! ধাপে ধাপে বাঁধানো সিঁড়ি উঠেছে। ততক্ষণে গাইড এসে মামাকে চেপে ধরেছে। সরকারী গাইড আট টাকার কমে যাবে না। আমাদেরও গাইড চাই। কাজেই সে বহাল হয়ে গেল। হাতে যার সময় আছে, ইলোরায় তার গাইড না হলেও চলবে। এখানে নাকি অসম্ভব। ছবি দেখতে হলে আর বুঝতে হলে গাইডের সাহায্য অপরিহার্য।

কয়েক ধাপ উঠেই মামা বললেন: এর চেয়ে ইলোরা দেখছি ভাল।

মামী বললেন : কিছু না দেখেই কী করে তা বলছ ?

না দেখে কেন, দেখেই তো বলছি। এত পরিশ্রম সেখানে ছিল না।

তাই বল।

গাইড বাঙলা বোঝে কিনা জানি না, বলল : সব দেখবার পর এ কথা বলবেন না, বলতে পারবেন না। আপনাদের তো বেশি বলবার দরকার নেই, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ফ্রেস্কো ছবির এমন নমুনা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। ষোল নম্বর গুহায় দি ডাইয়িং প্রিন্সেস নামে একটি ছবি আছে। সে সম্বন্ধে গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব বলেছেন, for pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story—cannot be surpassed in the history of art. The Florentines could have put better drawing and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression into it.

অজন্তার গাইড প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন্‌ ভাষায় কথা বলবে—হিন্দীতে না ইংরেজীতে। মামা হিন্দীর চেয়ে ইংরেজী বোঝেন সহজে। বলেছিলেন, ইংরেজীতেই বল। এখন দেখছি, অনেক কথা সে মুখস্থ করে রেখেছে। গড় গড় করে বলছে অনায়াসে।

এখানে উনত্রিশটা গুহা। চারটি চৈত্য, বাকিগুলি বিহার। সবই বৌদ্ধ গুহা। হীনযান সম্প্রদায়ের গুহাগুলি একটু সাদাসিধে বেশি। অলঙ্কৃত বেশি মহাযান গুহাগুলি, ভিতরে বুদ্ধের মূর্তিও আছে।

গাইড বলল : যাঁদের হাতে সময় কম থাকে, তাঁদের আমরা অল্প কয়েকটা গুহা দেখাই—এক আর ষোলতে বিহারের নমুনা, চৈত্যের নমুনা উনিশ আর ছাব্বিশে।

যে সব গুহার ভিতরে চিত্র আছে, তা দেখবার জন্য বাতির

দরকার। পাঁচ টাকা জমা দিলে সরকারী বাতি পাওয়া যায়। একটা ডায়নামো আছে, তাতেই বিদ্যুতের আলো পাওয়া যায়। ঘরময় তার ছড়ানো, সরকারী লোক সেই তার টেনে টেনে দেওয়ালে বাতি দেখায়। ছবি তোলায় আপত্তি নেই, কিন্তু এই আলোতে পরিষ্কার উঠবে না। ফ্ল্যাশ দিয়েই তুলতে হবে।

এক নম্বর গুহাটা আমরা ভাল করে দেখলুম, মহাযান গুহা। মস্ত বারান্দা, নক্সা করা দরজা আর উড়ন্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরার মূর্তি আঁকা স্তম্ভ। ছাদে ও দেওয়ালে যে ছবি আছে, একে একে তাও দেখলুম—রাজসভায় রাজদূতের অভ্যর্থনা, নন্দর ধর্মান্তর, যুবরাজ মহাজনকের রাজ্যপ্রাপ্তি, পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব, পত্নী ও পুরনারী পরিবৃত নাগরাজ।

দু নম্বর গুহাতেও অনেক সুন্দর চিত্র আছে। বুদ্ধের জন্ম, ক্রীতদাসী কন্যার শাস্তি, একটি দূত ও একটি শোভাযাত্রা। চার নম্বর গুহাটি সব চেয়ে বড় বিহার, ছ নম্বরটি দোতলা, আর সাত নম্বরটি নাকি বম্বের এলিফ্যাণ্টার মতো।

আট নম্বর থেকে হীনযান গুহা। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন হল নয় নম্বর। খ্রীষ্টের জন্মের একশো বছর আগে এটি তৈরি। দশ নম্বর গুহাটি শুধু যে সব চেয়ে বড় তাই নয়, তার মধ্যে অনেক মজার ছবিও আছে। সে যুগের মানুষ কেমন কাপড় পরত, কেমন গহনা, তার নমুনা আছে। বুট-পরা সৈনিক আছে, বিচিত্র নক্সার ম্যানিলা সার্ট, আর মেয়েদের হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ফোল্ডিং চেয়ার টেবিল, আধুনিক যুগেও ব্যবহৃত হচ্ছে এমন অনেক জিনিস।

ষোল নম্বর গুহার স্থাপত্য অতি চমৎকার। মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের বিরাট মূর্তি, আর দেওয়ালে সেই বিখ্যাত চিত্র মুমূর্ষু রাজকন্যা। দি ডাইয়িং প্রিন্সেস্।

সতের নম্বর গুহার অনেক চিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক আছে—বুদ্ধপত্নী যশোধরা ও পুত্র রাহুল, বিজয়ের সিংহলে অবতরণ, নিষ্ঠুর

লোভী ব্রাহ্মণ, হস্তী নলাগিরি শাসন, সিদ্ধির পর বুদ্ধের স্ত্রীপুত্র দর্শন। বাহিরের বারান্দাতেও কয়েকটি সুন্দর ছবি আছে—রাজপুত্র ও তাঁর পত্নী, ছত্রধারী রাজকন্যা আর গন্ধর্ব।

উনিশ নম্বর গুহা একটি সুন্দর চৈত্য। চব্বিশ নম্বর গুহা সম্পূর্ণ হলে সব চেয়ে বড় বিহার হত। ছাব্বিশ নম্বর গুহার ভিতর নির্বাণ-প্রাপ্ত বুদ্ধের বিরাট মূর্তি আছে।

কিন্তু এই বর্ণনায় অজন্তার রূপ ফোটে না। চোখে দেখেও সবটুকু সৌন্দর্য ধরা পড়ে না। একটি চারকোণা থামের উপর হয়তো একটা পাথরে খোদাই করা নক্সা দেখছি। একটি বৃত্ত, তার ভিতর পদ্মের দল, আরও নানান কাজ। গাইড বলল: দেখা আপনার সম্পূর্ণ হয় নি।

কী রকম?

ঘরের আর এক ধার থেকে বাতিওয়ালাদের ডেকে এনে বলল: ধর।

তারা বাতি তুলে ধরল।

এ কি! এ তো মরা পাথর নয়! এর ভিতর থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে, এ কি হীরের কুচি দিয়ে তৈরি!

ছবির বেলায়ও তেমনি। একাগ্র মনে আমরা একটি ছবি দেখছি। আলোতেই দেখছি। এমন লীলায়িত ভঙ্গি বুঝি কোন দিন দেখি নি, এমন সুন্দর কমনীয় রূপ! পাশে থেকে গাইড বলল: গলার মালাটি দেখেছেন?

বাতিটা তুলিয়ে দিতেই সেই মালা ঝকমক করে উঠল। মনে হল না যে ওটি শিল্পীর তুলিতে আঁকা রঙের মালা। চোখের সামনে যে জড়োয়া মালা দেখতে পাচ্ছি! নিশ্চয়ই কোন মণিকার শখ করে ঐ মালা পরিয়ে দিয়েছে ছবির গলায়।

এমনই জীবন্ত কত মূর্তি, কত ছবি! গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব ঠিকই বলেছেন, দুনিয়ার অন্য দেশে হয়তো ভাল নক্সা আঁকতে পারত, কিংবা রঙ লাগাত ভাল, কিন্তু ছবিতে এমন প্রাণ দিতে পারত না।

দেখতে দেখতে আমরা অজন্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলুম। বাঁকা চাঁদের মতো পাহাড়, তারই গায়ে এই গুহাগুলো অনাদিকাল থেকে মানুষ আকর্ষণ করছে। সামনে একটা ঝর্ণা ঝরঝর করে গড়িয়ে নামছে। নিচের দিকে তাকিয়ে অজন্তার অন্য রূপ দেখতে পেলুম। ছোট একটি পাহাড়ী নদী উপল ও বালির বুকের উপর দিয়ে বইছে। ছোট ছোট গাছপালা, ফুলের গাছও দু-একটি দেখছি। এ সমস্ত প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে। আমরা এই নদীর উপরেই যেন দাঁড়িয়ে আছি। একেবারে খাড়া পাহাড়, তাই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে।

আমার মতো স্বাতিও নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার চোখে আমি যেন নিমন্ত্রণ পেলুম। নিচের ঐ নদীর ধার যে অগম্য নয় তা জেনে ফেলেছি। দু-একজন তরুণ সেখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বিপ্রহরের উত্তাপ সেখানে পৌঁছচ্ছে না।

মামা মামী ফিরে যাচ্ছেন। অর্ধচন্দ্রের আকার এই পাহাড়টা ঘুরে আমরা অন্য ধারে পৌঁছব। পাথরের ধাপ আছে, কাঠের পুল আছে, ঝরণার জল আছে—এ সমস্ত ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিচে নামবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঁরা নিচে নেমে যাবেন। আমরাও নামব। তারপর আহার। বেলা এখন দ্বিপ্রহর, ক্ষিধে পেয়েছে, তৃষ্ণাও পেয়েছে। দেহের ক্ষুধা মিটবার আগে আর কিছু হয় তো ভাল লাগবে না।

ইতিমধ্যে যে কয়েকখানা বাস এসে পৌঁছে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক মানুষ এসেছে। বাতির টাকা জমা দিয়ে অনেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে সবাই এদিকে আসছে। ইলোরার সেই বাঙালী দলটিকেও আমরা দেখতে পেলুম। বিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁরা এগোচ্ছেন। এতে সময় নষ্ট হয়, গাইডেরও অসুবিধা হয়। যখন তা বুঝতে পারবেন, তখন হয় তো এক সঙ্গে চলবেন।

স্বাতি বলল : সেই মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি নে।

সেই পুরুষটিকেও না।

এই দলটিকে আমরা সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলুম।

স্বাতি বলল : লজ্জায় বোধ হয় আর বেরোয় নি।

লজ্জা কিসের !

আর কী বাকি আছে !

এক সঙ্গে রয়ে গেলে যে আরও লজ্জা !

প্রথম গুহাটা আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। অজন্তার এই শেষ গুহা। এর পর আমরা নিচে নামব। আর হয় তো উঠব না, আর হয়তো আসবও না দেখতে। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তার হৃদয়ের কথা শুনতে পাচ্ছি। এই অন্ধকার গুহাটাই সে একবার শেষ বারের মতো দেখে যাবে। বললুম : চল।

স্বাতি আগে, আমি তার পিছনে। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল, আমার ডান হাতটা চেপে ধরল তার বাঁ হাত দিয়ে, তারপরেই আমাকে বাহিরে টেনে আনল।

অস্পষ্ট আলোয় আমি যা দেখতে পেয়েছিলুম, তাই যথেষ্ট। ছুটি মানুষকে বড় বেশি ঘনিষ্ঠ দেখাচ্ছিল। শুধু একটু সৌরভ নিয়েই আমরা পিছিয়ে এলুম। চেনবার চেষ্টা না করেও যেন মানুষ ছুটিকে আমরা চিনতে পেরেছি।

স্বাতি আমার হাত ছেড়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিল। আমি ভুলি নি। আমি তার হাতের উত্তাপে যেন মনের উত্তাপ পাচ্ছি। আমার দেহমন কি মরা মানুষের মতো শীতল !

৩৪

আহারের পর স্বাতি বলল : এই দুপুর রোদে আমরা ফিরব না, নিচের ঐ নদীর ধারে একটু বিশ্রাম নেব। তোমরা গাড়িতে বিশ্রাম কর। আমরা একটু ঘুরে আসি। বলে আমাকে ডাকল : এসো গোপালদা!

আমি তার সাহস দেখে আজ বিস্মিত হলুম না। স্বাভাবিক সঙ্কোচে সে যে তার সাহস লুকিয়ে রেখেছে, সে পরিচয়ের আভাস আমি পেয়েছি। তার পাশাপাশি পা ফেলে আমি নদীর ধারে নেমে এলুম—বালির উপর, উপলের উপর। কোন স্নিগ্ধ ছায়ায় একটা বড় পাথরের উপর আমাদের বসতে হবে। স্বাতি অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বলল : সামনে ঝর্ণা চাই।

আমি হেসে ফেললুম।

হাসলে যে!

মধ্যাহ্নের রৌদ্র যবে—

স্বাতি উত্তর দিল না। খুঁজে খুঁজে একটা বড় পাথর বার করল, একটুখানি ছায়াও। নিজে বসে আমাকে তার পাশে ডাকল। সঙ্কীর্ণ স্থান, তবু তার নিমন্ত্রণ অন্তরঙ্গ। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে নিজের হাতখানা দিল বাড়িয়ে। আর দ্বিধা চলে না, আমি এসে ঘেঁষে বসলুম।

দু-একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে কাছে ও দূরে। কে লক্ষ্য করছে, আর কে করছে না, তা আমরা দেখলুম না। পৃথিবীতে আমাদেরও একটা অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করব!

নদীর উপর দিয়ে গাছের নিচে দিয়ে পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায়

হাওয়া বইছে। রৌদ্রের উত্তাপ নেই এতটুকু, আছে একটু নেশার মতো শিরশিরে শীত। স্বাতি তার শাড়ির আঁচল এক হাতে চেপে রেখেছে, ছেড়ে দিলেই বোধহয় ছোঁয়াছুঁয়ি হবে।

সে চুপ করে ছিল। আমি ভাবছিলুম, কী ভাবব। ভাববার কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

হিউএন চাঙের কথা ভাবব। সেই চীনা পরিব্রাজক পায়ে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনিও এসেছিলেন এই অজন্তা গুহায়। তাঁরও আগে ফা হিয়েন। অজন্তাকে উপেক্ষা করতে তিনিও পারেন নি। দুজনেই তাঁদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে অজন্তার ঐশ্বর্যের কথা ধরে রেখে গেছেন। দুঃসাহসী তাঁদের ভ্রমণের পথ।

কী আশ্চর্য! এই কথাটি যেন কোথায় আমি পড়েছি। দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে। কোথায় পড়েছি সহসা মনে পড়ছে না।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল: কী ভাবছ?

কী ভাবছি!

সত্যিই তো, আমি এখন কী ভাবছি! নিজের কথা ভাবছি না, স্বাতির কথাও না। অজন্তার কথাও আর আমার মনে পড়ছে না। আমি কি একটি কবিতার লাইন ভাবছি!

চুপ করে রইলে যে!

একটি কবিতার লাইন মনে পড়েছে। ভাবছি, কোথায় পড়েছি!

বল।

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে—

স্বাতি একটু হাসল।

বললুম: হাসলে যে!

এই কবিতা তোমার এখানে কেন মনে এল?

তা তো জানি না।

স্বাতি বলল :

তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে।

মনে পড়েছে। এ যে শেষের কবিতা। পরের লাইনটি সে বলল না, অকস্মাৎ থেমে গেল। এত কাছাকাছি বসে বুঝি বলা যায় না—তোমা হতে বহু দূরে।

আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। দিনের কথা নয়, রাতের কথা। মাত্র কয়েকটা দিন আগে কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় আমি স্বাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসে ছিলুম। একখানা বড় পাথরের উপর, আর একটু দূরে দূরে। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে নক্ষত্রের নৃত্যসভা বসেছিল। কাছে দূরে সর্বত্র সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ, আর তার অবিরাম গম্ভীর গর্জন। বাতাস বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। তবু স্বাতি নিজেকে হারাতে পারে নি। অত জল, অত আলো, অমন আকাশ, অমন অসীম উদার পরিবেশেও স্বাতি ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিল, বলেছিল : দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট কোরো না।

গদ্যে আমি সম্মতি জানাতে পারি নি। আমি উত্তর দিয়েছিলুম কবিতায়। তবু সেদিন সাহস করে বলতে পারি নি :

কিছু মোর পিছে রহিল যে
তোমার প্রাণের প্রান্তে

শুধু নিজের কথা বলেছিলুম :

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মূরতি।

আজ আমাদের সামনে সমুদ্র নেই, ঢেউ নেই, নেই তার দুরন্ত গর্জন। উদার আকাশ থেকে চতুর্দশীর চাঁদ জ্যোৎস্নার মদ ঢেলে

দিচ্ছে না। তবু আমার মন হয়েছে থমথমে, যেন নেশা ধরেছে। ইচ্ছে হল বলি :

আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি দিয়েছ আপনি।

কিন্তু এই আমিটা কে! গরিব বাঙলার একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলে বই তো নয়! আমার সমাজ কী, আমার পরিচয় কী, কিসের আমার মর্যাদা! কত দেশ তো ঘুরে ঘুরে দেখলুম, কত কীর্তি, কত নরনারী! এ সব আমার দেশের ভেবে বুক হয় তো ভরে উঠেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে বুক ভরেছে কার! আমার মূল্য যে মাপা হয়েছে চাঁদির টাকায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায় নয়। এত সহজে আমার নেশা হলে চলবে কেন! নিজেকে আমি সামলে নিলুম।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : তোমার নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই, কোন কৌতূহল?

কী আশ্চর্য! স্বাতিও কি আজ আমারই মতো ভাবছে! বললুম : ভুলে থাকি। প্রয়োজন হয় না বলেই বোধহয় মনে পড়ে না।

ভারতের অর্ধেকটা আমরা দেখে নিলাম, কিন্তু জীবনের কিছুটাও কি দেখতে পেয়েছি!

জীবনটা যদি জগতের মতো খোলামেলা হত, নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম। সেটা সঙ্কীর্ণ বলেই এমন অন্ধকার।

আমি কেন সঙ্কীর্ণ ভাবতে পারি নে! কেন আমি আলোর মতো হাওয়ার মতো জীবনকেও ছড়িয়ে দিতে চাই! এত দেখেও কি আমাদের মুক্তি হবে না!

আমি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলুম। বললুম : তাপ্তির কথা বোধ হয় শুনেছ। সে ঐ ফরাসী যুবকের সঙ্গে বিদেশে চলে যাচ্ছে।

তারপর?

তার পরের কথা তারা এখনও ভাবে নি।

গুহার ভিতর আমরা যাদের দেখে এলুম, তাদের কথা স্বাতি জানতে চাইল না। আমিও পারলুম না তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে। আমার অন্য কথা মনে পড়ল। স্বাতির রুমালটা আমার পকেটে আছে। সেটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি, তার সুযোগ পাই নি। আদৌ সেটা ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল কিনা, তা ভেবে দেখি নি। আজও কিছু না ভেবে আমি রুমালখানা বার করলুম।

স্বাতি চমকে উঠল, বলল : এ কি, এ তুমি কোথায় পেলে?

মহিসুরের চন্দনের গন্ধ মিলিয়ে যেয়েও যায় নি। উগ্রতা কমে আরও মিষ্টি লাগছে। বললুম : ভুল করে তুমি আমায় দিয়েছ। ফিরিয়ে নাও।

স্বাতি তার হাত বাড়িয়েছিল, আমার কথা শুনে ফিরিয়ে নিল।

বললুম : নেবে না?

স্বাতির দৃষ্টি এখন বেদনায় ছলছল। কিন্তু আমার মন বুঝি তৃপ্তিতে ভরে গেল। বললুম : থাক, আমার কাছেই থাক।

জীবনের এই প্রথম সঞ্চয়। রুমালখানা পকেটে পুরে স্বাতির মুখের দিকে যখন তাকালুম, তখন তার বেদনার্ত দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছে। সহসা প্রসন্ন দেখাচ্ছে তাকে।

·

উপরের বৌদ্ধ বিহারে কোন দিন আরতির ঘণ্টা বাজত কিনা জানি না। উদাত্ত স্বরে যতিরা মন্ত্রপাঠ করতেন, সুসুখং বত জীবাম। সুখে আমরা জীবন যাপন করব। সেই প্রার্থনা নিচের এই নদী-তীরে এসে পৌঁছত, পৌঁছত এই পাহাড় ডিঙিয়ে ভারতের বিরাট সমতলে, হিমালয় পেরিয়ে চীন জাপানেও পৌঁছত। দক্ষিণের এই বাণিজ্য পথ ধরে মানুষ এই পথে আসত, জীবন পরিপূর্ণ করতে আসত।

আমার মনেও আজ কোন শূন্যতা নেই। স্বাতি যা ভাবছিল, তাও সে প্রকাশ করে বলল : সত্যি বল তো, আমরাও কি বেরোতে পারি না দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে? যেমন—

কথাটা সে শেষ করতে পারল না। তার কি সেই অন্ধকার গুহার প্রাণবন্ত মানুষ দুটির কথা মনে পড়ছে! সেই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ নরনারীর কথা! এখানে যে আমরাও বড় কাছাকাছি বসে আছি। শুধু তো সৌরভ নয়, কবোষ্ণ উত্তাপও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মতো দুঃসাহস আমাদের কোথায়!

ঐ তো সেই দুঃসাহসী মানুষ দুটো! তারাও দেখছি এই দিকে নেমে আসছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাদের দেখা হয়ে গেল, না আমরাই এখানে অনেকক্ষণ বসে আছি! দেখতে আর কতটুকু সময় লাগে! সময় লাগে তো জানতে। মানুষকে জানতেই সব চেয়ে বেশি সময় দরকার। এক দিনে জানা যায় না, এক জীবনেও হয়তো বাকি থেকে যায়। মানুষের জীবন যে অনেক সঙ্কোচ দিয়ে অনেক সংস্কার দিয়ে অনেক অসত্য দিয়ে ঢাকা। তাইতেই বুঝি হাত বাড়িয়ে স্বাতির উত্তর দিতে পারলুম না: চল, বেরিয়ে পড়ি!

সে বড় নাটকীয় হত। বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষের মতো সভ্য হত না। তাই আমি কবিতায় তার উত্তর দিলুম: আমি তো গরিব যাযাবর।—

তোমারে যে দিয়েছিনু সে তোমারই দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

কর্ণাট পর্ব সমাপ্ত